সাহাবি সিরিজ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খালিদ
ইবনুল ওয়ালিদ রা.

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি। ফকিহ, রাজনীতিক ও বিশ্বখ্যাত ইতিহাসগবেষক। ইসলামের ইতিহাসের ওপর বিশ্লেষণধর্মী তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করে দুনিয়াজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে লিবিয়ার বেনগাজিতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা বেনগাজিতেই করেন।

যৌবনের প্রারম্ভেই গাদ্দাফির প্রহসনের শিকার হয়ে তিনি আট বছর বন্দি থাকেন। মুক্তি পাওয়ার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য সৌদি আরব চলে যান। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়া ও উসুলুদ্দিন বিভাগ থেকে ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে অনার্স সম্পন্ন করেন। তারপর চলে যান সুদানের উম্মু দুরমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে উসুলুদ্দিন অনুষদের তাফসির ও উলুমুল কুরআন বিভাগ থেকে ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'ফিকহুত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিম'।

নতুন ধারায় সিরাত ও ইসলামি ইতিহাসের তাত্ত্বিক গ্রন্থ রচনা করে ড. আলি সাল্লাবি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের আস্থা ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। নবিজির সিরাত, খুলাফায়ে রাশিদিনের জীবনী, উমাইয়া খিলাফত, ছয়টি বৃহৎ সিরিজে ক্রুসেড বিশ্বকোষসহ ইসলামি ইতিহাসের সাড়ে তেরোশ বছরের ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। তা ছাড়া ইসলামি ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করা ব্যক্তিদের নিয়ে আলাদা আলাদা গ্রন্থ রচনা করেছেন।

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির রচনা শুধু ইতিহাসের গতানুগতিক ধারাবর্ণনা নয়; তাঁর রচনায় রয়েছে বিশুদ্ধতার প্রামাণিক গ্রহণযোগ্যতা, জটিল-কঠিন বিষয়ের সাবলীল উপস্থাপনা ও ইতিহাসের আঁকবাঁকের সঙ্গে সমকালীন অবস্থার তুলনীয় শিক্ষা। এই মনীষী সিরাত, ইতিহাস, ফিকহ ও উলুমুল কুরআনের ওপর নব্বইয়ের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচনাবলি ইংরেজি, তুর্কি, ফরাসি, উর্দু, বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে পৃথিবীর জ্ঞানগবেষকদের হাতে হাতে পৌঁছে যাচ্ছে। কালান্তর প্রকাশনী লেখকের গ্রন্থগুলো বাংলায় অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি নিয়ে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছে। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ, নিরাপদ ও সুস্থ জীবন দান করুন। আমিন।

—সালমান মোহাম্মদ
লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২২

মূল্য : ৳ ৪০০, US $ 17. UK £ 12

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96764-1-6

Khalid Ibnul Walid Ra.
by **Dr. Ali Muhammad Sallabi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

প্রকাশকের কথা

সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল আলামিনের। কালান্তর প্রকাশনী থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রকাশের ধারাবাহিকতায় পাঠকের হাতে এখন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের জীবনীগ্রন্থ।

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে ইলিয়াস মশহুদ এটি সংকলন করেছেন। বিশেষ করে *সিরাতুন নবি* ﷺ ও চার খলিফার জীবনীগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ফলে গ্রন্থটির লেখক হিসেবে আমরা সাল্লাবির নামই ব্যবহার করেছি। এ জন্য আমরা শায়খ সাল্লাবির অনুমতিও নিয়েছি। আর সাল্লাবির এসব গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন নুরুযযামান নাহিদ, আবদুর রশীদ তারাপাশী, মহিউদ্দিন কাসেমী ও কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক।

গ্রন্থটিতে খালিদ রা.-এর সময়কার বিভিন্ন ঘটনা বা ইতিহাস খুবই প্রাসঙ্গিক না হলে আনা হয়নি। কারণ, এতে গ্রন্থটির কলেবর অনেক বেড়ে যাবে, যেটার আমরা প্রয়োজন করছি না। এ জন্য আমরা শুধু তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা বিষয়গুলো এনেছি। তবে এ ক্ষেত্রে তাঁর জীবনী বা ইতিহাস বর্ণনার ধারাবাহিকতায় ছন্দপতন যাতে না ঘটে, সে বিষয়টাও গুরুত্ব দিয়েছি।

প্রয়োজন বিবেচনায় কিছু তথ্য ও বয়ান নির্ভরযোগ্য আরও নানা জায়গা থেকে কুড়িয়েছেন সংকলক। তাঁর এই চেষ্টা-শ্রম বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, বাংলাভাষী পাঠকের খালিদ রা.-এর জীবনীপাঠের যে সুতীব্র পিপাসা, সেখানে গ্রন্থটি শারাবান তাহুরার কাজ দেবে আশা করি। সূচিতে নজর দিলেই পাঠক বুঝতে পারবেন—গ্রন্থটিতে বিস্তৃত বয়ানে উঠে এসেছে তাঁর জীবনের সমূহ বাঁক। আর আমরাও সে-মতোই চেষ্টা করেছি। তবু সাধ্যের সব বিলিয়ে দেওয়ার পরও তো কমতি-খামতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। ফলে পাঠক বরাবরে নিবেদন—ভাষা-বয়ান কিংবা তথ্য ও উপস্থাপনা যে দিক থেকেই এই গ্রন্থের যে রকম ত্রুটিই আপনার নজরে ধরা পড়ুক, দ্রুত আমাদের অবগত করবেন। বিবেচনাযোগ্য হলে দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্যই আমরা তা আমলে নেব ইনশাআল্লাহ।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২৯ মে ২০২১

সূচিপত্র

সংকলকের কথা # ১১

প্রথম অধ্যায়

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিচিতি ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর ভূমিকা ও ইসলামগ্রহণ # ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুতাযুদ্ধের নেতৃত্বে খালিদ, তাঁর বীরত্ব ও সাইফুল্লাহ উপাধি লাভ # ৪২

✧✧ তৃতীয় অধ্যায় ✧✧

মূর্তি ও দেবালয় ধ্বংসকারী খালিদ # ৫৬

✧✧ চতুর্থ অধ্যায় ✧✧

ইরতিদাদি ফিতনা দমনে খালিদের অভিযান # ৬৫

✧✧ পঞ্চম অধ্যায় ✧✧

ভণ্ড নবি দাবিদারদের দমনে খালিদের অভিযান ও উম্মু তামিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে # ৮৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওমান ও বাহরাইনবাসীর ইরতিদাদ দমনে খালিদের অভিযান # ৯৬

সপ্তম অধ্যায়

বনু হানিফাকে শায়েস্তা ও মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবকে নির্মূল করতে খালিদের অভিযান # ১০২

অষ্টম অধ্যায়

খালিদের বিয়ে ও ইরাকের অভিযানসমূহ # ১১৯

নবম অধ্যায়

খালিদের হজপালন ও শামের দিকে বিস্ময়কর যাত্রা # ১৫৯

দশম অধ্যায়

শামে বিজয়াভিযান, ইয়ারমুকযুদ্ধ ও খালিদের বীরত্ব # ১৬৭

১১ তম অধ্যায়

সেনাপতির পদ থেকে খালিদের অপসারণ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ ও শাম বিজয় # ২০৭

১২ তম অধ্যায়

খালিদের মৃত্যুশয্যা ও ইনতিকাল # ২৫০

সংকলকের কথা

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.—নাম শুনলেই মনের ভেতর একটা তেজ জেগে ওঠে। তির-তরবারির ঝনঝনানির কেমন একটা আওয়াজ কানে ভেসে আসে। আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হওয়ার রসদ জোগায়। শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় নুয়ে আসে মনোজগত। পৃথিবীর সেরা বাসস্থান মক্কার পাদদেশেই খালিদের জন্ম; কুরাইশের শাখা বনু মাখজুমের নেতৃপুরুষ ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার ঔরসে। ঐতিহ্যগতভাবেই কুরাইশদের সেরা যোদ্ধা আর কমান্ডার সবাই ছিলেন বনু মাখজুমের। তাই বংশপরম্পরায় নেতৃত্ব ও বাহাদুরির বিভা খালিদের ধমনিতে বয়ে বেড়াচ্ছিল শৈশব থেকে। ফলে কৈশোর পাড়ি দেওয়ার আগেই অমিত সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হন তখনকার আরবের সরদারগোত্রখ্যাত বনু আবদি মানাফে। তীক্ষ্ণ মেধা ও ধীশক্তি দিয়ে অনায়াসে রপ্ত করে নেন ঘোড়সওয়ারি ও তির-তরবারি চালনা। পিছিয়ে ছিলেন না কুস্তিবিদ্যায়ও। ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান হওয়ায় টাকাপয়সা উপার্জনের কোনো ফিকির ছিল না, ফলে তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে বেশ সুখেই। তাই পুরোটা সময় যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ফলে ব্যক্তিত্ব, বাহাদুরি আর নেতৃত্বগুণে অল্পবয়সে পুরো কুরাইশে তিনি হয়ে ওঠেন অনন্য। আরবের সর্বমহলে বেশ বরিত। যুবক বয়সে দায়িত্ব পান সেনাক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা ও অশ্বারোহী বাহিনী পরিচালনার।

মোটকথা, জাহিলি যুগেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. একজন নেতা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিলেন। পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা বংশাভিজাত্য, মেধা, সাহসিকতা ও নেতৃত্বগুণে ছিলেন আরবসমাজের মান্যপুরুষ। ফলে নবিজি ﷺ তার ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু ওয়ালিদের ভাগ্যসিতারায় ইসলামের দ্বীপশিখা জ্বলে ওঠেনি। খালিদের ধমনিতেও পিতৃপুরুষের সেই অমিত তেজ ছিল দেদীপ্যমান। ইসলামগ্রহণের আগে মুসলিমদের মোকাবিলায় ছিলেন কঠোর-পাষাণ দিল। উহুদযুদ্ধে তো কুরাইশদের 'ইজ্জত' রক্ষার নেপথ্যনায়ক তিনি। তাঁর বীরত্বেই মুসলিমদের সাময়িক পরাজয়ের স্বাদ নিতে হয়েছিল সেদিন।

ইসলাম তখন ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছিল। নববি সূর্যকিরণ ছড়িয়ে পড়ছিল দিগ্‌দিগন্তে। দলে

দলে লোকজন ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল। খালিদের মনেও একসময় ইসলামের সত্যতা ফুটে ওঠে। বুঝতে পারেন, শেষপর্যন্ত রাসুল ﷺ-ই বিজয়ী হবেন। তিনি বলেন, 'আমি রাসুলের বিরুদ্ধে প্রতিটা যুদ্ধে উপস্থিত থাকলেও দেখতে পাচ্ছিলাম, প্রতিটা ক্ষেত্রেই তিনি বিজয়ী হচ্ছেন; আর আমরা পরাজিত হচ্ছি। মনে হচ্ছিল অচিরেই তিনি পুরো আরবে বিজয়ী ও নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন।'

এদিকে রাসুল ﷺ-ও তাঁর ইসলামগ্রহণের জন্য দুআ করতেন। এ দুআর বরকতে আল্লাহর রহমতে সপ্তম হিজরিতে খালিদ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। খালিদের বীরত্ব, সাহস, মেধা ও রণকৌশলে মুগ্ধ হয়ে রাসুল ﷺ তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' তথা 'আল্লাহর তরবারি' উপাধিতে ভূষিত করেন। ইসলামগ্রহণের পর মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন তিনি। এ অল্প সময়েই শতাধিক যুদ্ধে সরাসরি অংশ নেন, তবে কোনো যুদ্ধেই পরাজিত হননি! রণকৌশলে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অপরাজেয় এই বীর সেনার হুংকারে প্রকম্পিত হয়ে উঠত কাফিরদের অন্তরাত্মা। তাঁর তির-তরবারির ঝলকানি দেখে মুহূর্তেই শত্রুশক্তি নেতিয়ে পড়ত। শত্রুপক্ষের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ যমদূত। ছিলেন ইসলামি ইতিহাসে এমন এক মহান সেনাপতি, যিনি রণক্ষেত্রে নিজের শক্তি ও মেধা দিয়ে ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করেছিলেন। নববি যুগ থেকে খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবের যুগ পর্যন্ত প্রবল প্রতাপে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন পৃথিবীর আনাচে-কানাচে।

ইতিহাসের এই মহানায়কের জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি। আর পুরো জীবনালোচনা তো কোথাও নেই। ফলে খালিদের যুদ্ধজীবন ছাড়া তাঁর সম্পর্কে খুব একটা জানার সুযোগ নেই। এই শূন্যতা পূরণের সামান্য প্রয়াস বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি। গ্রন্থটির প্রায় ৯০% আলোচনা নেওয়া হয়েছে ড. আলি সাল্লাবির সিরাতুন্নবি ﷺ, আবু বকর সিদ্দিক রা., উমর ইবনুল খাত্তাব রা., উসমান ইবনু আফফান রা. গ্রন্থ থেকে। এ ছাড়া কিছু আলোচনা প্রয়োজন ও ধারাবাহিকতা-বিবেচনায় আমি জুড়ে দিয়েছি। কারণ, খালিদ রা.-এর নাম, বংশতালিকা, জন্ম, বেড়ে ওঠা, পরিবার ও ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর সামাজিক ও যুদ্ধজীবন সম্পর্কে ড. আলি সাল্লাবির লেখায় তেমন কিছু পাওয়া যায় না। ফলে তাঁকে নিয়ে লেখা কয়েকটি গ্রন্থসহ বিভিন্ন মাধ্যম থেকে নির্ভরযোগ্য বিবরণ পেশ করার চেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত রেফারেন্সও দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে বাকি সব আলোচনাই ড. সাল্লাবির, যেখানে তাঁর ইসলামগ্রহণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, ইসলামগ্রহণ-পরবর্তী বিভিন্ন যুদ্ধে তাঁর বীরত্বপ্রকাশ, নেতৃত্বগ্রহণ, নবিজি কর্তৃক 'সাইফুল্লাহ' উপাধি লাভ, মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে রাসুলের পরিকল্পনা ও খালিদের ভূমিকা, মূর্তিধ্বংস, দাওমাতুল জানদাল অভিমুখে যাত্রা, তাবুকযুদ্ধ ও বিদায়হজের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এরপর ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকরের শাসনামলে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের জিহাদি অভিযান, ইরতিদাদি ফিতনা দমন, ভণ্ড নবিদের মোকাবিলায় তাঁর জিহাদি অভিযান, সাজাহ, বনু তামিম এবং মালিক ইবনু নুবায়রার হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে উম্মু তামিমের সঙ্গে খালিদের বিয়ে, ওমান ও বাহরাইনবাসীর ইরতিদাদ, মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবকে কীভাবে দমন করা হয়েছিল, তা-ও। মুজ্জাআর প্রতারণা, মুজ্জাআর মেয়ের সঙ্গে খালিদের বিয়ে নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়া আবু বকরের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ, ইরাক অভিযানে পাঠানো এবং আবু বকরের পরিকল্পনা, হজপালন, শামের দিকে তাঁকে রওনার নির্দেশ এবং মুসান্নার হাতে ইরাকের নেতৃত্বভার অর্পণ সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি পাঠ করলে আমরা আরও জানতে পারব শামে আবু বকরের বিজয়াভিযান, আজনাদায়ন ও ইয়ারমুকযুদ্ধ, আবু বকরের ইনতিকাল, উমরের খিলাফতগ্রহণ এবং খালিদের অপসারণ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ এবং উমরের যুগে শাম বিজয় সম্পর্কে। জানতে পারব ইতিহাসের অপরাজেয় বীর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের মৃত্যুশয্যা, খলিফা উমর সম্পর্কে তাঁর আবেগি মন্তব্য ও ইনতিকাল ইত্যাদি সম্পর্কে। এ ছাড়া গ্রন্থটির শেষ দিকে খালিদের হাদিস বর্ণনা, তাঁর ফজিলত, দীনের অন্যান্য খিদমাত সম্পর্কেও কিছু ধারণা পাব।

বিশুদ্ধ ইতিহাস নিয়ে কাজ করা দেশের অন্যতম প্রকাশনাপ্রতিষ্ঠান কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক মুহতারাম আবুল কালাম আজাদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা ছিল মহাবীর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের জীবনী প্রকাশ করা। আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর আগ্রহ এবং সার্বিক সহযোগিতায় *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.* গ্রন্থটি এখন পাঠকের হাতে। আল্লাহ তাআলা লেখক, পাঠক, সম্পাদক, প্রকাশক, সংকলকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দিন। গ্রন্থটিতে ভাষা, বানান, তথ্য ও তত্ত্বগত কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

ইলিয়াস মশহুদ
২০ জুলাই ২০২২

প্রথম অধ্যায়

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিচিতি ইসলামপূর্ব যুগে তাঁর ভূমিকা ও ইসলামগ্রহণ

এক. নাম, বংশতালিকা, জন্ম, বেড়ে ওঠা, পরিবার ও ইসলামপূর্ব যুগে খালিদের সামাজিক অবস্থান

১. নাম, বংশতালিকা, উপনাম ও উপাধি

নাম খালিদ, উপনাম আবু সুলায়মান ও আবুল ওয়ালিদ। উপাধি 'সাইফুল্লাহ' বা 'আল্লাহর তরবারি'। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশধারা এমন—খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু মাখজুম ইবনু ইয়াকজা ইবনু মুররা ইবনু কাব আল মাখজুমি আল কুরাইশি। বংশতালিকার সপ্তম পুরুষ মুররা ইবনু কাবে গিয়ে রাসুল ﷺ ও তাঁর বংশতালিকা এক হয়ে যায়।

খালিদের মায়ের নাম লুবাবা আস-সুগরা বিনতু হারিসা। তিনি উম্মুল মুমিনিন মায়মুনা বিনতু হারিসার বোন।[১] এ হিসেবে রাসুল ﷺ সম্পর্কে তাঁর খালু হন।

২. পরিবার ও বংশাভিজাত্য

বনু মাখজুম কুরাইশের একটা শাখা। কুরাইশের বনু হাশিমের পরই ছিল এই গোত্রের মর্যাদা। যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয় দেখভালের দায়িত্ব পালন করত তারা। এ ছাড়া গোত্রটি আরবের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহীদের অন্যতম ছিল। খালিদ রা. সম্ভ্রান্ত এই বনু মাখজুমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা ছিলেন মক্কার শীর্ষপর্যায়ের নেতা এবং প্রচুর ধনসম্পদের মালিক। মক্কা থেকে তায়েফ পর্যন্ত বিশাল এলাকাজুড়ে ফসলের বাগান ছিল তাঁর।

---

[১] *আসহাবে রাসুল* : ২/৬৩।

খালিদ রা.-এর পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার এমন মর্যাদা ছিল যে, একবছর পুরো বনু হাশিম মিলে কাবার গিলাফ কিনে পরাত, তো পরের বছর ওয়ালিদ একাই কাবায় গিলাফ দান করতেন। এ ছাড়া তাঁর বাড়িতে সবসময় মেহমানদের আনাগোনা থাকত। কথিত আছে, তখন মক্কায় ওয়ালিদই সবচেয়ে বড় দানশীল ছিলেন।

এখানে একটা কথা স্মরণযোগ্য যে, জাহিলি যুগেও কিছু মানুষ নিজের মেধা, প্রজ্ঞা, ভদ্রতা, বংশাভিজাত্য ও নেতৃত্বগুণে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে ছিল। এরা ইসলামবিরোধিতা করলেও তাদের আচরণ অভদ্র, নীচ ছিল না। ওয়ালিদ ইবনু মুগিরা এমনই একজন, যিনি ইসলাম গ্রহণ না করলেও তার আচরণ হীনতর ছিল না। ইসলামের ঘোর বিরোধী হলেও আবু জাহলের মতো নবিজির সঙ্গে কখনো অভদ্র আচরণ করেননি। শারীরিক নির্যাতন করেননি। ফলে নবিজি তাঁর ইমান আনার ব্যাপারে বেশ আশাবাদী ছিলেন; কিন্তু আত্মগরিমা আর নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মোহে শেষপর্যন্ত তার সে সৌভাগ্য হয়নি।

তবে ওয়ালিদের মতো নেতৃপর্যায়ের কয়েকজন ইসলামগ্রহণ করে নিজেদের ধন্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে আবু সুফিয়ান, জুবায়ের ইবনু মুতয়িম, সুহাইল ইবনু আমর রা. উল্লেখযোগ্য। ইসলামগ্রহণের আগে জাহিলি সমাজেও তাঁরা মানবিক সৌকর্যমণ্ডিত উত্তম চরিত্রের ধারক ছিলেন।

৩. জন্ম ও বেড়ে ওঠা

খালিদ রা. মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনু মাখজুমে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এতটুকু জানা যায়, নবুওয়াতের ১৫-১৬ অথবা ১৭ বছর আগে তাঁর জন্ম হয়। রাসুল ﷺ নবুওয়াত লাভকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ২৪ বা ২৫ বছর।[২]

জন্মের পরপরই আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে গ্রামের একজন দুধমায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে গ্রামীণ পরিবেশে তিনি লালিতপালিত হন। এরপর পাঁচ বা ছয় বছর বয়সে মক্কায় মা-বাবার কাছে ফিরে আসেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ গড়নের অধিকারী অসম্ভব ডানপিটে বালক। ঐতিহ্যগতভাবেই কুরাইশদের সেরা যোদ্ধা আর কমান্ডাররা সবাই ছিলেন বনু মাখজুমের। তাই ছেলেবেলা থেকেই তিনি ঘোড়ায় চড়া, তির, তরবারি, বর্শা ও বল্লম চালানো শিখতে শুরু করেন। বলতে গেলে সব অস্ত্রেই ছিলেন সমান পারদর্শী। ছিলেন তখনকার আরবের সেরা কুস্তিগিরদের একজন।

খালিদ রা. ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন, ফলে তাঁর শৈশব-কৈশোর কেটেছে বেশ সুখে। যেহেতু অর্থ উপার্জনের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তাই পুরোটা সময় যুদ্ধবিদ্যা

---

২ *আল-ইসাবা ফি তাময়িজিস সাহাবা* : ২/৯৮।

নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। এ ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্ব, বাহাদুরি আর নেতৃত্বগুণের কারণে যুবক বয়সেই পুরো কুরাইশে তিনি অনন্য হয়ে ওঠেন। একবার তো মল্লযুদ্ধে উমর ইবনুল খাত্তাবকে আছড়ে ফেলে তার পা ভেঙে দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, সম্পর্কের দিক থেকে উমর রা. ছিলেন তাঁর মামা।[৩]

৪. শারীরিক গঠন

খালিদ রা. ছোটবেলায় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, এ জন্য তাঁর চেহারায় গুটিবসন্তের দাগ দৃশ্যমান ছিল। মুখে ঘন দাড়ি আর কাঁধ ছিল চওড়া। ছিলেন শক্ত-সুঠামদেহী, বুক ছিল প্রশস্ত।

৫. ভাই-বোন

খালিদ রা.-এর ছয় ভাই ও দুই বোন ছিলেন।[৪] তবে পাঁচ ভাইয়ের কথাও অনেকে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাইদের মধ্যে হিশাম ইবনুল ওয়ালিদ ও ওয়ালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইসলামগ্রহণে ধন্য হন। আর দুই বোনের একজনের বিয়ে হয় সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার এবং অপরজনের হারিস ইবনু হিশামের সঙ্গে।

৬. বিয়ে, স্ত্রী ও সন্তানাদি

খালিদ রা. কতটি বিয়ে করেছেন এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তানাদি কতজন, এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না বা জানারও উপায় নেই। কেননা, ইতিহাস ও বংশপরিক্রমাবিষয়ক গ্রন্থসমূহে এ সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসবিদরা সাধারণত তাঁর যুদ্ধজীবন নিয়ে বেশি আলোকপাত করেছেন। তবে বিচ্ছিন্ন কিছু বর্ণনা থেকে তাঁর ছয়টি বিয়ে এবং পাঁচজন সন্তানের তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া প্রাচীন আরবের রীতি অনুযায়ী মেয়েদের সংখ্যা কোথাও পাওয়া যায় না।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. যাঁদের বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন :

১. কাবশা বিনতু হাওজা ইবনু আবি আমর। তাঁর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন সুলায়মান ইবনু খালিদ। সুলায়মান মিসরের কোনো এক যুদ্ধে, মতান্তরে ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে কোনো এক যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন।

২. আসমা বিনতু আনাস ইবনু মুদরিক। তাঁর গর্ভে মুহাজির, আবদুর রাহমান ও আবদুল্লাহ নামে তিন ছেলে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেদের মধ্যে মুহাজির ইবনু খালিদ

---

[৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১১৫।

[৪] *সাইয়িদুনা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.*, আবু রায়হান জিয়াউর রাহমান ফারুকি : ৩।

সিফফিনযুদ্ধে আমিরুল মুমিনিন আলি রা.-এর পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করেন। তবে দ্বিতীয় ছেলে আবদুর রাহমান—যিনি আমিরুল মুমিনিন উসমান রা.-এর শাসনামলে হিমসের গভর্নর ছিলেন—সিফফিনযুদ্ধে তিনি মুআবিয়া রা.-এর পক্ষে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া ৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অবরোধের সময় উমাইয়া সেনাবাহিনীতে ছিলেন। তিনি ৪৬ হিজরি পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। কথিত আছে, আমিরুল মুমিনিন মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ানের খিলাফতকালে কেউ একজন তাঁকে বিষমিশ্রিত পানি পান করায়, ফলে এর প্রতিক্রিয়ায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আর তৃতীয় ছেলে আবদুল্লাহ সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।[৫]

৩. লায়লা উম্মু তামিম অথবা লায়লা বিনতু মিনহাল। তাঁর থেকে আবদুল্লাহ নামে এক ছেলে জন্মগ্রহণ করেন।

৪. বিনতু মুজ্জাআ ইবনু মুরারা ইয়ামানি। ইয়ামামা বিজয়ের পর খালিদ রা. তাঁকে বিয়ে করেন। ৫. বিনতু জুদি ইবনু রাবিয়া। ৬. উম্মু নাইমা সাকাফিয়া।[৬]

এ ছাড়া খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নামেই তাঁর একজন নাতি ছিলেন, যিনি ছেলে আবদুর রাহমানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। পুরো নাম খালিদ ইবনু আবদুর রাহমান ইবনু খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ। তিনি দাদার মতোই বীর বাহাদুর ছিলেন। তবে তাঁর কোনো সন্তান নেই।[৭]

৭. ইসলামপূর্ব যুগে খালিদের সামাজিক অবস্থান

জাহিলি যুগে পিতা ওয়ালিদের মতো খালিদও কুরাইশের গণ্যমান্য ও সম্ভ্রান্তদের মধ্যে গণ্য হতেন। তখন কুরাইশের নয়টি পরিবারের নয়জনকে মর্যাদা ও আভিজাত্যে পুরো আরবে শীর্ষস্থানের অধিকারী মনে করা হতো। তাঁরা হচ্ছেন :

১. বনু হাশিমের আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব রা.। জাহিলি যুগে হাজিদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তাঁর অধীনে ছিল। ইসলামি যুগেও এই মর্যাদা তাঁর হাতে থেকে যায়।

২. বনু উমাইয়ার আবু সুফিয়ান ইবনু হারব রা.। কুরাইশদের জাতীয় পতাকা 'উকাব 'ধারণের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। কুরাইশের নেতারা যখন কোনো বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারতেন না ,তখন তাঁকে সামনে বাড়িয়ে দিতেন।

৩. বনু নাওফালের হারিস ইবনু আমির। রিফাদাহ অর্থাৎ, কুরাইশের জাতীয় সাহায্য-তহবিলের জন্য অর্থসংগ্রহ এবং তা দিয়ে মুসাফিরদের সাহায্য করা ছিল তাঁর দায়িত্বে।

---

[৫] *সাইয়িদুনা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.*, আতাউর রাহমান নুরি : ৩৪।

[৬] *তারিখু দিমাশক* : ৯/৯২৬; ইবনু আসাকির, *আল ইসাবাহ* : ৩য় খণ্ড; ইবনু হাজার, *নাসাবু কুরাইশ* : ৩২৭, জুবাইরি।

[৭] *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ কি আপবিতি* : ৪৩।

৪. বনু আসাদের উসমান ইবনু তালহা ইবনু জামআ ইবনু আসওয়াদ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলিতে পরামর্শের জন্য তাঁকে ডাকা হতো। কুরাইশরা জরুরি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তে যেত না। এ ছাড়া তাঁর হাতে ছিল হিজাবা তথা কাবার চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব।

৫. বনু তায়িমের আবু বকর রা.। তাঁর দায়িত্বে ছিল আশনাক অর্থাৎ, জরিমানা ও রক্তপণের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ। তিনি কারও জামিন হলে কুরাইশরা বিনা বাক্যে তা মেনে নিত। তবে অন্য কেউ কারও জামানত নিলে তারা তার স্বীকৃতি দিত না।

৬. বনু মাখজুমের খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। কুবাবাহ অর্থাৎ, সেনাক্যাম্পের ব্যবস্থাপনা এবং আয়িন্না তথা অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব ছিল তাঁর। তাঁর নেতৃত্বেই কুরাইশরা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত।

৭. বনু আদির উমর ইবনুল খাত্তাব রা.। সাফারাত বা কূটনীতি তথা অন্যান্য জাতি-গোত্রের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ ও আলাপ-আলোচনার দায়িত্ব ছিল তাঁর।

৮. বনু জুমাহর সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া রা.। আজলাম বা ভাগ্যনির্ধারণী তির সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

৯. বনু সাহামের হারিস ইবনু কায়েস। তাঁর দায়িত্ব ছিল হুকুমাত অর্থাৎ, মামলা-মোকদ্দমায় ফায়সালা দেওয়া এবং প্রতিমা তৈরি ও সংস্কার করা।[৮]

মোটকথা, সেই জাহিলি যুগেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. একজন নেতা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছিলেন। লোকজন বিভিন্ন সমস্যায় তাঁর কাছে আসত। পিতার মতো তিনিও মেহামানদারিতে আলাদা সুখ্যাতির অধিকারী ছিলেন।[৯]

দুই. ইসলামপূর্ব যুগে খালিদের যুদ্ধজীবন : উহুদযুদ্ধ থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি

ইসলামগ্রহণের আগে খালিদ পিতা ওয়ালিদ ইবনু মুগিরার মতো ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন। রাসুল ﷺ মদিনায় হিজরতের পর থেকে মক্কাবিজয়ের আগ পর্যন্ত মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে মদিনাবাসীর যুদ্ধ লেগেই ছিল। বদরযুদ্ধ ছিল মক্কাবাসীর সঙ্গে মদিনাবাসীর প্রথম যুদ্ধ। খালিদ এই যুদ্ধের সময় তাদের ব্যবসায়িক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ায় ছিলেন। তবে এ যুদ্ধে খালিদের ভাই ওয়ালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মুসলিমদের হাতে বন্দি হন। যুদ্ধ শেষে খালিদ তাঁর বড় ভাই হিশাম ইবনুল ওয়ালিদকে মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে মদিনায় যান।

---

[৮] *আশহারু মাশাহিরিল ইসলাম* : ১/১০।

[৯] *নিহায়াতুল আরব* : ১৯/১০— *তারিখুদ দাওয়াহ*, ইয়াসরি মুহাম্মাদ হানি : ৪২।

১. উহুদযুদ্ধ ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ

ক. উহুদযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

উহুদ মদিনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরের একটা পাহাড়ের নাম। সেখানে হারুন আ.-এর কবর রয়েছে। সবার ঐকমত্যে উহুদযুদ্ধ তৃতীয় হিজরির শাওয়ালে সংঘটিত হয়। তবে ইতিহাসবিদদের মতে, এর নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন : ৭, ৯, ১০ ও ১১ শাওয়াল।[১০]

বদরযুদ্ধের পরাজয় ও অপমানের গ্লানি এবং সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার ফলে মক্কার মুশরিকদের দুঃখের বোঝা বইতে হচ্ছিল। এই শোক, ক্ষোভ-দুঃখ নিয়ে যদিও তারা একটা বছর পার করেছে; কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল প্রতিমুহূর্তে। এমনকি তাদের নিহতদের জন্য শোকপ্রকাশ করতেও লোকদের নিষেধ করে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে তারা যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৩ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের ৭০০ বর্ম, ২০০ ঘোড়া ও ৩ হাজার উট ছিল। এমনকি ১৪ জন মহিলাকে এ জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল যে, এরা তাদের পুরুষদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবে এবং যারা পালাতে চায়, তাদের তিরস্কার ও লজ্জা দেবে।

এদিকে নবিজির চাচা আব্বাস রা.—যিনি এ সময় ইসলাম কবুল করে নিয়েছেন, তবে তখনো মক্কাতেই ছিলেন—কুরাইশদের এমন আয়োজন ও যুদ্ধপ্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং এতে বেশ বিচলিতবোধ করেন। এ জন্য এর বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে চিঠিসহ দ্রুতগামী এক দূতকে মদিনায় নবিজির কাছে পাঠিয়ে দেন।

নবিজি এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোককে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। তাঁরা ফিরে এসে তাঁকে সংবাদ দেন, কুরাইশরা মদিনার উপকণ্ঠে এসে গেছে। যেহেতু মদিনা শহরে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই শহরের চারদিকেই পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। সকালে নবিজি ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এরপর ১ হাজার সেনার এক বাহিনী নিয়ে মদিনার বাইরে চলে আসেন। এ বাহিনীতে মুনাফিক-নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সমমনা ৩০০ মুনাফিকও ছিল। তবে তারা পথিমধ্যেই বাহিনী ছেড়ে ফিরে আসে। ফলে মুসলিমদের সেনাসংখ্যা কমে ৭০০ জনে দাঁড়ায়।[১১]

---

[১০] *শারহুল মাওয়াহিব*, জুরকানি : ২/২০।

[১১] মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই উহুদযুদ্ধে মুসলিমদের ধোঁকা দিয়েছিল। যুদ্ধে মুসলিমদের ১ হাজার

খ. সেনাবিন্যাস ও সাহাবিদের জিহাদি স্পৃহা

এরপর উহুদের ময়দানে পৌঁছে রাসুল ﷺ মুজাহিদদের কাতারবন্দি করেন। উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধের কৌশল ঠিক করেন। কেননা, এ দিক দিয়ে শত্রুদের এগিয়ে আসার আশঙ্কা ছিল। ফলে এই কৌশল একদিকে ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, আবার অন্যদিকে সুবিধাজনক বটে। উহুদের পেছনে একজায়গা দিয়ে হামলার আশঙ্কা ছিল, এ জন্য নবিজি সেখানে ৫০ জনের এক তিরন্দাজবাহিনীকে পাহারার দায়িত্ব দিয়ে তাঁদের কঠোরভাবে নির্দেশ দেন, 'মুসলিমদের জয়-পরাজয় যা-ই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তোমরা এখানে অটল থাকবে।'

এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের পর মুসলিমবাহিনী কুরাইশদের পিছু হটাতে সক্ষম হয়। এ পর্যায়ে মুসলিমবাহিনী বিজয়ী হিসেবে যুদ্ধময়দানে অবস্থান করে; আর কুরাইশরা মনোবল হারিয়ে এদিক-ওদিক পালাতে থাকে। মুজাহিদরা তখন যুদ্ধময়দানে গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ দৃশ্য দেখে পাহাড়ের ওই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নবিজি যে ৫০ জনকে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁদের অনেকে মুসলিমদের বিজয় হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে সেখান থেকে চলে আসেন। তবে তাঁদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের রা. বার বার নিষেধ করছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁর কথা মানেননি। তারপরও কয়েকজন সেখানে থেকে যান।

এ জায়গাটা প্রায় ফাঁকা দেখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ—যিনি তখনো মুসলমান হননি এবং কুরাইশের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন—পেছন দিক থেকে আচমকা আক্রমণ করে যুদ্ধের দৃশ্য পালটে দেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরসহ তাঁর সঙ্গে থাকা অল্প কজন সাহাবি প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যান, তবে শেষপর্যন্ত সবাই শাহাদাতবরণ করেন।

গ. কাফিরদের পক্ষে খালিদের বীরত্ব

এবার মুশরিকবাহিনীর জন্য পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর

বাহিনীর মধ্যে ৩০০ জন ছিল তার সঙ্গী। সে কাফেলার সঙ্গে মদিনা থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ মুসলিমদের সঙ্গে ছিল। পরে এ কথা বলে সঙ্গীদের নিয়ে ফিরে যায় যে, আমাদের পরামর্শ ছিল মদিনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করব, এখন আমাদের পরামর্শ কেন মানা হলো না? আরও বলে যে, এটা যুদ্ধ নয় বরং আত্মহত্যা। এ ছাড়া সে ও তার সাথিরা যুদ্ধে যেতে মুসলিমদেরও বাধা দেয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উবাই মুসলিমদের আস্তিনে পালিত প্রথম বড় সাপ। ইসলাম ও মুসলিমদের ধ্বংসের জন্য এমন কোনো ষড়যন্ত্র নেই, যা সে করেনি। যদি আল্লাহর একান্ত সাহায্য না থাকত, তাহলে মুসলিমরা পরস্পরে যুদ্ধ করেই মারা যেতেন এবং মাত্র কয়েক বছরেই ইসলামের নামনিশানা পৃথিবী থেকে বিলীন হয়ে যেত। তার মতাদর্শী ইয়াহুদিরা তার মৃত্যুর পরও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, যারা পরবর্তী শতাব্দীতে মুসলিমদের মধ্যে অসংখ্য আস্তিনের সাপ ঢুকিয়ে দেয়। *আস্তিনের সাপ*, ইসমাইল রেহান : ১৬। —*সংকলক*।

বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমান ও কাফির উভয় বাহিনী তখন যুদ্ধময়দানে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে, মুসলমান মুসলমানের হাতেই শহিদ হতে থাকেন।

এ যুদ্ধে মুসআব ইবনু উমায়ের রা. শহিদ হন। তাঁর চেহারার সঙ্গে নবিজির চেহারার অনেক মিল ছিল। ফলে তাঁর শাহাদাতের পর গুজব ছড়িয়ে পড়ে, রাসুল ﷺ শহিদ হয়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, শয়তান বা মুশরিকদের কেউ একজন উচ্চৈঃস্বরে এ ঘোষণা দেয় যে, 'মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন!'[১২]

এই মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের মনোবল ভেঙে যায়। এমনকি বড় বড় অনেক সাহাবিও হতাশ হয়ে পড়েন। তবে অনেকে তখনো অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। বিশৃঙ্খলার কারণে মুসলিমদের হাতে মুসলিমরা শহিদ হতে থাকেন। তবে সবার দৃষ্টি তখন নবিজিকে খুঁজে ফিরছিল। এরপর কাআব ইবনু মালিক রা. প্রথমে তাঁকে দেখতে পান। তিনি আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার দিয়ে ওঠেন, 'মুবারক হো, নবিজি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন!'

কাআবের এ আওয়াজ শুনে সাহাবিরা নবিজির কাছে দৌড়ে আসতে থাকেন। এ সময় কাফিররা অন্যদিক থেকে সরে এসে এদিকে মনোনিবেশ করে। কয়েকবার নবিজির ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তবে তিনি নিরাপদই থাকেন। এমনকি একবার কাফিররা কঠোর আক্রমণ করলে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ করে বলেন, 'কে আছে এমন, যে আমার জন্য প্রাণোৎসর্গ করতে প্রস্তুত?' তখন জিয়াদ ইবনু সাকান রা. নিজের চার সঙ্গীসহ নবিজির কাছে চলে আসেন। তাঁরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করে শহিদ হয়ে যান। জিয়াদ রা. আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলে রাসুল ﷺ বলেন, 'তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এসো।' সাহাবিরা তাঁকে পাঁজাকোলা করে নবিজির কাছে নিয়ে আসেন। তখনো তাঁর প্রাণ ছিল। তিনি নবিজির পায়ের উপর নিজের মুখ রাখেন এবং এ অবস্থায়ই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন।

ঘ. নবিজির চেহারা মুবারক আহত হওয়া

তখন কুরাইশের প্রখ্যাত বীর আবদুল্লাহ ইবনু কুমাইয়া সেনাসারি ভেদ করে সামনে এগিয়ে যায় এবং নবিজির চেহারা মুবারকে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করে। ফলে নবিজির শিরস্ত্রাণের (লোহার টুপি) দুটি কড়া মুখ ভেদ করে মাথায় ঢুকে যায় এবং একটি দাঁত শহিদ হয়। আবু বকর রা. কড়া দুটি ক্ষতস্থান থেকে ওঠাতে এগিয়ে এলে

---

[১২] *শারহুল মাওয়াহিব*, জুরকানি : ২/৩০।

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা. বলেন, 'আল্লাহর কসম, এ খিদমতটি আমাকে করার সুযোগ দিন।' তিনি সামনে এগিয়ে এসে হাত না লাগিয়ে নিজের মুখ দিয়ে কড়া দুটিতে টান দেন। তাতে একটা কড়া বেরিয়ে এলেও এর সঙ্গে আবু উবায়দার একটা দাঁতও উপড়ে যায়। এ দৃশ্য দেখে আবু বকর দ্বিতীয় কড়াটা বের করতে এগিয়ে এলে তিনি আবারও কসম দিয়ে তাঁকে বিরত রাখেন এবং নিজেই তাতে মুখ লাগিয়ে টান দেন। এবারও তাঁর আরেকটা দাঁত উঠে আসে![১৩]

এ সময় কাফিরদের খনন করা এক গর্তে রাসুল ﷺ পড়ে যান। মূলত মুসলিমদের ভূপাতিত করতেই তারা এটা খুঁড়েছিল।

এদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুশরিকবাহিনী পাহাড়ের উপর দিক থেকে আক্রমণ করতে এলে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. তাদের প্রতিহত করেন। তিনি ও তাঁর সাথিরা এ ভয়ানক হামলা প্রতিহত করতে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যান। একপর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নিশ্চিত বিজয় টের পেলেও মুশরিকরা মুসলিমদের বীরত্বের প্রদর্শনী ও জীবনোৎসর্গকারী আক্রমণের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

২. দ্বিধাবিভক্ত মুসলিমবাহিনীকে সমন্বিত করতে রাসুলের পরিকল্পনা

উহুদযুদ্ধে মুসলিমদের প্রাথমিক বিজয়ের পর মুশরিকবাহিনী যখন মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তাদের মৌলিক লক্ষ্য ছিল রাসুলের ওপর আক্রমণ করা; কিন্তু তখনো রাসুল ﷺ নিজের অবস্থান থেকে পিছপা হননি। জীবনোৎসর্গকারী সাহাবিরা একে একে তাঁর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে যাচ্ছিলেন। কাফিরবাহিনী যখন রাসুল ﷺ-কে পুরোপুরি ঘেরাও করে নেয়, তখন তাঁর চারপাশে নয়জন সাহাবি নিজেদের মানবঢালে পরিণত করে নেন। তাঁদের মধ্যে সাতজন ছিলেন আনসারি। তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল নবিজিকে এই অবরুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে বের করে পাহাড়ের উপরে নিজ বাহিনীর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। আনসার সাহাবিরা তখন কাফিরদের আক্রমণের মুখে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে আত্মোৎসর্গ করতে থাকেন।[১৪]

কায়েস ইবনু আবি হাজিম রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, সেদিন তালহা রা. তাঁর যে হাত দিয়ে নবিজিকে রক্ষা করে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁর সে হাত অবশ হয়ে যেতে দেখেছি।[১৫]

রাসুল ﷺ এক প্রস্তরখণ্ডে উঠতে চাইলে পারেননি। তখন তালহা রা. তাঁর নিচে বসে

---

১৩ *ইবনু হিব্বান, দারা কুতনি, তাবরানি ইত্যাদি—কানজুল উম্মাল* : ২/২৭৪।

১৪ *নাজরাতুন নায়িম* : ১/৩০৪।

১৫ *সহিহ বুখারি* : ৩৭২৪।

যান এবং নবিজি তাঁর পিঠে পা দিয়ে পাথরের উপর ওঠেন। জুবায়ের রা. বলেন, রাসুল ﷺ তখন বলেন, 'তালহা নিজের জন্য জান্নাত আবশ্যক করে নিয়েছে।'

সেদিন সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রা. রাসুলের সামনে নিজের বীরত্বের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে সক্ষম হন। ফলে নবিজি নিজে তাঁর হাতে তির ধরিয়ে বলেন, 'তোমার ওপর আমার পিতামাতা উৎসর্গ হোন, তুমি তির নিক্ষেপ করো।'

এভাবে নবিজির পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সেদিন প্রখ্যাত তিরন্দাজ আবু তালহা আনসারিও নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখেন। তাঁর ভূমিকায় অভিভূত হয়ে নবিজি ﷺ বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আবু তালহার একক আওয়াজ কাফিরবাহিনীর জন্য সম্মিলিত বাহিনীর শব্দের চেয়েও ভয়ংকর।'

সেদিন তিনি নিজেকে ঢাল বানিয়ে রাসুলের সামনে মানববর্মে পরিণত হন। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ তিরন্দাজ ছিলেন। তির নিক্ষেপের ক্ষেত্রে অনেক কঠিনভাবে ধনুক টেনে তির চালাতেন। সেদিন তির নিক্ষেপ করতে গিয়ে প্রায় দু-তিনটা ধনুক ভেঙে ফেলেন। নবিজির পাশ দিয়ে কেউ তির নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে বলতেন, 'তুমি এগুলো আবু তালহাকে দিয়ে দাও।' একপর্যায়ে নবিজি মাথা উঁচু করে দেখতে চাইলে আবু তালহা বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন, আপনি মাথা উঁচু করে তাকাবেন না। আমি আশঙ্কা করছি—শত্রুর তির যেন আপনার গায়ে লেগে না যায়। আমি তাদের তিরের আঘাত সামলাতে আপনার সামনে বুক পেতে আছি!'[১৬]

নুসায়বা বিনতু কাআব মাজিনিও সেদিন নবিজির প্রতিরক্ষায় তির ও তরবারি চালাতে নামেন। এমনকি তাঁর শরীরে দৃশ্যমান একাধিক ক্ষত তৈরি হয়। আবু দুজানাও নিজের শরীরকে নবিজির সামনে মানবঢালে পরিণত করেন। ফলে তিরের আঘাতে তাঁর কোমরে একাধিক ছিদ্র তৈরি হয়।[১৭]

এরপর শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে জীবনোৎসর্গকারী সাহাবিরা নবিজির পাশে চলে আসেন। প্রথমেই আবু বকর ও আবু উবায়দা রা. এসে পৌঁছান। আবু উবায়দা নিজের দাঁত দিয়ে নবিজির চেহারা থেকে দুটি তির বের করেন। এরপর আরও প্রায় ৩০ জন সাহাবি নবিজির প্রতিরক্ষায় তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হন, যাঁদের মধ্যে কাতাদা, সাবিত ইবনু দাহদাহ, সাহল ইবনু হুনাইফ, উমর ইবনুল খাত্তাব, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, জুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. উল্লেখযোগ্য।

এরপর নবিজি ﷺ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উহুদের একটা উপত্যকার দিকে যান। মুশরিকদের

---

১৬ *সহিহ আস-সিরাতুন নাবাবিয়া* : ২৯৬।

১৭ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/৩৫-৩৬।

প্রতিহত করতে সক্ষম হলেও সাহাবিরা নিজেদের এবং নবিজির অবস্থা দেখে অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত ও পেরেশান হয়ে ওঠেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁদের হতাশা ও দিশেহারা পরিস্থিতির গুমোট ভাব দূর করতে আল্লাহ তাঁদের ওপর তন্দ্রার জাল বিস্তার করেন। ফলে তাঁরা কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বস্তির শ্বাস নিতে সক্ষম হন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ﴾

তারপর তোমাদের ওপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মতো। সে তন্দ্রায় তোমাদের কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল আল্লাহ সম্পর্কে—তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মূর্খদের মতো। তারা বলছিল, আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বলো, সবকিছুই আল্লাহর হাতে; তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে, তোমার কাছে প্রকাশ করে না। সেসবও তারা বলে, আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বলো, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে, তবু তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে, যাদের মৃত্যু লিখে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের মনে যা রয়েছে, তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আর তোমাদের মনে যা কিছু রয়েছে, তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। মনের ব্যাপারে গোপন বিষয় আল্লাহ জানেন। [সুরা আলে ইমরান : ১৫৪]

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, 'আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল' এ আয়াতে মুনাফিকদের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। এদিকে কুরাইশবাহিনী শেষ পর্যায়ে নিজেদের নিশ্চিত বিজয় থেকে নিরাশ হয়ে যুদ্ধের দীর্ঘসূত্রতায় বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল। মুসলিমরা তন্দ্রার পরিস্থিতির ভেতর পরিপূর্ণ স্বস্তিতে নবিজির সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। হতাশ কাফিররা তখন মুসলিমদের পিছু ধাওয়া না করে নিজেদের গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার পথ ধরে।[১৮]

---

[১৮] *নাজরাতুন নায়িম* : ১/৩০৫-৩০৬।

তিন. খায়বারযুদ্ধ ও খালিদ

১. খায়বারের পটভূমি ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ[১৯]

খায়বার মদিনা থেকে ৬০ অথবা ৮০ মাইল দূরের একটা শহর। এখানে দুর্গ এবং খেতখামারও ছিল। এখানকার আবহাওয়া তেমন ভালো নয়। এলাকাটা ছিল ইয়াহুদিদের ষড়যন্ত্রের আখড়া। এখান থেকেই মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো।

এদিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে খন্দকযুদ্ধের ত্রিমুখী শক্তির মধ্যে কুরাইশদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেও ইয়াহুদি এবং নজদের কয়েকটা গোত্র সম্পর্কে তখনো নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। তাই এদের ব্যাপারে হিসাবনিকাশ মিটিয়ে নেওয়ারও প্রয়োজন দেখা দেয়। কেননা, এতে সব দিক থেকে নিরাপত্তা লাভ সম্ভব হবে।

ফলে সপ্তম হিজরির মুহাররামে নবিজি ﷺ ১ হাজার ৪০০ সাহাবির এক বাহিনী নিয়ে খায়বারের উদ্দেশে রওনা করেন। মুসা ইবনু উকবা বলেন, হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর নবিজি ﷺ প্রায় ২০ দিন মদিনায় অবস্থান করেন। এরপর খায়বারের উদ্দেশে রওনা দেন। রওনার সময় তিনি সিবা ইবনু উরফুজাকে মদিনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে রেখে যান।[২০]

নবিজি ﷺ খায়বারে পৌঁছে ফজরের সালাত আদায় করেন। যুদ্ধ শুরুর আগে আলি রা.-এর হাতে পতাকা তুলে দেওয়া হয়। এরপর সেখানের অধিবাসীদের টানা ১৪ দিন কঠোরভাবে অবরোধ করে রাখেন। অবরুদ্ধ খায়বারবাসী একপর্যায়ে মুসলিমবাহিনীর কাছে এই শর্তে সন্ধিপ্রস্তাব নিয়ে আসে যে, দুর্গে যে-সকল সেনা রয়েছে, তাদের প্রাণভিক্ষা দেওয়া হবে এবং তাদের স্ত্রী, পুত্র-কন্যারা তাদের কাছেই থাকবে। অর্থাৎ, তারা মুসলিমদের দাস-দাসী হিসেবে বন্দি থাকবে না। তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ সোনা-রুপা, জায়গা-জমি, ঘোড়া, বর্ম ইত্যাদি সবকিছু রাসুল ﷺ-এর কাছে অর্পণ করবে, শুধু পরিধানের পোশাক নিয়ে বেরিয়ে যাবে।[২১] রাসুল ﷺ তাদের প্রস্তাব শুনে বলেন, 'যদি তোমরা কিছু গোপন করে রাখো, তাহলে এর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসুল দায়ী হবেন না। ইয়াহুদিরা তখন নবিজির এ শর্তও মেনে নেয়।

তবে রাসুল ﷺ যখন উপরিউক্ত শর্তে তাদের বহিষ্কারের ইচ্ছা করেন, তখন তারা

---

[১৯] *মুখতাসার জাদুল মাআদ*, ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহ.।

[২০] *মাগাজি, আল ওয়াকিদি* : ১১২; *সহিহ বুখারি* : ২/৬০৩-৬০৪।

[২১] *সুনানু আবি দাউদে* রয়েছে, রাসুল ﷺ এ শর্তে রাজি হয়েছিলেন যে, ইয়াহুদিরা তাদের বাহনে করে যতটা সম্ভব অর্থ-সম্পদ নিয়ে যেতে পারবে : ২/৭৬।

বলে, এই শর্তে আমাদেকে এখানেই থাকতে দিন যে, আমরা এখানের জমি চাষ করব এবং উৎপাদিত ফল ও ফসল থেকে আমরা অর্ধেক নেব আর বাকি অর্ধেক আপনি নেবেন। নবিজি ﷺ তাদের এ শর্তও মেনে নেন এবং সন্ধিচুক্তি চূড়ান্ত হয়।[২২]

২. খায়বারে কঠিন অবরোধ এবং মুনাফিকদের পিছু হটা

খায়বারযুদ্ধে বনু কুরায়জার সমর্থন পেয়ে সম্মিলিত কাফিরবাহিনী অবরোধ তীব্র করে তুললে মুসলিমদের প্রতিকূলতা বাড়তে থাকে। ফলে অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পবিত্র কুরআনে মুসলিমদের প্রতিকূল অবস্থার আলোচনা করা হয়েছে। তাঁরা যে ধরনের পেরেশানি ও আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার পরিপূর্ণ দৃশ্য এভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে,

﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ۝ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾

যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল উঁচু ও নিচু ভূমি থেকে এবং তোমাদের চোখ বিস্ফারিত আর প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল; আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা করতে শুরু করেছিলে, সে সময় মুমিনরা পরীক্ষিত ও ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিল। [সুরা আহজাব : ১০-১১]

ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও আল্লাহর ওপর মুসলিমদের অগাধ ভরসা ছিল, যার বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾

যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল তখন বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদের এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ইমান ও আত্মসমর্পণই বাড়ল। [সুরা আহজাব : ২২]

অন্যদিকে মুনাফিকরা মুসলিমবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ভীতি-শঙ্কায় নিপতিত হয়। একপর্যায়ে আমর ইবনু আওফ গোত্রের মুআত্তাব ইবনু কুশাইর বলে বসে, 'মুহাম্মাদ আমাদের একদিকে কিসরা ও কায়সারের ধনভান্ডার প্রাপ্তির সুসংবাদ

---

[২২] *আর-রাহিকুল মাখতুম*, মাওলানা সাফিউর রাহমান মুবারকপুরি।

শোনান; অথচ আমাদের অবস্থা এমন—নিরাপত্তাহীনতায় প্রাকৃতিক কাজ পর্যন্ত কেউ সারতে পারে না!’ তাদের কেউ কেউ নিজের আত্মীয়-পরিজনের নিরাপত্তাহীনতার অজুহাতে ময়দান ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি চায়।

মুনাফিকদের এ ধরনের আচরণ তাদের আত্মিক দুর্বলতা ও কাপুরুষতার বহিঃপ্রকাশ ছিল। তারা চেয়েছিল মুসলিমরা যেন শত্রুদের কবলে পড়েন। কিছু কিছু বর্ণনায় মুসলিমদের নিয়ে তাদের বিদ্রুপ করা, মুসলিমদের ভীতসন্ত্রস্ত করা এবং মিত্রহীনভাবে ময়দানে ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথাও পাওয়া যায়; যদিও সেসব সূত্র কিছুটা দুর্বল।[২৩]

অবস্থার দৃশ্যকল্পের বিবরণ কুরআনুল কারিম এভাবে তুলে ধরেছে,[২৪]

﴿وَ اِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا ۝ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا ۝ وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ؕ وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ مَسْـُٔوْلًا ۝ قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَ اِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؕ وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَ الْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ۚ وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ۝ يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ۚ وَ اِنْ يَّاْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ؕ وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا﴾

এবং যখন তাদের একদল বলছিল, হে ইয়াসরিববাসী, এটা টিকে থাকার মতো জায়গা নয়; তোমরা ফিরে চলো। তাদেরই একদল নবির কাছে

---

২৩ *মু’জামুল কাবির লিত-তাবরানি* : ১১/৩৭৬।

২৪ *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া আস-সাহিহা* : ২/৪২৪।

অব্যাহতি চেয়ে বলছিল, আমাদের বাড়িঘর খালি; অথচ সেগুলো খালি ছিল না—পালানোই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। যদি শত্রুপক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে মিলিত হতো; এরপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই দেরি করত না। অথচ তারা আগে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। বলুন, তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পালালে এই পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদের সামান্যই ভোগ করতে দেওয়া হবে।

বলুন, কে আল্লাহ থেকে তোমাদের রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অকল্যাণের বা অনুকম্পার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ ভালো করেই জানেন, তোমাদের কারা তোমাদের বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদের বলে, আমাদের কাছে এসো। তারা কমই যুদ্ধ করে; আর তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে তখন আপনি দেখবেন মৃত্যুভয়ে অচেতন ব্যক্তির মতো চোখ উলটিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। এরপর যখন বিপদ চলে যায়, তখন ধনসম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সঙ্গে বাক্‌চাতুর্যে নামে। তারা মুমিন নয়, তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। তারা মনে করে শত্রুবাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রুবাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসী থেকে তোমাদের সংবাদ জেনে নিত, তবেই ভালো হতো। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। [সুরা আহজাব : ১৩-২০]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহে মুনাফিকি ও এর প্রভাবে অন্তরের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার বিষয়গুলো স্পষ্ট করা হয়েছে। ফলে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আল্লাহর ওপর ভরসাহীনতা তৈরি হয়। পরীক্ষার সময় আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনের বিপরীতে বাক্‌চাতুর্যে লিপ্ত হওয়ার নিন্দা করা হয়েছে। তারা রাসুলের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করতে থাকে, যেন যুদ্ধের ময়দান থেকে তাদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তুচ্ছ অজুহাত তৈরি করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালানোর সংকল্প করতে থাকে। নিজেদের গৃহ-পরিজনদের নিরাপত্তাহীনতার দোহাই দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে চায়; অথচ তাদের এই প্রবণতা শুধু ইমানের দুর্বলতার কারণেই তৈরি হয়। শুধু তা-ই নয়, অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গেও এ ধরনের আচরণ কামনা করে এবং ঘরে ফিরে যেতে তাদের উদ্‌বুদ্ধ

করতে থাকে। আর এই প্রবণতা বাস্তবায়নে তারা ইমান ও ইসলামের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনি।[২৫]

৩. খালিদ ও খায়বারের যুদ্ধপরিস্থিতি

এদিকে পরিখা পাড়ি দিয়ে মদিনায় ঢুকতে কাফিরদের প্রচেষ্টা উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে। তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্যরা বৃহৎ-সংখ্যায় রাতব্যাপী পরিখার আশেপাশে আনাগোনা করতে থাকে। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে একটা অশ্বারোহী বাহিনী পরিখার অপেক্ষাকৃত সরু অংশ দিয়ে মুসলিমদের ওপর অতর্কিতে হামলার চেষ্টা করলে উসাইদ ইবনু হুদাইর ২০০ সেনার এক বাহিনী নিয়ে তাদের ওপর কঠোর নজরদারি করতে থাকেন। শত্রুদের সঙ্গে তখন বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। একপর্যায়ে হামজা রা.-এর হত্যাকারী ওয়াহশির বর্শার আঘাতে তুফায়েল ইবনু নুমান শহিদ হন।[২৬]

কাফিরবাহিনীর সদস্য হাব্বান ইবনু আরাকার নিক্ষিপ্ত তিরে সাআদ ইবনু মুআজ বাহুতে আঘাতপ্রাপ্ত হলে তাঁর হাতের রগ ছিঁড়ে যায়। তির নিক্ষেপ করতে গিয়ে হাব্বান চিৎকার করে বলছিল, 'ইবনু আরাকার পক্ষ থেকে এটা গ্রহণ করো।' প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সাআদ দুআ করছিলেন, 'আল্লাহ, যদি কুরাইশদের পক্ষ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরও যুদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে আপনি আমাকে জীবিত রাখুন। কেননা, আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আগ্রহী, যারা আপনার রাসুলকে কষ্ট দিয়েছে, মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, নিজের বাসস্থান থেকে বহিষ্কার করেছে। হে আল্লাহ, যদি আমাদের ও তাদের মধ্যকার যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন।[২৭] বনু কুরায়জার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে নিজের চক্ষু শীতল করা পর্যন্ত আপনি আমার জীবন দীর্ঘ করুন।'

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় এই বান্দার দুআ কবুল করেছিলেন। অনতিবিলম্বে বনু কুরায়জার বিরুদ্ধে তাঁকেই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হয়েছিল। তারপর কাফিরবাহিনী রাসুলের বাসস্থান অভিমুখে তাদের বিশেষ একটা দল পাঠায়। শত্রুর বিরুদ্ধে দিনব্যাপী মুসলিমরা প্রতিরক্ষাযুদ্ধ চালিয়ে যান। কাফিরদের পাঠানো বিশেষ দল রাসুলের বাসস্থানের নিকটবর্তী চলে এলে রাসুল ﷺ ও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবিরা আসরের সালাত আদায় করতে পারেননি। রাত ঘনিয়ে এলে শত্রুবাহিনী নিজেদের অবস্থানে ফিরে যায়। তখন রাসুল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাদের এবং তাদের

---

[২৫] প্রাগুক্ত : ২/৪২৫।

[২৬] *হাদিসুল কুরআনিল কারিম আন গাজাওয়াতির রাসুল* ﷺ : ২/৪২৪।

[২৭] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৬৯।

ঘর ও কবরসমূহ আগুনে ভরে দিন। কেননা, তারা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মধ্যবর্তী সালাত তথা আসরের সালাত থেকে বিরত রেখেছে।' একপর্যায়ে সূর্য ডুবে যাওয়ার মাধ্যমে আসর সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়।[২৮]

চার. হুদায়বিয়ায় রাসুলের অবস্থান এবং খালিদের বাহিনী

১. হুদায়বিয়ায় খালিদের অবস্থান এবং নবিজির পথ পরিবর্তন

রাসুল ﷺ সংবাদ পেয়েছিলেন কুরাইশরা তাঁকে বাধা দিতে বেরিয়ে পড়েছে। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে তাদের একটা দল মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করতে ঘাপটি মেরে বসে আছে। সংবাদ পেয়ে রাসুল ﷺ সংঘর্ষ এড়াতে পথ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'কে আছ, যে কুরাইশদের ওত পেতে থাকা রাস্তার পরিবর্তে অন্য রাস্তার সন্ধান দেবে?' আসলাম গোত্রের একজন বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি এ সেবাদানে প্রস্তুত।' এরপর তিনি পাহাড়ি পথ বেয়ে মুসলিমদের এগিয়ে নিয়ে যান। দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে প্রশস্ত উপত্যকার আরামদায়ক রাস্তায় পৌঁছলে রাসুল ﷺ মুসলিমদের বলেন, 'বলো, আমরা আল্লাহর ক্ষমাপ্রত্যাশী এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।' এরপর বলেন, 'এটি বনি ইসরাইলকে দেওয়া সেই তাওবার শব্দ 'হিত্তাহ' الْحِطَّةُ, যা তারা উচ্চারণ করেনি।'[২৯]

তারপর রাসুল ﷺ সাহাবিদের নির্দেশ দেন, 'হামাশ অঞ্চলের ডান দিক হয়ে ওই রাস্তা ধরে এগিয়ে যাও, যা সানিয়াতুল মিরারের দিকে এগিয়ে গেছে।' মক্কার নিম্নাঞ্চল হুদায়বিয়ার দিকে এ বাহিনী অত্যন্ত নীরবে এগিয়ে চলে। এদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী মুসলিমদের অগ্রযাত্রার সংবাদ পেয়ে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য দ্রুত মক্কাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মক্কাবাসী হুদায়বিয়া প্রান্তরে মুসলিমদের পৌঁছার খবর শুনে চিন্তিত হয়ে ওঠে।[৩০] মক্কার এতটা কাছে মুসলিমবাহিনীর পৌঁছে যাওয়ায় তারা এটাকে মক্কার নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করতে থাকে।

জেনারেল মাহমুদ শিত এ ব্যাপারে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, মুসলিমবাহিনীর যাত্রাপথ পরিবর্তন মূলত কাফিরদের ভয়ে ভীত হওয়ার কারণে ছিল না। কেননা, শত্রুর ভয়ে ভীত কোনো বাহিনী শত্রুর নিকটবর্তী স্থানে ছাউনি ফেলে না।[৩১] ভীতসন্ত্রস্ত হলে শত্রুদের থেকে দূরত্ব অবলম্বন করাই সাধারণ নিয়ম, যাতে আক্রমণ

---

[২৮] *সহিহ বুখারি* : ৪১১১।

[২৯] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ৩/৩৩৮।

[৩০] *গাজওয়াতুল হুদায়বিয়া*, আবু ফারিস : ২৯।

[৩১] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবু ফারিস : ৩৭৪।

করতে হলে শত্রুবাহিনীর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয় এবং তত দিনে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।[৩২]

ইকতিবাসুন নিজামিল আসকারি ফি আহদিন নাবি ﷺ গ্রন্থে নবিজির রাস্তা পরিবর্তনের কারণ আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, নতুন রাস্তায় যাত্রা করতে পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করা এবং নিরাপদ যাত্রা অব্যাহত রাখার বিষয়টা থেকে অনুধাবন করা যায়, বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান সেনাপতি নিজের বাহিনীর জন্য এ ধরনের রাস্তা অবলম্বন করে থাকেন, যা সাধারণত যেকোনো বিপদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকে। অভিজ্ঞ সেনাপতিমাত্র এমন রাস্তা এড়িয়ে চলতে চান, যেখানে শত্রুর হামলার আশঙ্কা থাকে।[৩৩]

২. খালিদের খালা মায়মুনার সঙ্গে নবিজির বিয়ে

মায়মুনা রা. ছিলেন আব্বাস রা.-এর স্ত্রী উম্মুল ফাজলের বোন। ২৬ বছর বয়সে তাঁর স্বামী আবু রুহম ইবনু আবদিল উজ্জা মারা গেলে তিনি আব্বাস রা.-এর স্ত্রীর ওপর নিজের বিয়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। উম্মুল ফাজল এ দায়িত্ব আব্বাসের হাতে অর্পণ করলে তিনি তাঁর ভাতিজা মুহাম্মাদের সঙ্গে ৪০০ দিরহাম মোহরের বিনিময়ে তাঁর বিয়ে দেন।[৩৪]

মায়মুনা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের খালা। হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী মক্কায় অবস্থানের তিন দিন পেরিয়ে গেলে নবিজি ﷺ চেয়েছিলেন মায়মুনার সঙ্গে বিয়ের অসিলায় তাঁদের ও কুরাইশদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য কিছু সময় বাড়াবেন; কিন্তু কুরাইশদের পক্ষ থেকে সুহাইল ইবনু আমর ও হুয়াইতিব ইবনু আবদিল উজ্জা প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে জানিয়ে দেয়, তাঁর মক্কায় অবস্থানের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে এসেছে। অতএব, তিনি যেন মক্কা ছেড়ে চলে যান। নবিজি তাদের বলেছিলেন, 'তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে বিয়ের উৎসব পালনের সুযোগ দাও, আমি তোমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করি আর তাতে তোমরাও শরিক হও!' তারা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, 'আপনার খাবারের কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের। আপনি দ্রুত মক্কা ছেড়ে চলে যান।'

নবিজি তখন মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং তাঁর আজাদকৃত দাস আবু রাফিকে মায়মুনার খিদমতে রেখে যান। রাসুল ﷺ যখন সারিফ নামক জায়গায় অবস্থান করেন, তখন মায়মুনাকে নিয়ে আবু রাফি সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে মায়মুনার দাম্পত্যজীবন শুরু হয়।[৩৫]

---

[৩২] *আর-রাসুলুল কায়িদ* : ১৮৬-১৮৭।
[৩৩] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবু ফারিস : ৩৭৪; *ইকতিবাসুন নিজামিল আসকারিয়া ফি আহদিন নাবি* : ২৫৮ থেকে।
[৩৪] *সুয়ার ওয়া ইবার মিনাল জিহাদিন নাবাবি ফিল মাদিনা* : ৩৬২।
[৩৫] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ৪/১৯।

মায়মুনা রা. শেষ সৌভাগ্যবান নারী, যিনি নবিজির স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি সবার শেষে ইনতিকাল করেন। নবিজির সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ যেখানে হয়েছিল, সেই সারিফ প্রান্তরেই তিনি ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়। একদিন সেখানেই তাঁর ওয়ালিমার আয়োজন করা হয়েছিল।

মায়মুনার সঙ্গে রাসুলের বিয়ে থেকে অত্যন্ত বিরোধপূর্ণ ফিকহি একটি মাসআলার উদ্ভব হয়। মাসআলার মূল উপপাদ্য হচ্ছে, রাসুল ﷺ মায়মুনাকে ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করেছিলেন, নাকি ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর?[৩৬] ফিকহশাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে এই মাসআলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পাঁচ. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইসলামগ্রহণ

১. উমরাতুল কাজার প্রভাব

উমরাতুল কাজার প্রভাব পুরো আরববিশ্বকে ইসলামের প্রতি অনুভূতিপ্রবণ করে তুলেছিল। মক্কার মুশরিকরাও যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল তাতে।

ড. মাহমুদ শিত খাত্তাব বলেন, উমরাতুল কাজা কুরাইশদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। কুরাইশের নেতারা দারুন নাদওয়ায় এবং অন্যরা পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে রাসুল ﷺ ও সাহাবিদের মক্কা প্রবেশের দৃশ্য অবলোকন করছিল। রাসুল ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে নিজের চাদরের নিচ থেকে ডান কাঁধ বের করে সাহাবিদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর দয়া করুন, যে মক্কার কুরাইশদের সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করে।' রাসুল ﷺ হাজরে আসওয়াদে চুমু খান এবং সাহাবিদের সঙ্গে তাওয়াফের ক্ষেত্রে বীরত্বপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করেন।

২. নববি আখলাকের প্রভাব এবং খালিদের অন্তরে ইসলামের সূর্যোদয়

উমরাতুল কাজার সময় রাসুলের আচার-আচরণের প্রভাব এতটাই ব্যাপক ছিল যে, তিনি মক্কা ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেই খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মক্কার নেতাদের সামনে একেবারে প্রকাশ্যে বলে বসেন, 'প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির সামনে এ কথা স্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ কোনো জাদুকর বা কবি নন। তাঁর কাছে পাঠানো বাণী নিঃসন্দেহে জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তাই বিবেকবানদের তাঁর অনুসরণ করা উচিত!'

---

[৩৬] *ফিকহুস সিরাহ*, ড. রামাজান বুতি : ৩৫৮।

আবু সুফিয়ান নিশ্চিত হতে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কি এমন বক্তব্য দিয়েছেন?' খালিদ ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্ধত হন। তখন ইকরিমা ইবনু আবি জাহল তাকে নিবৃত্ত করে বলেন, 'আবু সুফিয়ান, অপেক্ষা করো। আল্লাহর কসম, খালিদ যে চিন্তা করেন, মুখে তা-ই উচ্চারণ করেন। স্বাধীন মতপ্রকাশের কারণে তুমি তাঁর সঙ্গে লড়াই করবে? অথচ সমগ্র আরবের জনগণ তাঁর হাতে বায়আত হয়ে আছে! আল্লাহর শপথ, আমার মনে হয় এক বছরের মধ্যে সমগ্র আরবের জনগণ মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে যাবে!'

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পর আমর ইবনুল আসও ইসলামগ্রহণ করেন। এদিকে বায়তুল্লাহর তত্ত্বাবধানকারী উসমান ইবনু তালহাও তখন মুসলমান হন। মক্কার প্রতিটা ঘরে প্রকাশ্যে বা গোপনে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উমরাতুল কাজার মাধ্যমে মক্কাবিজয়ের আগেই মুসলিমরা মক্কাবাসীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন।[৩৭]

উসতাজ আব্বাস মাহমুদ আক্কাদ বলেন, উমরাতুল কাজার সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো, ইসলামের আকর্ষণীয় আচরণে প্রভাবিত হয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলামগ্রহণ। বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সাহসিকতায় এ দুই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মক্কাবাসীকে তাঁদের অনুসরণে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।[৩৮]

৩. আমর ইবনুল আসের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও ইসলামগ্রহণ

ক. আমর ইবনুল আসের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : আমর ইবনুল আস ইবনু ওয়াইল সাহমি। উপাধি : আবু মুহাম্মাদ ও আবু আবদিল্লাহ। ইবনু ইসহাক[৩৯] ও জুবায়ের ইবনু বাক্কার[৪০] এ ব্যাপারে একমত যে, আবিসিনিয়ায় বাদশাহ নাজাশির দরবারেই তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। অষ্টম হিজরির সফর মাসে তিনি মদিনায় হিজরত করেন। ইবনু হাজার বলেন, তিনি মক্কা বিজয়ের আগে অষ্টম হিজরিতে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেন। হুদায়বিয়া ও খায়বারযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো একসময় তিনি ইসলামগ্রহণ করেছেন বলেও কথিত আছে।[৪১]

---

[৩৭] *আর-রাসুল আল-কাইদ* : ২০৯-২১০।

[৩৮] *আবকারিয়াতু মুহাম্মাদ* : ৬৯।

[৩৯] *আল-মুজামুল কাবির*, তাবারানি : ৯/৩৫।

[৪০] *আল-ইসাবাহ* : ২/৩।

[৪১] *তাহজিবুত তাহজিব* : ৮/৫৬।

খ. আমর ইবনুল আসের জবানিতে তাঁর ইসলামগ্রহণ

আমর ইবনুল আস রা. নিজেই তাঁর ইসলামগ্রহণের ঘটনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, খন্দকযুদ্ধ থেকে মক্কায় ফিরে আমি আমার কাছের আত্মীয়-বন্ধুদের ডেকে বলি, 'তোমরা জেনে রেখো, মুহাম্মাদের কথা সকল কথার ওপর বিজয়ী হবে, এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমার একটা অভিমত রয়েছে, বিষয়টা তোমরা ভেবে দেখতে পারো। চলো, আমরা নাজাশি বাদশাহর কাছে চলে যাই। মুহাম্মাদ যদি আমাদের ওপর বিজয়ী হন, আমরা নাজাশির কাছেই থেকে যাব; আর আমাদের সম্প্রদায় যদি বিজয়ী হয়, তাহলে তো আমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি প্রমাণিত হব। সে ক্ষেত্রে নাজাশি আমাদের সঙ্গে উত্তম আচরণই করবেন। আমার এই প্রস্তাব সবাই মেনে নেয়। নাজাশির জন্য কী উপহার নেওয়া যায়, আলোচনা করি। উপহার দেওয়ার মতো সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু ছিল আমাদের এখানকার চামড়া। আমরা বেশকিছু চামড়া নিয়ে আবিসিনিয়ায় যাই।

আমরা নাজাশির দরবারে যাচ্ছি, এমন সময় আমর ইবনু উমাইয়া আদ দামরিও সেখানে পৌঁছেন। রাসুল ﷺ বিশেষ কোনো প্রয়োজনে তাঁকে মদিনা থেকে জাফর ইবনু আবি তালিবের কাছে পাঠিয়েছেন। জাফর তখনো আবিসিনিয়ায় ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমর নাজাশির দরবার থেকে বেরিয়ে যান। সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করতে নাজাশিকে আমরা অনুরোধ করব। অনুরোধে সাড়া দিয়ে তিনি যদি তাকে আমাদের হাতে তুলে দেন, তাহলে আমরা তাকে হত্যা করব। এতে কুরাইশরা বুঝবে, আমরা মুহাম্মাদের দূতকে হত্যা করে বদলা নিয়েছি।

এ সিদ্ধান্তের পর আমি নাজাশির কাছে গিয়ে তাঁর সামনে যথারীতি কুর্নিশ করলাম, যেমনটা আমি আগে থেকে করে আসছি। তিনি আমাকে 'হে আমার বন্ধু, তোমায় স্বাগত' বলে বরণ করে নিয়ে বলেন, 'তোমার দেশ থেকে আমার জন্য কোনো উপহার আনোনি?' আমি বলি, 'হ্যাঁ, এনেছি বাদশাহ মহোদয়। আপনার জন্য বিপুল পরিমাণে চামড়া হাদিয়া এনেছি।' এরপর আমাদের উপহারসামগ্রী তাঁর সামনে পেশ করি। উপহারগুলো তাঁর খুবই পছন্দ হয়। তারপর বলি, 'এইমাত্র যে লোকটা আপনার দরবার থেকে বেরিয়ে গেল, সে আমাদের ঘোরতর শত্রুর দূত। আপনি তাকে আমাদের হাতে তুলে দিলে আমরা তাকে হত্যা করব! কারণ, মুহাম্মাদ আমাদের বেশ কজন গোত্রপ্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।'

আমার এ কথায় নাজাশি ক্রোধে ফেটে পড়েন। তিনি অমনি হাত বাড়িয়ে নিজের নাকে এমন জোরে ঘুসি মারেন; ভাবলাম নাক হয়তো থেঁতলে গেছে। বাদশাহর এহেন আচরণ দেখে মনে হলো জমিনে আমার জন্য ফাটল ধরুক; আর আমি তাতে ঢুকে

যাই। অবস্থা বেগতিক দেখে বিনীতভাবে বলি, 'আমার এ আবেদন আপনাকে এতটা উত্তেজিত করবে, বুঝতে পারলে তা করতাম না।'

নাজাশি বললেন, 'তুমি কি চাও, যাঁর কাছে নামুসে আকবর (জিবরিল আ.) আসেন—যিনি মুসা আ.-এর কাছেও এসেছেন—তাঁর দূতকে আমি হত্যার জন্য তোমাদের হাতে তুলে দেবো?' আমি বলি, 'সত্যিই কি তিনি এমন ব্যক্তি?' তিনি বললেন, 'আমর, তোমাদের অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। আমার কথা শোনো। তোমরা তাঁর আনুগত্য করো। আল্লাহর শপথ, তিনিই সত্যপন্থি। তিনি তাঁর বিরোধীদের ওপর বিজয়ী হবেন; যেমন হয়েছিলেন মুসা আ. ফিরআউন ও তার লোকদের ওপর।' আমি বলি, 'আপনি তাহলে তাঁর পক্ষে আমার বায়আত বা আনুগত্যের শপথ নিন!' তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর হাতে ইসলামের বায়আত হয়ে আমার সাথিদের কাছে ফিরে যাই; কিন্তু তখন আমার চিন্তাধারায় যে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে, তার কিছুই তাদের কাছে প্রকাশ করিনি।

এবার রাসুলের হাতে বায়আত হতে আবিসিনিয়া থেকে রওনা হই। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সঙ্গে। তিনিও মক্কা থেকে মদিনায় যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করি, 'আবু সুলায়মান, কোথায় যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, মারাত্মক পরীক্ষার সম্মুখীন। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি নবি। এখন দ্রুত ইসলাম কবুল করা উচিত। এই দ্বিধাসংশয়ে আর কত ডুবে থাকব?' বললাম, 'আমিও তো এই উদ্দেশ্যেই চলছি!' এরপর দুজন একসঙ্গে রাসুলের খিদমতে গেলাম। আমাদের দেখেই নবিজির চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সাহাবিদের লক্ষ্য করে বললেন, 'মক্কা তাঁর কলিজার মূল্যবান অংশসমূহ তোমাদের প্রতি ছুড়ে মারছে!'

প্রথমে খালিদ নবিজির হাতে বায়আত হন। তারপর আমি একটু কাছে এসে নিবেদন করি, 'আল্লাহর রাসুল, আমিও বায়আত হব। তবে আমার আগের সব অপরাধ ক্ষমা করে দিতে হবে।' তিনি বললেন, 'আমর, বায়আত হও। ইসলাম আগের সকল পাপ মুছে দেয়, হিজরতও আগের যাবতীয় অপরাধ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।' আমি তখন প্রিয়নবির হাতে বায়আত হয়ে ফিরে যাই।[৪২]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, আমর ইবনুল আস বলেন, এরপর আল্লাহ যখন আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে দেন, তখন আমি রাসুলের দরবারে গিয়ে নিবেদন করি, 'আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়আত হতে চাই।' তিনি হাত বাড়িয়ে দিলে আমি আমার হাত টেনে নিই। রাসুল ﷺ বললেন, 'আমর, কী ব্যাপার?'

---

[৪২] *সহিহ আস-সিরাতুন নাবাবিয়া* : ৪৯৪; *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ২/২৭৬; *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৬০।

বলি, 'আগে আমি শর্ত করে নিতে চাই।' জিজ্ঞেস করেন, 'কী শর্ত করবে?' উত্তরে বলি, 'আল্লাহ যেন আমার সব গুনাহ মাফ করে দেন।' তিনি বললেন, 'আমর, তুমি কি জানো না, ইসলাম পূর্ববর্তী যাবতীয় অন্যায় মিটিয়ে দেয়; আর হিজরত তার আগের অপরাধ মুছে ফেলে; অনুরূপ হজও আগের সব পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।'[৪৩]

৪. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইসলামগ্রহণ

ক. খালিদের ইসলামগ্রহণের জন্য রাসুলের দুআ

রাসুল ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইসলামগ্রহণের জন্য দুআ করতেন। তিনি বলতেন, 'আল্লাহ, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, সালামা ইবনু হিশাম এবং দুর্বল মুসলিমদের কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি দাও।' এ দুআর বরকতে আল্লাহর রহমতে সপ্তম হিজরিতে খালিদ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন।[৪৪]

খ. খালিদের জবানিতে তাঁর ইসলামগ্রহণ

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর ইসলামগ্রহণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, যখন আল্লাহ আমার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, আমার অন্তরে ধীরে ধীরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসার মনোভাব সৃষ্টি করে দেন। আমার মনে প্রশ্ন জাগত, আমি মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে প্রতিটা যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। প্রতিটা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরার সময় ভাবতাম, হয়তো আমি অনুপযুক্ত স্থানে যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছি। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ সবার ওপর বিজয়ী হয়ে আসবেন। রাসুল ﷺ যখন হুদায়বিয়ার দিকে যাত্রা করেছিলেন, তখন আমি মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। উসফান প্রান্তরে আমরা মুসলিমদের মুখোমুখি হই। মুহাম্মাদ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে জুহরের সালাত আদায় করেন। আমরা একবার ভেবেছিলাম, তাদের ওপর অতর্কিতে হামলা করব; কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হামলা না করা আমাদের জন্য কল্যাণকর ছিল। তিনি যেন আমাদের মনস্থিত ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছিলেন, ফলে আসরের সালাতের ক্ষেত্রে 'সালাতুল খাওফ' আদায় করেন। সালাতের অবস্থার পরিবর্তন দেখে আমি প্রভাবিত হয়ে পড়ি। আমার মনে কল্পনার উদয় হয়, এ লোক নিঃসন্দেহে কারও রক্ষণাবেক্ষণে পরিচালিত হচ্ছে!

এরপর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এবং তিনি আমাদের রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরে এগিয়ে যান। যখন কুরাইশরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে এবং তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে

---

[৪৩] *সহিহ মুসলিম* : ১২১।

[৪৪] *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ১৬৩।

বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেয়, তখন ভাবছিলাম, এখন আর কী-ই-বা করার আছে? কোথায় যাওয়া যায়?

একবার ভাবছিলাম আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশির কাছে চলে যাব। আবার ভাবছিলাম, যেহেতু তিনি নিজেই মুহাম্মাদের আনুগত্য গ্রহণ করেছেন এবং মুহাম্মাদের সঙ্গীরা তাঁর কাছে নিরাপদ আশ্রয়ে আছে, সেখানে গিয়ে কী হবে? আবার ভাবছিলাম, কোনোভাবে হিরাক্লিয়াসের কাছে চলে গিয়ে ধর্ম ত্যাগ করে ইয়াহুদি বা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে অনারবদের সঙ্গে তাদের অনুগামী হয়ে বসবাস শুরু করব। কখনো ভাবছিলাম, সবার সঙ্গে নিজ এলাকাতেই স্বাভাবিকভাবে বসবাস করতে থাকি। ইতিমধ্যে রাসুল ﷺ উমরাতুল কাজা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। আমি মক্কা থেকে বেরিয়ে গেলাম। তিনি যতদিন এখানে ছিলেন, ততদিন মক্কায় আসিনি। আমার ভাই ওয়ালিদ ইবনুল ওয়ালিদও রাসুলের সঙ্গে উমরা করেছিল। সে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমার সাক্ষাৎ পায়নি। তারপর আমার কাছে এই মর্মে চিঠি লিখে যায়,

> *বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।*
>
> *ইসলামের ব্যাপারে তোমার নেতিবাচক আচরণে আমি বিস্মিত। তুমি যথেষ্ট বিচক্ষণ। বিচক্ষণ কোনো মানুষ কি এখনো ইসলাম সম্পর্কে অনবগত থাকতে পারে? রাসুল ﷺ আমাকে তোমার ব্যাপারে বার বার জিজ্ঞেস করেছেন এবং বলেছেন, 'খালিদ কোথায়?' আমি বলেছি, 'আল্লাহ তাকে নিয়ে আসবেন।' আমার উত্তর শুনে তিনি বলেছেন, 'খালিদের মতো ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারে না। যদি সে মুসলিমদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে নিজের শক্তিপ্রদর্শন করত, তাহলে তা তার জন্য কল্যাণকর হতো। যদি সে আমাদের সঙ্গে মিলিত হতো, তাহলে অবশ্যই তাকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দিতাম।'*
>
> *আমার ভাই, যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে, এবার ফিরে এসো। অনেক সৌভাগ্য তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে, এবার তো ফিরে এসো।*

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বলেন, আমার কাছে যখন ভাই ওয়ালিদের চিঠি এসে পৌঁছায়, তখন ইসলামের প্রতি আমি আরও আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। রাসুলের কথা শুনে দারুণ আনন্দ অনুভব করি এবং পুলকিত হই। ইতিমধ্যে একদিন স্বপ্নে দেখি, আমি একটা অন্ধকার সংকীর্ণ জায়গায় বসে আছি। খানিক পর আলোকিত প্রশস্ত একটা জায়গায় গিয়ে উপনীত হই। আমি মনে মনে বলছিলাম, এটা একটা অস্বাভাবিক স্বপ্ন। মদিনায় গেলে আবু বকরকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেন,

‘তুমি যে অন্ধকার সংকীর্ণ জায়গা দেখেছিলে, তা ছিল কুফর-শিরকের অন্ধকার। আর যে প্রশস্ত আলোকিত জায়গা দেখেছিলে, তা ছিল ইসলামের আলোকোজ্জ্বল আঙিনা।’

এরপর যখন আল্লাহর রাসুলের দরবারে যাওয়ার চিন্তা করি, তখন মনে মনে ভাবছিলাম, কাকে সঙ্গে নেব। অনেক ভেবেচিন্তে সাফওয়ান ইবনু উমাইয়ার সঙ্গে দেখা করে তাকে বলি, ‘আবু ওয়াহাব, তুমি কি দেখছ—দিন দিন আমাদের অবস্থা কতটা শোচনীয় হচ্ছে? ধীরে ধীরে আমরা কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছি। এদিকে আরব-অনারব সর্বত্র মুহাম্মাদের বিজয়কেতন উড়ছে। যদি আমরা তাঁর কাছে গিয়ে আনুগত্য গ্রহণ করি; আর ইতিমধ্যে তিনি আরবদের মধ্যে সম্মানিত অবস্থানে পৌঁছে গেছেন, তাহলে কতই-না ভালো হতো!’

আমার কথা শুনে সাফওয়ান তা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে বলে, ‘যদি সমগ্র কুরাইশ ইসলামগ্রহণ করে, তবু আমি করব না।’ এমন উত্তর শুনে আমি তার থেকে আলাদা হয়ে যাই। মনে মনে ভাবছিলাম, যেহেতু ইতিপূর্বে বদরযুদ্ধে তার বাপ-ভাই নিহত হয়েছে, এ জন্য হয়তো সে প্রতিশোধের নেশায় দিন গুনছে। এরপর ইকরিমা ইবনু আবি জাহলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। তাকেও অনুরূপ বলি। সে-ও সাফওয়ানের মতো কথা শোনায়। আমি তাকে বলি, ‘ঠিক আছে, এ কথা কাউকে বলো না।’ আমি মনে করছিলাম, যেহেতু বদরযুদ্ধে তার আত্মীয়স্বজন নিহত হয়েছে, তাই সে অন্য কিছু ভাবছে। তবে আমি তার সামনে সেসব কথা আলোচনা করা সমীচীন মনে করিনি।

এবার ভাবলাম একাই মুহাম্মাদের দরবারে চলে যাই। আমার ভয় কীসের? এরপর একাকী মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ি। পথিমধ্যে উসমান ইবনু তালহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তার সঙ্গে খোলামেলা সব আলোচনা করি। তাকে বলি, ‘মুহাম্মাদের সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ওই শেয়ালের মতো, যে গুহায় বসে আছে; কিন্তু সে যখন চাইবে পানি ঢেলে তাকে বের করতে পারে এবং শেয়ালটা তখন বেরোতে বাধ্য হবে।’ তাকেও আমি মদিনায় গিয়ে রাসুলের আনুগত্য করার কথা বলি এবং সে তাৎক্ষণিক আমার কথায় ইতিবাচক সায় দেয়। আমাকে বলে, ‘আজ সকালেই আমি এ ব্যাপারে ভাবছিলাম। দেখো, আমার বাহন এখনো একদম প্রস্তুত আছে।’

এরপর এই বলে যাত্রা শুরু করি যে, আমরা ইয়াজিজ প্রান্তরে একত্রিত হব। যদি সে আমার আগে পৌঁছে যায়, তাহলে আমার জন্য অপেক্ষা করবে; আর আমি আগে গেলে তার জন্য অপেক্ষা করব। রাতের আঁধারে আমরা যাত্রা করি। ফজরের আগেই ইয়াজিজ প্রান্তরে একত্রিত হই। সকাল হলে একত্রে যাত্রা অব্যাহত রাখি। হাদ্দাহ নামক স্থানে আমর ইবনুল আসের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে আমাদের স্বাগত জানায়।

আমরাও সানন্দে তার সঙ্গে মিলিত হই। আমাদের গন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আমরা তাকে উলটো তার গন্তব্য জিজ্ঞেস করি। উত্তর না দিয়ে সে আবার আমাদের যাত্রার কারণ জানতে চায়। আমরা জানাই, 'ইসলামগ্রহণ ও মুহাম্মাদের অনুসারী হতে যাচ্ছি।' সে-ও আমাদের মতোই মনোভাব প্রকাশ করে।

এরপর একসঙ্গে আমরা মদিনায় পৌঁছাই। হাররাহ নামক স্থানে বাহনগুলো বেঁধে আমরা রাসুলের দরবারে যাই। নবিজিকে আমাদের আগমনের সংবাদ দেওয়া হলে তিনি দারুণ আনন্দিত হন। আমি তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে উত্তম পোশাক পরে রওনা হই। রাস্তায় সহোদর ওয়ালিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে বলে, 'দ্রুত চলো, নবিজিকে তোমার আগমন-সংবাদ জানানো হয়েছে। তিনি খুব খুশি হয়েছেন এবং তোমাদের অপেক্ষা করছেন।' আমি তখন দ্রুত রাসুলের দরবারে উপস্থিত হই। আমাকে দেখে তিনি মুচকি হাসেন। আমি তাঁকে অভিবাদন জানাই। হাসিমুখে তিনি উত্তর দিলে আমি বলি, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল।'

উত্তরে তিনি বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাকে হিদায়াত দান করেছেন। তোমার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা থেকে আমার প্রত্যাশা ছিল, আল্লাহ তোমাকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবেন।' আমি তখন বলি, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি তো জানেন, আমি প্রতিটা রণাঙ্গনে আপনার বিরুদ্ধে ছিলাম। আমার সেসব পাপের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন।' নবিজি বলেন, 'নিঃসন্দেহে ইসলাম আগের যাবতীয় পাপ মিটিয়ে দেয়।' আমি বলি, 'তবু আপনি আলাদা করে প্রার্থনা করুন।' তিনি তখন প্রার্থনা করে বলেন, 'হে আল্লাহ, খালিদ আপনার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরিতে আজ পর্যন্ত যত পাপ করেছে, তাঁর সব ক্ষমা করে দিন!'

তারপর আমর ইবনুল আস এবং উসমান ইবনু তালহাও নবিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর হাতে বায়আত হন। খালিদ রা.-এর বর্ণনামতে, তিনি অষ্টম হিজরির সফর মাসে ইসলামগ্রহণ করেন। খালিদ বলেন, আমার ইসলামগ্রহণের পর রাসুল ﷺ সংকটপূর্ণ যেকোনো মুহূর্তে সাহাবিদের মধ্যে আমার ওপরই বেশি ভরসা করতেন।[৪৫]

গ. খালিদের ইসলামগ্রহণ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা

১. কাফির থাকতেই খালিদ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, শেষপর্যন্ত রাসুল ﷺ-ই বিজয়ী হবেন। তিনি বলেন, 'আমি রাসুলের বিরুদ্ধে প্রতিটা যুদ্ধে উপস্থিত

---

[৪৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/২৩৯-২৪০; *আত-তারিখুল ইসলামি*, হুমায়দি : ৭/৯৫।

থাকলেও দেখতে পাচ্ছিলাম, প্রতিটা ক্ষেত্রেই তিনি বিজয়ী হচ্ছেন আর আমরা পরাজিত হচ্ছি। মনে হচ্ছিল অচিরেই তিনি পুরো আরবে বিজয়ী ও নেতৃত্ব প্রদানকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন।'[৪৬] তাঁর এ স্বীকারোক্তি ইসলামের শত্রুদের জন্য নিঃসন্দেহে চিন্তনীয় বিষয় হতে পারে।

২. কারও যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান তার ওপর একধরনের প্রভাব বিস্তার করে। খালিদকে লক্ষ্য করে রাসুলের বক্তব্য—'খালিদের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে অনবগত থাকতে পারে না। কতই-না ভালো হতো, যদি সে তার সামর্থ্য ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ব্যবহার করত, আমরাও তাকে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে রাখতাম।' রাসুলের এমনতর প্রশংসাপূর্ণ কথা তাঁর অন্তরে গভীর রেখাপাত করে ইসলামগ্রহণে উদ্দীপ্ত করে তোলে। নবিজি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তারে ছিলেন অত্যন্ত কুশলী। তিনি খালিদের সামনে তাঁর সহজাত নেতৃত্বের গুণাবলি, বুদ্ধিমত্তা ও সামর্থ্যের প্রশংসা করলে যে নেতৃত্বপ্রীতি এতদিন তাঁর ইসলামগ্রহণে অন্তরায় হয়ে ছিল, তা উধাও হয়ে যায়। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে অনুভব করেন, ইসলামগ্রহণের ফলে তাঁকে পিছিয়ে থাকতে হবে না; বরং তাঁর যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে, তখন শয়তানের কুমন্ত্রণা পরাজিত হয় এবং তিনি উদ্‌বুদ্ধ হন। আমর ইবনুল আস ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইসলামগ্রহণ ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি আর কাফিরদের লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শৌর্যবীর্যের অধিকারী এই দুই মহানায়কের হাতে অর্জিত ইসলামি বিজয়গাথা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমদের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।[৪৭]

---

৪৬ *সুলহু হুদায়বিয়া*, আবু ফারিস : ২৬৩।

৪৭ *আত-তারিখুল ইসলামি*, হুমায়দি : ৭/৯৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুতাযুদ্ধের নেতৃত্বে খালিদ, তাঁর বীরত্ব ও সাইফুল্লাহ উপাধি লাভ

এখানে আমরা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা করব, যাতে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলোচনা বুঝতে সহজ হয় এবং আগের বিষয়গুলো সম্পর্কে পাঠকের কাছে স্পষ্ট ধারণা থাকে।

এক. মুতাযুদ্ধের[৪৮] সংক্ষিপ্ত বিবরণ

'মুতা' শামের বালকা শহরের পার্শ্ববর্তী একটা এলাকা। বায়তুল মাকদিস থেকে প্রায় দুই মঞ্জিল দূরে এর অবস্থান। এখানেই মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধের কারণ ছিল—সপ্তম হিজরিতে রাসুল ﷺ কাজা উমরা থেকে ফিরে এসে জিলহজের শেষ দিনগুলোসহ পরবর্তী চার মাস মদিনায় অবস্থান করেন। এরপর মদিনার নিরাপত্তাবিধান ও শামের মুসলিমদের ওপর রোমানদের অব্যাহত অত্যাচার দমনের উদ্দেশ্যে অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলায় এই অভিযান পাঠান।

এ ছাড়া ওয়াকিদির বর্ণনায় রয়েছে, রোম সম্রাট কায়সারের পক্ষ থেকে বসরার গভর্নর ছিল আমর ইবনু শুরাহবিল। সে নবিজির দূত হারিস ইবনু উমায়েরকে হত্যা করে। আর দূতহত্যা ছিল তখনকার রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা ছিল যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তর। ফলে মুসলিমদের যুদ্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

নবিজি ﷺ হারিস ইবনু উমায়েরের শাহাদাতের সংবাদ পেয়ে জায়েদ ইবনুল হারিসার নেতৃত্বে ৩ হাজার সেনার এক বাহিনী আমর ইবনু শুরাহবিলের বিরুদ্ধে পাঠান। জায়েদের বাহিনী মুতায় পৌঁছলে রোমানরা সংবাদটা পেয়ে যায়। ফলে তারা দেড় লাখ সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে।

---

[৪৮] *সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া ﷺ*, মুফতি শফি রাহ. : ৮২।

কয়েকদিন যুদ্ধ চলার পর আল্লাহ মাত্র ৩ হাজার মুসলিমের ভীতি দেড় লাখ কাফিরের বিশাল বাহিনীর অন্তরে এমনভাবে সঞ্চার করে দেন যে, যুদ্ধ থেকে পালানো ছাড়া কোনো উপায় তারা খুঁজে পায়নি।

দুই. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বগ্রহণ

যুদ্ধের একপর্যায়ে সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা শাহাদাতবরণ করেন। স্বভাবতই সেনাদের মনোবল ভেঙে পড়ার কথা। তখন সাবিত ইবনু আকরাম ইবনু সালাবা রা. মুসলিমবাহিনীর পতাকা অবনমিত হতে দেখে এগিয়ে গিয়ে তা ধারণ করেন এবং চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করেন, 'হে মুসলিমরা, তোমরা কাউকে নেতা নির্বাচিত করে নাও।' সবাই চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'আপনি আমাদের আমির।' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি এর যোগ্য নই।' তারপর সর্বসম্মতিক্রমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে নেতা নির্বাচিত করা হয়।[৪৯]

ভয়াবহ এ পরিস্থিতিতে মুসলিমবাহিনীকে বিশাল বিপর্যয় থেকে বের করে আনাই ছিল খালিদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি তখন বিভিন্ন পদক্ষেপ ও তার সম্ভাব্য ফল নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান—এই মুহূর্তে যুদ্ধ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেওয়াই হবে সর্বোত্তম কাজ। কারণ, শত্রুবাহিনী তাঁদের চেয়ে ৬৬ গুণ বেশি। তারপর নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যেসব পদক্ষেপ নেন :

- মুসলিম ও রোমান সেনাদের মধ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা, যেন নিরাপদে যুদ্ধের ময়দান ত্যাগ করা সম্ভব হয়।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শত্রুপক্ষকে এই বিভ্রান্তিতে ফেলতে হবে যে, আমাদের কাছে এখনো রিজার্ভ বাহিনী প্রস্তুত আছে, যাতে বিভ্রান্ত শত্রুপক্ষের আক্রমণ কিছুটা হালকা হয়ে আসে এবং সুযোগ বুঝে মুসলিমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে পারেন।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে খালিদ রা. বিকাল পর্যন্ত মুসলিমবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ় রাখেন। এরপর রাতের আঁধারে বাহিনীর অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলেন। ডান দিকের সেনাদের বাম দিকে আর বাম দিকের সেনাদের ডান দিকে সন্নিবেশিত করেন। এভাবে সামনের সেনাদের পেছন দিকে আর পেছনের সেনাদের সামনে নিয়ে আসেন। সেনাবাহিনীর অবস্থান পরিবর্তনকালে জোরে তাকবিরধ্বনির মাধ্যমে ময়দানজুড়ে এক উত্তাল পরিস্থিতির আবহ তৈরি করেন। ফজরের

---

[৪৯] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ৪/২৮।

সালাতের পরপরই শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অব্যাহত আক্রমণের মাধ্যমে তাঁরা শত্রুবাহিনীকে এ কথা জানান দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন যে, আমাদের সাহায্যে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ নতুন তাজাদম বাহিনী এসে পৌঁছেছে![৫০]

খালিদের কৌশল সফল হয়। সকাল হতেই নতুন পতাকাবাহী ও চেহারার যোদ্ধাদের সম্মুখযুদ্ধে নামতে দেখে শত্রুবাহিনী এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, মুসলিমদের কাছে নতুন সাহায্যকারী বাহিনী এসে পৌঁছেছে; আর এ জন্যই তাঁরা আজ এভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মুসলিমদের দুঃসাহসী আক্রমণ শত্রুবাহিনীকে হতোদ্যম করে দেয়। তারা এটা ধরে নেয় যে, মুসলিমদের নিশ্চিত পরাজিত করার যে পরিকল্পনা তারা করে এসেছিল, তা ভেস্তে যেতে চলেছে। খালিদের অভূতপূর্ব সেনাবিন্যাস তাদের মনোবল ভেঙে দেয়। তারা আগের সাহস ও উদ্যম হারিয়ে ফেলে। ফলে মুসলিমবাহিনীর ওপর তাদের আক্রমণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।

এদিকে খালিদ কৌশলে মুসলিমবাহিনীকে পেছনে সরিয়ে আনা শুরু করেন। মুতার যুদ্ধ থেকে তাঁর এমন সফল প্রত্যাবর্তন বিশ্বজনীন যুদ্ধ-ইতিহাসে অভিজ্ঞ সমরনীতির এক অনন্য নিদর্শন। পরিস্থিতির আলোকে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ যৌক্তিক ও সফল বিবেচিত হয়। তিনি প্রথমে মধ্যভাগের সেনাদের সহযোগিতায় বাম দিকের সেনাদের ডান দিকে পেছনে সরিয়ে আনেন। এরপর উভয় দিকের সেনাদের নিরাপত্তা-বেষ্টনীতে মধ্যভাগের সেনাদেরও সরিয়ে নিয়ে আসেন। এভাবেই পুরো বাহিনী শত্রুদের আক্রমণের আওতা থেকে বেরিয়ে আসে।[৫১]

ইতিহাসবিদদের মতে, এই ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলিমবাহিনীর মাত্র ১২ জন শহিদ হন। খালিদ নিজে বলেন, মুতার যুদ্ধে আমার হাতে নয়টা তরবারি ভাঙে। শেষপর্যন্ত আমার কাছে শুধু ইয়ামেনি একটা খঞ্জর অক্ষত ছিল![৫২]

খালিদের কৌশলী পরিকল্পনায় আল্লাহ নিশ্চিত পরাজয় থেকে মুসলিমদের বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। পরিস্থিতির আলোকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের এভাবে নিরাপদে বের করে আনতে পারাই মুসলিমদের জন্য বড় বিজয় বিবেচিত হয়। ভয়াবহ পরিস্থিতিতে কৌশলী পদক্ষেপে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিজেদের গুটিয়ে আনতে পারা নিঃসন্দেহে মুসলিমবাহিনীর জন্য ছিল বড় ধরনের একটা সফলতা।[৫৩]

---

[৫০] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ২/৭৬৪।

[৫১] *মাআরিকু খালিদ ইবনিল ওয়ালিদ* : ১৭৩।

[৫২] *সহিহ বুখারি* : ৪২৬৬।

[৫৩] *মাআরিকু খালিদ ইবনিল ওয়ালিদ* : ১৭৫।

তিন. মুতার যুদ্ধে খালিদের বীরত্ব

মুসলিমবাহিনী শত্রুর সংখ্যাধিক্যের ব্যাপারে আলোচনার জন্য মাআন প্রান্তরে অবস্থান করছিল। সাজসরঞ্জাম বিবেচনায় তাঁরা যুদ্ধে এগোনোর যথেষ্ট সাহস পাচ্ছিলেন না; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইমানি শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আল্লাহর ওপর ভরসা করে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তাঁদের মানসিকতা ছিল; যেহেতু শাহাদাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়েছি, তাই লক্ষ্য সামনে দেখেও কেন যুদ্ধের ময়দান থেকে পিছপা হব!

জায়েদ ইবনু আরকাম রা. বলেন, আমি ইয়াতিম অবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছিলাম। যুদ্ধযাত্রার সময় তিনি আমাকে তাঁর বাহনে বসিয়ে নিয়েছিলেন। রাতে যখন বাহন চলছিল, তখন তিনি গুনগুনিয়ে আবৃত্তি করছিলেন,

> *এরপর মুসলিমরা এল এবং আমাকে সিরিয়ায় এমন ভূমিতে রেখে গেল,*
> *যেখানে স্থায়ী হতে আমি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম।*

আমি এই কবিতা শুনে কান্না শুরু করি। তিনি চাবুক দিয়ে মৃদু আঘাত করে বলেন, 'এই ভীতু, যদি আল্লাহ আমাকে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেন, তাতে তোমার কী সমস্যা? স্বাধীনভাবে তুমি বাহনে চড়ে নিজের বাসস্থানে ফিরে যাবে।'[৫৪]

মুতাযুদ্ধের দিকে গভীর দৃষ্টি দিলে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয় যে, মুসলিমবাহিনী যদি প্রযুক্তিশূন্যও হয়; আর শত্রুর কাছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি থাকে, তবে এটা কখনো মুসলিমদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে না; বরং ইমান ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে পারাই বিজয়ী হওয়ার সর্বোত্তম মাধ্যম। ইবনু কাসির রাহ. এ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করতে হয়—দুটি ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে। একদল আল্লাহর রাহে নিজেদের উৎসর্গ করছে, যাঁদের সংখ্যা মাত্র ৩ হাজার। আর অপরদিকে প্রতিপক্ষের সদস্যসংখ্যা ২ লাখ। ১ লাখ রোমান ও ১ লাখ খ্রিষ্টান আরব। সম্মুখযুদ্ধে নামার পরও মুসলিমদের মাত্র ১২ জন শহিদ হন; আর অসংখ্য কাফির মারা পড়ে।

এই যুদ্ধের এক সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বর্ণনা করেন, 'যুদ্ধে আমার হাতে নয়টা তলোয়ার ভাঙে! শেষপর্যন্ত শুধু ইয়ামেনি ছোট একটা খঞ্জরই অক্ষত ছিল!' চিন্তা করুন, তিনি তাঁর এসব তরবারির মাধ্যমে সেদিন কতজন খ্রিষ্টান সেনাকে মৃত্যুর উপত্যকায় পৌঁছে দিয়েছিলেন! অন্যদের আলোচনা নাহয় বাদ থাকুক, এই সংখ্যাটাই-বা কম কীসে? কুরআনের অন্য ধারকবাহকরাও তাঁদের সাধ্য-সামর্থ্য অনুযায়ী বহু খ্রিষ্টান সেনাকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিলেন, তা তো স্বাভাবিকই।[৫৫]

---

[৫৪] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ৪/২৪-২৫।

[৫৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/২৫৯।

চার. 'সাইফুল্লাহ' উপাধি লাভ

মুতার যুদ্ধের ব্যাপারে রাসুলের পক্ষ থেকে একটি মুজিজা ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিল। যুদ্ধের সংবাদ মদিনায় পৌঁছার আগেই খালিদ মদিনাবাসীর কাছে জায়েদ, জাফর ইবনু আবি তালিব ও আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে দেন। ফলে সেনাবাহিনীর অবস্থা নিয়ে রাসুল ﷺ বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। তখন তিনি মদিনাবাসীর সামনে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পতাকাগ্রহণ ও সাহাবিদের বিজয়ের সংবাদ জানিয়ে তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৫৬] নবিজি ﷺ সাহাবিদের এ সংবাদ জানানোর কিছুক্ষণ পরই সংবাদবাহক যুদ্ধের খবর নিয়ে মদিনায় আসে। রাসুলের দেওয়া সংবাদই যেন সে মানুষের সামনে পুনঃপেশ করে। সুবহানাল্লাহ![৫৭]

যুদ্ধফেরত বাহিনী মদিনার কাছাকাছি পৌঁছলে রাসুল ﷺ সাহাবিদের নিয়ে তাঁদের স্বাগত জানাতে বেরিয়ে পড়েন। শিশু-কিশোররা দৌড়ে তাঁদের দিকে এগিয়ে যায়। নবিজি সবাইকে নিয়ে বাহনে চড়ে এগিয়ে যান। তিনি বলেন, 'তোমরা শিশুদের বাহনে বসিয়ে নাও; আর জাফরের সন্তানকে আমার হাতে তুলে দাও।' আবদুল্লাহ ইবনু জাফরকে তাঁর কাছে আনা হলে তাঁকে নিজের বাহনে বসিয়ে নেন। লোকজন মুসলিমবাহিনীর দিকে মাটি নিক্ষেপ করে বলছিল, 'হে পলাতক বাহিনী, তোমরা আল্লাহর রাস্তা থেকে পালিয়ে এসেছ। রাসুল ﷺ তাঁদের থামিয়ে বলেন, 'তাঁরা পলাতক নয়; বরং তাঁরা পুনরায় আক্রমণকারী প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।'[৫৮]

লক্ষ করুন, কী মানসিকতা ছিল তখনকার মুসলিমদের। আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত ছাড়া ফিরে আসাকে মদিনার ছোট্ট শিশুরা পর্যন্ত পলায়ন বিবেচনা করছিল। তাঁদের মুখে মাটি ছিটিয়ে প্রতিবাদ করছিল। আজ রাজপথের আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত যুবকরা কোথায়? প্রথম যুগের সেই সোনালি উদাহরণ সামনে থাকার পরও তাদের অবস্থান কেমন? নববি আদর্শে অনুপ্রাণিত ইসলামি পদ্ধতিতে দীক্ষা পাওয়া ছাড়া শৌর্যবীর্যের উন্নত শিখরে ওঠা উম্মাহর পক্ষে কখনো সম্ভব হবে না।[৫৯]

পাঁচ. রণাঙ্গনে যেভাবে সেনাপতির দায়িত্ব পান খালিদ

রাসুলের পক্ষ থেকে নির্ধারিত শেষ সেনাপতি আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহার শাহাদাতের

---

[৫৬] *নাজরাতুন নায়িম* : ১/৩৬০।

[৫৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/২৫৫।

[৫৮] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবুল হাসান আলি নদবি : ৩২৮।

[৫৯] *দুরুস ও ইবার মিনাল জিহাদিন নাবাবি* : ৩৫৮।

পর সাবিত ইবনু আকরাম এগিয়ে এসে মুসলিমবাহিনীর পতাকা ধারণ করেন। একজন যোদ্ধা হিসেবে তাঁর যা করণীয় ছিল, তিনি তা করেছিলেন। তখন পতাকা ভূলুণ্ঠিত হওয়াকে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর পরাজয় ধরে নেওয়া হতো। তাই তিনি পতাকা সমুন্নত রেখে উচ্চৈঃস্বরে মুসলিমদের ডেকে বলছিলেন, তাঁরা যেন তাঁদের নেতা নির্বাচিত করে নেন। যুদ্ধ চলাকালে তাঁকেই নেতৃত্বের প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি বলেছিলেন, 'আমি এ বোঝা বহনে অসমর্থ।' এরপর লোকেরা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে নির্বাচিত করে।

এক বর্ণনায় দেখা যায়, সাবিত রা. পতাকা উঠিয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে চলে আসেন। খালিদ তাঁকে বলেন, 'আমি আপনার কাছ থেকে এ পতাকা নেব না। আপনিই তা বহনের অধিক হকদার।' উত্তরে তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি তা আপনাকে দিতেই হাতে নিয়েছিলাম।'

ইমতাউল আসমা গ্রন্থে আছে, সাবিত ইবনু আকরাম রা. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে সম্বোধন করে বলেন, 'আবু সুলায়মান, আপনি পতাকা হাতে নিন।' খালিদ উত্তরে বলেন, 'আপনি আমার চেয়ে এই পতাকা বহনের বেশি উপযুক্ত। কেননা, একে তো আপনি বয়সে বড় ও অভিজ্ঞ; তার ওপর আপনি বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জনকারী।' উত্তরে সাবিত বলেন, 'আমি তো এই পতাকা শুধু আপনাকে দিতেই হাতে উঠিয়েছি; সুতরাং আপনিই নিন।' এরপর খালিদ পতাকা নেন।[৬০]

ছয়. নেতৃত্বের অধিকার

উভয় বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, সাবিত রা. প্রথমে মুসলিমদের একত্রিত করেছিলেন এবং পতাকা খালিদের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে অর্পণ করেছিলেন।[৬১] যদিও উপস্থিত সবাই বলেন, 'আপনি আমাদের নেতৃত্ব নিন।' কিন্তু তিনি নিজেকে এ পদের জন্য সমীচীন মনে করেননি। তিনি ভাবছিলেন, যেহেতু এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি উপস্থিত আছেন, তখন অযোগ্য ব্যক্তির কাছে নেতৃত্ব রাখা বা দেওয়া উচিত নয়। কোনো কাজ যখন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, তখন সেখানে কোনো প্রকার মর্যাদা বা প্রতিপত্তির লোভ থাকে না।

সাবিত রা. মুসলিমবাহিনীর নেতৃত্বদানে অক্ষম ছিলেন না। তিনি বদরযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর চেয়ে যোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে তিনি তা নেওয়া সমীচীন মনে করেননি। যদিও তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইসলামগ্রহণের বয়স ছিল মাত্র তিন

---

৬০ *ইমতাউল আসমা* : ১/৩৪৮-৩৪৯।

৬১ *আত-তারিখুল ইসলামি*, হুমায়দি : ৭/১২৪।

মাস। এ ক্ষেত্রে মৌলিক লক্ষ্য থাকে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম ও সমীচীন পন্থায় আদায়ের সক্ষমতা।[৬২]

বর্তমানে মুসলিম নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। এসব সমস্যার মূলে রয়েছে নেতৃত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কা, নিজের ওপর অত্যধিক আত্মবিশ্বাস এবং পার্থিব কামনা-বাসনার বাস্তবায়ন। সাবিত রা.-এর দেখানো উত্তম আদর্শ বর্তমানের নেতাদের সামনে উপদেশের ডালি নিয়ে উপস্থিত হয়; কিন্তু তা থেকে উপদেশ নেন কেবল তাঁরা, যাঁদের রয়েছে অনুধাবনের মতো আত্মা, শোনার মতো কান।

সাত. নববি শিক্ষায় নেতৃত্বের সম্মান

আওফ ইবনু মালিক আশজায়ি রা. বলেন, আমি জায়েদ ইবনুল হারিসার সঙ্গে মুতার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ইয়ামেনের এক হিমইয়ারি সাথিও শরিক ছিল। একপর্যায়ে রোমানদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ বেঁধে যায়। বর্মাচ্ছাদিত এক রোমান সেনা লাল রঙের ঘোড়ায় আরোহী ছিল। সে মুসলিমদের ওপর তুমুল আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। এদিকে আমার হিমইয়ারি সাথি একটা পাথরের আড়ালে তার জন্য ওত পেতে বসা ছিল। রোমান অশ্বারোহী যখন তার সামনে পড়ে, মুহূর্তেই সে তরবারির আঘাতে ওর ঘোড়ার পা কেটে ফেলে। তখন ওই রোমান সেনা পালাতে চাইলে সে ধাওয়া করে তাকে হত্যা করে। এরপর তার ঘোড়াসহ যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেয়।

মুসলিমরা বিজয়ী হলে খালিদ রা. নিহতদের থেকে অর্জিত যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র জমা দেওয়ার আদেশ দেন। আওফ বলেন, আমি খালিদের কাছে গিয়ে বলি, 'খালিদ, হয়তো আপনি জানেন না, রাসুল ﷺ নিহতের অস্ত্রশস্ত্র ও সম্পদ হন্তারককে দেওয়ার বিধান দিয়েছেন।' খালিদ বলেন, 'নিঃসন্দেহে বিধান তা-ই। তবে আমার কাছে এ সম্পদ অধিক মনে হচ্ছে।' উত্তরে আমি তাঁকে বলি, 'আপনি এই পুরো সম্পদ হন্তারককেই দেবেন, অথবা আমি এ ব্যাপারে রাসুলের কাছে অভিযোগ করব।' তবু তিনি তাঁকে এ সম্পদ দিতে অস্বীকার করেন।

আওফ রা. বলেন, আমরা রাসুলের কাছে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করি। রাসুল ﷺ বলেন, 'খালিদ, তুমি এমনটা কেন করেছ?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আমার কাছে এ সম্পদ বেশি মনে হয়েছে।' নবিজি তখন যাবতীয় সম্পদ হন্তারককে দিয়ে দিতে বলেন।

আওফ বলেন, আমি খালিদকে বললাম, 'খালিদ, কেমন অনুভব করছ? আমি কি আমার কথা বাস্তবায়ন করে দেখাইনি?' নবিজি তখন জিজ্ঞেস করেন, 'সেটা কী?' আমি

---

[৬২] *মুয়িনুস সিরাহ* : ৩৭৬।

তাঁকে পুরো ঘটনা শোনালে তিনি রাগত স্বরে বলেন, 'খালিদ, তুমি এ সম্পদ ফিরিয়ে দেবে না। তোমরা কি আমার পক্ষ থেকে নির্বাচিত নেতাকে আমার দিকে চেয়ে ক্ষমা করে দিতে পারো না। তাঁদের আদেশ পালন তোমাদের জন্য আবশ্যক; তবে এতে কোনো ধরনের ত্রুটির দায় তাঁদের ওপরই বর্তাবে।'[৬৩]

নেতৃস্থানীয়দের পক্ষ থেকে মানবিক প্রবৃত্তিগত কারণে ভুলত্রুটি হয়ে যায়। কিন্তু সেসবের দোহাই দিয়ে তাঁদের লজ্জিত না করার ব্যাপারে রাসুলের নির্দেশনা এবং নেতার পক্ষসমর্থনে তাঁর অবস্থান—এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। অপমান কিংবা কুৎসা রটনা ছাড়া তাঁদের শোধরানোর পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে।

হিমইয়ার গোত্রের সেই মুজাহিদকে নিহতের যাবতীয় সম্পদ দিয়ে দিতে খালিদ রা. অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি তাঁকে অপমানিত করেননি; বরং ইজতিহাদের ভিত্তিতে সর্বসাধারণের সুবিধার কথা ভেবে এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যেন একজন সেনা খুব বেশি সম্পদ না পায়। এর বিপরীতে যদি পুরো সম্পদ গনিমতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে অনেক সেনা অংশ পেতে পারেন।

আওফ ইবনু মালিক যখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে এ থেকে নিবৃত্ত করছিলেন, তখন তিনি যথার্থ করেছিলেন। তাঁকে সঠিক মাসআলা অবহিত করেছিলেন। খালিদ তা গ্রহণ না করলে এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ-কে তাঁর অবগত করার ব্যাপারটাও সঠিক ছিল। তাঁর উচিত ছিল এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকা। কেননা, তিনি সত্যিকার পাওনাদারকে তার পাওনা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু যখন তিনি এখানে না থেমে একে ব্যক্তিগত বিজয় ও প্রতিশোধ চরিতার্থের দিকে নিয়ে যান এবং এর মাধ্যমে খালিদকে হেয় করার চেষ্টা করেন, তখন নবিজি তাঁকে সমর্থন না করে উলটো কঠিনভাবে ধমক দেন এবং নেতার অধিকার সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন।

এখানে যে প্রশ্নটা থেকে যায় তা হচ্ছে, পরবর্তীকালে রাসুল ﷺ খালিদকে নিহতের অস্ত্রশস্ত্র হিমইয়ারি মুজাহিদকে ফিরিয়ে না দেওয়ার যে আদেশ দিয়েছিলেন, তাতে কি ওই হিমইয়ারি মুজাহিদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়নি? নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়, রাসুল ﷺ একজনের অপরাধে অবশ্যই অপরজনকে শাস্তি দেননি। হয়তো তিনি ওই পাওনাদার মুজাহিদকে এ ফায়সালার ব্যাপারে সম্মত করেছিলেন। হয়তো তাঁকে এর বিনিময়ে অন্য কিছু দিয়েছিলেন; অথবা তিনি নিজেই এ পাওনা থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন। অবশ্য এই বর্ণনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না।[৬৪]

যে জাতি নেতাদের মর্যাদা ও সম্মান উপলব্ধি করতে পারে না, তারা উন্নত সভ্যতার

---

৬৩ *সুনানু আবি দাউদ* : ২৭১৯।

৬৪ *আত-তারিখুল ইসলামি*, হুমায়দি : ৭/১৩০।

অধিকারী হতে পারে না। নববি আদর্শ উম্মাহকে এ ব্যাপারে উন্নত একটা নীতিমালা প্রদান করেছে। মুসলিমদের উচিত প্রত্যেককে তার যথাযথ অবস্থান বিবেচনা করে সম্মান দেওয়া। অনুরূপ ধর্মীয় ব্যক্তিদেরও যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান আবশ্যক। অর্থাৎ, প্রত্যেককেই তার সেই গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, যা আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

> ﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَهٗۤ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۫ يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ لَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾
>
> হে মুমিনরা, তোমাদের কেউ দীন থেকে ফিরে গেলে নিশ্চয় আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলিমদের প্রতি বিনম্র আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রচুর দানকারী, মহাজ্ঞানী। [সুরা মায়িদা : ৫৪]

রাসূলের বাণী—'তোমরা কি আমার পক্ষ থেকে নির্বাচিত নেতাদের আমার কারণে ক্ষমা করতে পারো না?' এটা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে। কেননা, নবিজি তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে নির্বাচিত নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মানুষের উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে এটা ছিল নববি এক উন্নত আদর্শ।[৬৫]

আট. মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে রাসুলের পরিকল্পনা ও খালিদের ভূমিকা

১. মক্কাবিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত লেখা ছিল, মুসলিমরা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলো পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করছিলেন। কিন্তু অষ্টম হিজরিতে কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করে বসে। রাসুল ﷺ একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তি নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে কয়েকটা শর্ত দিয়ে শেষের দিকে লিখে দেন, 'এ শর্তগুলো তাদের মনঃপূত না হলে হুদায়বিয়ার সন্ধি ভেঙে গেছে মনে করতে হবে।' ফলে কুরাইশরা সন্ধিভঙ্গের প্রস্তাবই গ্রহণ করে। এরপর রাসুল ﷺ যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু

---

৬৫ *মুয়িনুস সিরাহ* : ৩৭৮।

করেন এবং অষ্টম হিজরির ১০ রমজান মঙ্গলবার আসরের সালাতের পর ১০ হাজার সাহাবির বিশাল এক বাহিনী নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন।

২. খালিদসহ নেতৃস্থানীয় সাহাবির মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন

রাসুল ﷺ জি-তুয়া নামক স্থানে পৌঁছে সাহাবিদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করে দেন।[৬৬] খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে বাহিনীর ডান পাশের এবং জুবায়ের রা.-কে বাম পাশের কমান্ডার নিযুক্ত করেন। আবু উবায়দা রা.-কে দেন পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব।

এরপর রাসুল ﷺ আবু হুরায়রা রা.-কে আনসার সাহাবিদের ডেকে আনতে পাঠালে তাঁরা দ্রুত ছুটে আসেন। তাঁদের বলেন, 'হে আনসার সম্প্রদায়, তোমরা কুরাইশদের উচ্ছৃঙ্খলতা দেখেছ?' তাঁরা বলেন, 'জি।' নবিজি বললেন, 'দেখতে থাকো। আগামীকাল যখন তাদের সঙ্গে মুখোমুখি হবে, তাদের কচুকাটা করবে।' এরপর তিনি ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখেন।'[৬৭]

তারপর জুবায়ের ইবনুল আওয়ামকে মুহাজির ও তাঁদের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান এবং মক্কার উচ্চভূমি কুদার পথ ধরে প্রবেশের পরামর্শ দেন। তাঁদের হাজুন[৬৮] নামক স্থানে মুসলিমবাহিনীর পতাকা ওড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করতে বলেন।

ওদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে কুজাআ, সুলাইমসহ কয়েকটা গোত্রের নেতৃত্ব দিয়ে মক্কার নিম্নাঞ্চল হয়ে প্রবেশ এবং সেখানে পতাকা ওড়ানোর নির্দেশ দেন; আর সাআদ ইবনু উবাদাকে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে আনসারদের নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান। রাসুল ﷺ তাঁদের সংযমী হওয়ার এবং আক্রান্ত না হলে আক্রমণ না করার নির্দেশ দেন। প্রতিটা বাহিনীকেই তখন নিজ নিজ দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের গন্তব্যও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল।[৬৯]

মুসলিম বীরসেনানীরা সমন্বিতভাবে একই সময়ে মক্কার চারপাশ দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। কোনো বাহিনীর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদী অবস্থান নেওয়ার মতো সাহস কেউ দেখায়নি। এভাবে চারদিক থেকে একযোগে মুসলিমবাহিনীর সম্মিলিত প্রবেশ ছিল মক্কার মুশরিকদের ওপর মানসিক একটা চরম আঘাত, যা তাদের একত্রিত হওয়ার এবং প্রতিরোধ গড়ার সাহস নিঃশেষ করে দেয়।

---

[৬৬] প্রাগুক্ত : ৩৮৯।

[৬৭] *সহিহ মুসলিম* : ১৭৮০।

[৬৮] মক্কার গোরস্থানের পার্শ্ববর্তী প্রসিদ্ধ একটি জায়গা

[৬৯] *মুয়িনুস সিরাহ* : ৩৯০।

৩. মক্কায় প্রবেশে প্রতিরোধের মুখে খালিদের বাহিনী

মুসলিমবাহিনীর শক্তিসামর্থ্য লক্ষ করে রাসুল ﷺ এ বিজ্ঞজনোচিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং তাতে পরিপূর্ণ সফলও হয়েছিলেন। মুশরিকরা কোনো ধরনের প্রতিরোধের সুযোগ কিংবা সাহস পায়নি। ফলে মুসলিমবাহিনী বিনা রক্তপাতে লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়। অবশ্য খালিদের বাহিনী কিছুটা প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়।[৭০]

সাফওয়ান ইবনু উমাইয়া, ইকরিমা ইবনু আবি জাহল ও সুহাইল ইবনু আমরের নেতৃত্বে একদল উগ্র কুরাইশ তাদের সমমনাদের নিয়ে মুসলিমবাহিনীর ওপর আক্রমণ করলে খালিদ তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দেন। অল্পসময়ের মধ্যে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়; আর চারদিক থেকে মুসলিমরা মক্কানগরী দখলে নিতে সক্ষম হন।[৭১]

৪. হিমাস ইবনু খালিদের ঘটনা

বনু বকরের হিমাস ইবনু খালিদের ঘটনা বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে বর্ণিত আছে। মুসলিমবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সে যখন তার অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করছিল, তখন স্ত্রী জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন এসব অস্ত্র প্রস্তুত করছ?' সে বলেছিল, 'আমি মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদের প্রতিরোধ করতে যাচ্ছি।' স্ত্রী বলেছিল, 'আমার মনে হয় মুহাম্মাদ ও তাঁর সঙ্গীরা এখন কাউকে ছাড় দেবেন না।' স্ত্রীকে প্রবোধ দিতে গিয়ে হিমাস বলে, 'সম্ভব হলে আমি কোনো মুসলিম যুদ্ধবন্দিকে দাস হিসেবে তোমাকে দেবো!' তারপর সে আবৃত্তি করে,

যদি আজ সে মোকাবিলা করতে পারে,
তবে ওজর পেশ করার মতো আমার কোনোকিছুই থাকবে না;
এই হলো যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্র ও হাতিয়ার;
ধারালো বর্শা, দ্রুত কাটতে পারা দুধারী তরবারি।

মক্কাবিজয়ের দিন তারা যুদ্ধপ্রস্তুতি নিয়ে ইকরিমার নেতৃত্বে মুসলিমবাহিনীর প্রতিরোধে বের হয়; কিন্তু কুরাইশদের ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে দেখে হিমাস পালিয়ে নিজের ঘরে প্রবেশ করে। স্ত্রীকে দরজা বন্ধ করতে বললে স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, আমার জন্য যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে সে কোথায়? হিমাস তখন স্ত্রীর কাছে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আবৃত্তি করে,

যদি তুমি আজকের ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখতে; যেদিন সাফওয়ান, ইকরিমা সবাই পালিয়ে যায়!

---

[৭০] *সুয়ার ওয়া ইবার মিনাল জিহাদিন নাবাবি ফিল-মাদিনা* : ৩৯৭।

[৭১] *কিয়াদাতুর রাসুল আস-সিয়াসিয়া ওয়াল আসকারিয়া* : ১২২-১২৩।

আবু ইয়াজিদ (সুহাইল ইবনু আমর) স্তম্ভের মতো অসহায় হয়ে যেদিন দাঁড়িয়েছিল; আর মুসলিমদের তরবারি তাদের সম্মুখে নৃত্য করছিল,

যা শুধু আমাদের বাহু ও মাথার খুলিতে আঘাত করছিল; আর সেদিন শুধু অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছিল।

আতঙ্কিত হয়ে আমাদের পিছিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আজ আমাদের নিন্দা করে কোনো শব্দ উচ্চারণ করো না।[৭২]

৫. মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে আবু সুফিয়ান ও মক্কাবাসীর অবস্থা

মুসলিমবাহিনী মক্কায় প্রবেশের আগে সাধারণ নাগরিকদের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করা হয়, যেন সংঘর্ষ ও রক্তপাত ছাড়া মক্কাপ্রবেশ সম্পন্ন হয়। সেদিন স্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, 'যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ; যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ; যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।' রাসুল ﷺ আবু সুফিয়ানকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, যেন তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে সবাইকে নিজ নিজ ঘরে প্রবেশে সহযোগিতা করেন। নিজের অভ্যাসবশত নেতৃত্বের ভূমিকায় সবাইকে নিরাপদ অবস্থানে নেওয়ার চেষ্টা করেন, যেন তিনি মুসলিমদের নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশের সহযোগিতা করেন। আর নিজের এ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে যেন ইসলামের আদর্শ তাঁর মধ্যে ভালোভাবে প্রোথিত হতে পারে।[৭৩]

রাসুলের দরবার থেকে এসে আবু সুফিয়ান দ্রুত মক্কায় প্রবেশ করে উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করতে থাকেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, মুহাম্মাদ তাঁর বাহিনী নিয়ে তোমাদের দিকে ধেয়ে আসছেন। তোমরা তাঁদের প্রতিরোধ করতে পারবে না। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে।' আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতু উতবা এ কথা শুনে তাঁর দাড়ি ধরে তিরস্কার করে লোকজনকে বলেন, 'এই মটকার মতো চর্বিওয়ালা লোকটাকে তোমরা মেরে ফেলো।[৭৪] গোত্রের এমন নেতার ধ্বংস হোক।' আবু সুফিয়ান তাদের লক্ষ্য করে বলছিলেন, 'তোমরা এই মহিলার প্ররোচনায় নিজেদের ধ্বংস করো না। অবশ্যই মুহাম্মাদ এমন এক বাহিনী নিয়ে আসছেন, ইতিপূর্বে যার মুখোমুখি তোমরা হওনি। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ থাকবে।' লোকজন সমস্বরে বলে ওঠে, 'আল্লাহ তোমার ধ্বংস করুক! তোমার ঘরে প্রবেশের প্রয়োজন আমাদের নেই।' এরপর আবু সুফিয়ান বলেন, 'যে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে,

---

[৭২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/৩৯৫।

[৭৩] *দিরাসাহ ফিস-সিরাহ* : ২৪৫।

[৭৪] আবু সুফিয়ানকে তাঁর স্থূলতার কারণে মটকার সঙ্গে তুলনা করে তিনি এ কথা বলেছিলেন।

সে নিরাপদ থাকবে; যে মসজিদে হারামে আশ্রয় নেবে সে-ও নিরাপদ থাকবে।' তখন লোকজন নিজ নিজ ঘর এবং মসজিদে হারামের দিকে ছুটে যেতে শুরু করে।[৭৫]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা..থেকে বর্ণিত; মক্কাবিজয়ের বছর একবার রাসুল ﷺ মুসলিম নারীদের তাঁদের ঘোড়াগুলো নিজ নিজ ওড়না দিয়ে মুছে দিতে দেখেন। এই দৃশ্য দেখে আবু বকরের দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বলেন, আবু বকর, এটা যেন হাসসান ইবনু সাবিতের সেই কাব্যদৃশ্যের প্রতিফলন—

আমাদের তাজা অশ্বগুলো থাকবে উদ্ধত,
নারীরা যেগুলোর পৃষ্ঠদেশ নিজেদের ওড়না দিয়ে মুছে প্রস্তুত করেছে।[৭৬]

৬. বনু জাজিমা অভিমুখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ

রাসুল ﷺ হুনাইনযুদ্ধের আগে অষ্টম হিজরির শাওয়ালে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে জাজিমা গোত্রে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠান।[৭৭] বনু সুলাইম, বনু মুদলাজ ও আনসার-মুহাজিরদের সমন্বয়ে প্রায় ৩৫০ জনের এ বাহিনী বনু জাজিমা অভিমুখে বেরিয়ে পড়ে। খালিদের নেতৃত্বাধীন এ বাহিনীকে দেখে বনু জাজিমা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে প্রতিরোধ করতে এলে খালিদ রা. তাদের বলেন, 'অস্ত্র ফেলে দাও! কেননা, সকল মানুষ ইসলামগ্রহণ করেছে।' তখন জুহদার নামের একব্যক্তি চিৎকার করে বলে, 'হে বনু জাজিমা, তোমাদের ধ্বংস হোক! নিশ্চয় তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ। তিনি তোমাদের অস্ত্রমুক্ত করে প্রথমে বন্দি করবেন, তারপর হত্যা করবেন। আল্লাহর শপথ, আমি অস্ত্রসমর্পণ করব না।' তবে কিছুক্ষণ পর সে অস্ত্রসমর্পণ করলে সবাই অস্ত্রসমর্পণ করতে শুরু করে।

৭. খালিদের ইজতিহাদি ভুল এবং নবিজির দায়মুক্তির ঘোষণা

অস্ত্রসমর্পণ সমাপ্ত হলে খালিদের আদেশে তাদের জড়ো করা হয়। তিনি তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে তারা খোশমেজাজে 'ইসলামগ্রহণ করেছি' না বলে বলছিল, 'আমরা ধর্মত্যাগ করেছি'। এ কথা শুনে খালিদ তাদের বন্দি ও হত্যা শুরু করেন। তবে তাঁর সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তিনি বন্দিদের সবার মধ্যে বণ্টন করে দেন। পরদিন প্রত্যেককে যার যার বন্দিকে হত্যার নির্দেশ জারি করেন। অনেকে তাঁর আদেশ বাস্তবায়ন করলেও আবদুল্লাহ ইবনু উমরসহ

---

[৭৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/২৯০।

[৭৬] *মাগাজি*, ওয়াকিদি : ২/৮৩১।

[৭৭] *আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুসিন নাবাবিয়া* : ২৪৮।

কেউ কেউ বন্দিদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন। নবিজির কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছানো হলে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে বলেন, 'আল্লাহ, খালিদের কৃতকর্ম থেকে আমি নিজেকে দায়মুক্ত ঘোষণা করছি।'[৭৮]

৮. খালিদ ও আবদুর রাহমান ইবনু আওফের উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়

এদিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আবদুর রাহমান ইবনু আওফের মধ্যে এ নিয়ে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। ইবনু আওফের ধারণা ছিল; হয়তো খালিদ জাহিলি যুগে জাজিমার হাতে তাঁর চাচা ফাকিহ ইবনু মুগিরার হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁদের এ বাক্যবিনিময়ের ব্যাপারে *সহিহ মুসলিমে*র বর্ণনায় আছে, 'একবার খালিদ ও আবদুর রাহমানের মধ্যে কোনো ব্যাপারে দ্বন্দ্ব লেগে যায়। এতে খালিদ আবদুর রাহমানকে কিছু মন্দ কথা বললে রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার কোনো সাহাবিকে মন্দ বলো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তবু তা আমার কোনো সাহাবির সামান্য দান-সাদাকার সমান হবে না।'

রাসুল ﷺ আলি রা.-কে তাদের রক্তপণ ও মনস্তুষ্টির জন্য অতিরিক্ত আরও সম্পদ দিয়ে আসার আদেশ দেন।[৭৯] এই মানবিক ও আন্তরিক আচরণের মাধ্যমে নবিজি বনু জাজিমার ভালোবাসা অর্জন করেন। তাদের অন্তর থেকে দুঃখ দূর করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।[৮০]

রাসুল ﷺ যেহেতু এই ব্যাপারে খালিদ রা.-কে কোনো তিরস্কার বা শাস্তি দেননি; তাই এ কথা নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটা খালিদের ইজতিহাদি একটা ভুল ছিল।[৮১]

---

[৭৮] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবু শাহবা : ২/৪৬৪।

[৭৯] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া ফি জুয়িল মাসাদিরিল আসলিয়া* : ৫৭৯।

[৮০] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবু শাহবা : ২/৫৭৯।

[৮১] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া ফি জুয়িল মাসাদিরিল আসলিয়া* : ৫৭৯।

তৃতীয় অধ্যায়

মূর্তি ও দেবালয় ধ্বংসকারী খালিদ

মক্কাবিজয়ের সময় মসজিদে হারামকে মূর্তিমুক্ত করার পর মক্কার যেসব ঘর মূর্তি সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, তা ধ্বংস করা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এগুলো ছিল দীর্ঘ কালপরিক্রমায় চলে আসা জাহিলি সভ্যতার নিদর্শনাগার।[৮২] তাই আরবভূমিকে কলুষমুক্ত করতে রাসুল ﷺ বিভিন্ন বাহিনী পাঠান।

এক. উজ্জার উদ্দেশে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ

৩০ জন অশ্বারোহীর নেতৃত্ব দিয়ে রাসুল ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে মক্কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কুরাইশদের বড় দেবতা উজ্জা থেকে পৃথিবীকে চিরমুক্ত করতে পাঠান। খালিদ সেখানে গিয়ে মূর্তি ও তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় স্থাপনা একেবারে গুঁড়িয়ে দেন। সে সময় তিনি গুনগুন করে আবৃত্তি করছিলেন,

> *আমি তোকে অস্বীকার করছি, তোর পবিত্রতা বর্ণনা করছি না। আমি দেখেছি আল্লাহ তোকে অপমানিত করেছেন।*[৮৩]

এরপর খালিদ সাথিদের নিয়ে রাসুলের কাছে গিয়ে বিবরণী পেশ করেন। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি সেখানে কিছু দেখতে পেয়েছ?' তিনি নেতিবাচক উত্তর দিলে[৮৪] নবিজি আদেশ করেন, 'আবার যাও। কেননা, তুমি কাজটা সমাধা করতে পারোনি!'[৮৫]

ব্যর্থতার ক্ষোভ নিয়ে খালিদ তখনই সেখানে ফিরে যান। তাঁকে আবার আসতে দেখে মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী পুরোহিতরা বুঝে ফেলে, প্রথমবারের অসম্পূর্ণ কাজ সমাধা

---

[৮২] *মুয়িনুস সিরাহ* : ৩৯৪।

[৮৩] *আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুসিন নাবাবিয়া* : ২৮২।

[৮৪] *আল-মাগাজি* : ২/৮৭৪।

[৮৫] *আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুসিন নাবাবিয়া* : ২৮২।

করতে এসেছেন তিনি। ফলে তাঁকে দেখামাত্র তারা এই বলে চিৎকার করতে করতে পালিয়ে যায়, 'হে উজ্জা, তুমি তাকে অন্ধ করে দাও। হে উজ্জা, তুমি তাকে পাগল বানিয়ে দাও!'

খালিদ দেখেন, উদোম দেহের এলোকেশী এক নারী মাথায় মাটি মেখে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তিনি অমিত সাহসিকতায় এগিয়ে যান এবং তরবারির আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করে রাসুলের কাছে ফিরে এসে তাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। রাসুল ﷺ বলেন, 'হ্যাঁ, এটাই ছিল উজ্জা।'[৮৬]

'খালিদকে গিয়ে বলো, সে যেন কোনো শিশু বা মজদুরকে হত্যা না করে'

ইবনু কাসির থেকে বর্ণিত; হুনাইনের যুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর হাতে নিহত এক নারীর লাশের পাশ দিয়ে রাসুল ﷺ অতিক্রম করেন। লাশটার পাশে মানুষের জটলা ছিল। এটা দেখে তিনি বলেন, 'এই মহিলা তো যুদ্ধ করেনি!' এরপর সেখানে থাকা একব্যক্তিকে বলেন, 'খালিদকে গিয়ে বলো, সে যেন কোনো শিশু বা মজদুরকে হত্যা না করে।'[৮৭]

অন্য বর্ণনায় আছে; রাসুল ﷺ তাঁর কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠান, 'রাসুল তোমাকে নারী, শিশু ও মজদুরদের হত্যার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন।'

দুই. দাওমাতুল জানদাল অভিমুখে খালিদ

রাসুল ﷺ তাবুক প্রান্তরে পৌঁছে রোমান বা আরবদের কোনো বাহিনীর উপস্থিতি দেখতে পাননি; তবু সেখানে ২০ দিন অবস্থান করেন। রোমান সেনারা তখনকার পরিস্থিতিতে মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়ানোর আগ্রহ দেখায়নি। অনুরূপ আরবের খ্রিষ্টান গোত্রগুলোও যুদ্ধে জড়াতে অনাগ্রহী ছিল। অন্যদিকে সিরিয়া সীমান্তের শাসকরা যুদ্ধের পরিবর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে এবং জিজয়া দিতে সম্মত হয়। আইলার[৮৮] শাসক রাসুলের কাছে উপহার হিসেবে সাদা একটা খচ্চর ও দামি পোশাক পাঠিয়ে জিজয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হয়।

এদিকে রাসুল ﷺ ৪২০ জন অশ্বারোহীর একটা বাহিনী খালিদের নেতৃত্বে দাওমাতুল

---

[৮৬] প্রাগুক্ত : ২৮৩।

[৮৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/৩৩৫-৩৩৬।

[৮৮] দক্ষিণ-জর্ডানের একটি শহর। নবিযুগে শহরটি রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। আরব উপদ্বীপের বাইরে মুসলিমদের হাতে গোড়াপত্তন হওয়া এটি প্রথম ইসলামি শহর। ৬৩০ হিজরিতে এখানে ইসলামি শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। —*নুরুযযামান নাহিদ*।

জানদাল অভিমুখে পাঠান। তিনি সেখান থেকে কিন্দা গোত্রের নেতা উকায়দার ইবনু আবদিল মালিক কিন্দিকে শিকাররত অবস্থায় বন্দি করে রাসুলের কাছে নিয়ে আসেন।[৮৯] তার সঙ্গেও রাসুল ﷺ জিজয়ার শর্তে সন্ধি করেন।

উকায়দারের পরনের চাদর দেখে মুসলিমরা বিস্মিত হলে রাসুল ﷺ বলেন, 'তোমরা তার চাদর দেখে অবাক হচ্ছ! সাআদ ইবনু মুআজ যে চাদর জান্নাতে পরবে, নিঃসন্দেহে তা এর চেয়ে বহু গুণ উত্তম হবে।'[৯০] খালিদ উকায়দারের কাছ থেকে ৮০০ যুদ্ধবন্দি, ১ হাজার উট, ৪০০ বর্ম ও ৪০০টা বর্শা গনিমত হিসেবে অর্জন করেছিলেন।[৯১]

তিন. সাকিফের প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলামগ্রহণ

রাসুল ﷺ যখন তায়েফ থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন উরওয়া ইবনু মাসউদ সাকাফিও তাঁর পেছনে পেছনে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তিনি নবিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন এবং ইসলামগ্রহণ করে স্বগোত্রে ফিরে যান। তাঁর লোকদের ইসলামের প্রতি আহ্বান জানালে তারা তাঁকে বর্শার আঘাত করে শহিদ করে দেয়; কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে তাদের পার্শ্ববর্তী ইসলামগ্রহণকারী গোত্রগুলোর মোকাবিলা করে টিকে থাকা সম্ভব নয়, তখন রাসুলের কাছে প্রতিনিধিদল পাঠানোর ইচ্ছা করে। এরপর নবম হিজরিতে তাবুকযুদ্ধ থেকে রাসুলের প্রত্যাবর্তনের পর রমজানে তাদের ছয় সদস্যের একটা প্রতিনিধিদল রাসুলের দরবারে আসে।[৯২]

বনু মালিক ও আহলাফের তিনজন করে ছয়জনের সমন্বয়ে প্রতিনিধিদলটা গঠন করা হয়েছিল। প্রতিনিধিদলের প্রধান মনোনীত করা হয়েছিল আবদি ইয়ালিল ইবনু আমরকে।[৯৩] দল গঠনে গভীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল ক্রিয়াশীল। সাকিফ গোত্র আশা করছিল, তাদের পরীক্ষিত মিত্র বনু উমাইয়া রাসুলের সঙ্গে তাদের মৈত্রীচুক্তিতে সহযোগিতা করতে পারবে।[৯৪]

সাহাবিরা সাকিফের ইসলামগ্রহণের ব্যাপারে রাসুলের প্রবল আগ্রহের বিষয়টা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই বনু সাকিফের লোকজন মদিনার নিকটবর্তী হলে আবু বকর ও মুগিরা রা. প্রতিনিধিদলের আগমনের সংবাদ রাসুলের কাছে পৌঁছাতে

---

[৮৯] *আল-ইসাবা* : ১/৪১২-৪১৩।

[৯০] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ৪/১৮০।

[৯১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৫/১৭।

[৯২] *রিসালাতুল আমবিয়া* : ১৯৯।

[৯৩] *সিরাতু নাবাবি*, ইবনু হিশাম : ৪/১৯৩।

[৯৪] *রিজালুল ইদারাহ ফিদ দাওলাতিল ইসলামিয়া*, ড. হুসাইন মুহাম্মাদ : ৭৬।

প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। যদিও শেষপর্যন্ত মুগিরা রা. আবু বকরকে এ সংবাদ দিতে এগিয়ে দিয়েছিলেন।[৯৫]

রাসুল ﷺ সহাস্যে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের জন্য তাঁবু খাটিয়ে দেন, যেন তারা কুরআন শ্রবণ ও মুসলিমদের সালাত প্রত্যক্ষ করতে পারেন। তারা সেখানে রাসুলের মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। প্রতিনিধিদলের সদস্য উসমান ইবনু আবিল আসকে তাঁবুতে রেখে অন্যরা প্রতিদিন রাসুলের সঙ্গে মিলিত হতেন। তাঁরা যখন রাসুলের দরবার থেকে ফিরে বিশ্রামে যেতেন, তখন উসমান রাসুলের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে ধর্মীয় বিধান জানার পাশাপাশি কুরআন শিখতেন। তিনি গোত্রের লোকদের অগোচরে নিয়মিত জ্ঞানার্জন করতেন। এভাবে তিনি ধর্মীয় জ্ঞানের পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। রাসুলের অনুপস্থিতিতে তিনি আবু বকরের কাছে যেতেন এবং তাঁর কাছ থেকেও জ্ঞানার্জন করতেন। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনে তাঁর এই আগ্রহ নবিজিকে মুগ্ধ করেছিল।[৯৬]

এভাবে কিছুদিন অবস্থান করে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা রাসুলের কাছে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। রাসুল ﷺ তাঁদের ইসলামগ্রহণের প্রতি আহ্বান জানালে আবদি ইয়ালিল বলেন, 'আপনি কি আমাদের পরিবার-পরিজন ও গোত্রের কাছে ফিরে যাওয়ার অবকাশ দেবেন?' রাসুল বলেন, 'তোমরা ইসলামগ্রহণ করলে আমি তোমাদের আলোচনার সুযোগ দেবো; অন্যথায় তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো আলোচনা বা সন্ধি নেই।'

আবদি ইয়ালিল বলেন, 'ব্যভিচারের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? কেননা, আমরা স্ত্রীসঙ্গ ছাড়া দূরদূরান্তে ভ্রমণ করি, যার জন্য অনেক সময় আমাদের সংযম অবলম্বন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।' নবিজি বলেন, 'বিষয়টা আল্লাহ সকল মুসলিমের জন্য হারাম ও অবৈধ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۭ وَسَاۗءَ سَبِيْلًا﴾

> আর ব্যভিচারের ধারেকাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।' [সুরা ইসরা : ৩২]

আবদি ইয়ালিল আবার প্রশ্ন করেন, 'সুদের ব্যাপারে আপনার মত কী?' তিনি বললেন, 'সুদ অবৈধ।' ইয়ালিল পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'আমাদের যাবতীয় সম্পদেই তো সুদের মিশ্রণ।' উত্তরে নবিজি বলেন, 'তোমাদের জন্য মূলধন অবশ্যই বৈধ। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

---

[৯৫] *সিরাতু নাবাবি,* ইবনু হিশাম : ৪/১৯৩।

[৯৬] *তারিখুল ইসলাম,* মাগাজি অধ্যায়, জাহাবি : ৬৮০।

﴿يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

হে মুমিনরা, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের লেনদেন থেকে বিরত থাকো; যদি তোমরা ইমানের দাবিতে সত্যবাদী হও। [সুরা বাকারা : ২৭৮]

এরপর তিনি মদের বৈধতা-অবৈধতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাপূর্বক বলেন, 'আঙুর নিংড়ানো এই রসালো পানীয় গ্রহণে আমরা অভ্যস্ত, যা পরিহার করা আমাদের জন্য কষ্টকর।' নবিজি তখন বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ এটাও তোমাদের জন্য হারাম করেছেন।' এ কথা বলে রাসুল ﷺ তিলাওয়াত করেন,

﴿يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

হে মুমিনগণ, মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং জুয়ার তির অপবিত্র শয়তানের কাজ। অতএব, এগুলো পরিহার করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। [সুরা মায়িদা : ৯০]

প্রতিনিধিদল উঠে গিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাদাভাবে পরামর্শ করে। সেখানে আবদি ইয়ালিল বলেন, 'তোমাদের ধ্বংস হোক, আমরা এ তিনটা বিষয়ের নিষিদ্ধতার বিধান নিয়ে কীভাবে গোত্রে ফিরে যাব? আল্লাহর শপথ, সাকিফের লোকজন কখনোই মাদক সেবন থেকে বিরত থাকতে পারবে না এবং ব্যভিচার থেকেও সংযম অবলম্বন করতে পারবে না।'

প্রতিনিধিদলের একজন সুফিয়ান ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তাদের কল্যাণ চাইলে তারা অবশ্যই এসব থেকে বিরত থাকবে। নিশ্চয় মুহাম্মাদের সাথিরা অতীতে আমাদের মতোই ছিল; কিন্তু তাঁরা এসব বিষয় থেকে সংযত হয়েছে এবং পুরানো অভ্যাস পরিত্যাগ করেছে। বর্তমানে আমরা মুহাম্মাদের বিজয় প্রত্যক্ষ করছি। তিনি একের পর এক ভূখণ্ড জয় করে নিচ্ছেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহেও ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহর কসম, যদি তাঁরা মাসব্যাপী আমাদের কেল্লা অবরুদ্ধ করে রাখে, তাহলে আমরা অনাহারে মারা যাব। আমি ইসলামগ্রহণ ছাড়া বিকল্প দেখছি না। অন্যথায় আমি আমাদের ওপর মক্কাবিজয়কালীন পরিস্থিতির আশঙ্কা করছি।'

খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আস তাঁদের ও রাসুলের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করতেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ফলে খালিদ চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করেন।

চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুতকালে তাঁরা তাঁদের একটা বিশেষ মূর্তি তথা রাব্বাহ নিয়ে নবিজিকে প্রশ্ন করলে তিনি তা ধ্বংস করার আদেশ দেন।

প্রত্যুত্তরে তাঁরা বলেন, 'হায়! হায়! রাব্বাহ যদি জানতে পারে আমরা তাকে ধ্বংসের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে এসেছি, তাহলে সে আমাদের পরিবারসহ সবাইকে ধ্বংস করে ফেলবে!' তখন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলে ওঠেন, 'হে আবদি ইয়ালিল, তোমার ধ্বংস হোক! রাব্বাহ তো একটা পাথরমাত্র। সে জানে না কে তার উপাসনা করেছে আর কে করেনি।' ইয়ালিল বলেন, 'উমর, আমরা তোমার কাছে আসিনি।'

এরপর তাঁরা ইসলামগ্রহণ করে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্রটা খালিদ ইবনু সায়িদ লিপিবদ্ধ করেন। চুক্তিপত্র সম্পাদিত হলে তাঁরা এই মূর্তির বিষয়ে রাসুলের সঙ্গে কথা বলেন এবং মূর্তি ভাঙার ব্যাপারে তিন বছর সময় চান। রাসুল ﷺ তিন বছর সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁরা দুই বছরের অবকাশ চান। নবিজি তাতেও সম্মত না হলে তাঁরা এক বছরের অবকাশ চান; কিন্তু তিনি তাতেও অস্বীকৃতি জানান। এরপর তাঁরা বলেন, 'আপনি এ ব্যাপারে আমাদের অন্তত এক মাস সময় দিন।' কিন্তু নবিজি তাঁদের কোনো সময় দিতে রাজি হননি।

প্রতিনিধিদলের লোকজন মূর্তি ভাঙার ব্যাপারে তাঁদের বোকা ও নির্বোধ সম্প্রদায়ের প্রতিবাদী হয়ে ওঠার আশঙ্কা করছিল। শেষপর্যন্ত তাঁরা রাসুলের কাছে নিজেরা মূর্তি ভাঙার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলে তিনি তা মনজুর করেন। এরপর তাঁরা সালাত না পড়ার অনুমতি চান। তাঁদের এ কথা শুনে নবিজি বলেন, 'ওই ধর্মে কোনো কল্যাণ নেই, যেখানে সালাত নেই।'[৯৭]

এভাবে সাকিফের লোকজন রাসুলের কাছে বিভিন্ন ফরজ ইবাদত পালনের ব্যাপারে শৈথিল্য এবং বিভিন্ন হারাম কাজের অনুমতি চাইছিলেন; কিন্তু তাঁদের কোনো দাবিই মানা হয়নি। ফলে তাঁরা পূর্ণরূপে সত্যধর্মের অনুসারী হতে বাধ্য হন।

রাসুল ﷺ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সদাচরণ করেন এবং সম্মানজনকভাবেই তাঁদের আপ্যায়ন করেন। আগমন থেকে বিদায় পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে অত্যন্ত ভালো আচরণ করেন। তিনি তখন উসমান ইবনু আবিল আসকে তায়েফের শাসক নিযুক্ত করেন। উসমান বয়সে তাঁদের মধ্যে কনিষ্ঠ হলেও কুরআন ও ধর্মীয় জ্ঞানে ছিলেন সবার চেয়ে অগ্রগামী। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা নবিজির আচরণ এবং তাঁদের সঙ্গে মুসলিমদের মেলামেশায় অত্যন্ত প্রভাবিত হন। এমনকি তাঁরা রমজানের বাকি দিনগুলোতে রোজা রাখতে শুরু করেন। এভাবে মদিনায় ১৫ দিন অবস্থান করে তাঁরা তায়েফে ফিরে যান।[৯৮]

---

[৯৭] *মাগাজি*, ওয়াকিদি : ৩/৯২৮।

[৯৮] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া আস-সাহিহা* : ২/৫১৯-৫২০।

চার. বনু সাকিফের কাছে খালিদের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল

তাঁদের ফিরে যাওয়ার পর বনু সাকিফের কাছে রাসুল ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে মুগিরা ইবনু শুবা ও আবু সুফিয়ানের[৯৯] সমন্বয়ে একটা প্রতিনিধিদল পাঠান।[১০০]

বনু সাকিফের প্রতিনিধিদলের প্রচেষ্টায় যখন বনু সাকিফের সবাই ইসলাম কবুল করে নেন, তখন রাসুলের পাঠানো প্রতিনিধিদলও তায়েফে পৌঁছে যায়। মুগিরা ইবনু শুবার নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটা প্রতিনিধিদল তাঁদের সেই রাব্বাহ মূর্তি ধ্বংস করতে নেমে পড়েন।[১০১] উরওয়া ইবনু মাসউদের[১০২] পরিণতির কথা স্মরণ করে অতর্কিত আক্রমণ থেকে বাঁচতে কঠিন পাহারায় মূর্তি ধ্বংসের কাজ আরম্ভ হয়। সাকিফিদের ধারণা ছিল, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী মূর্তিটা কখনো ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। তাই মূর্তির ধ্বংস হওয়ার দৃশ্য দেখতে নারী-পুরুষ, জোয়ান-বুড়া-শিশু সবাই মাঠে নেমে আসে।

মুগিরা ইবনু শুবা বুদ্ধিমান ও বিনোদনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি বনু সাকিফের হাস্যকর একটা বিষয় তোমাদের দেখাতে চাই।' এরপর তিনি কুঠার দিয়ে মূর্তিটাকে সজোরে আঘাত করে নিজে নিচে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করেন। মূর্তির আক্রোশের শিকার হয়ে তিনি ব্যথা পেয়েছেন ভেবে তায়েফের জনগণ সজোরে চিৎকার করে ওঠে। তারা বলতে থাকে, 'আল্লাহ মুগিরাকে ধ্বংস করুক! নিশ্চয় সে মূর্তির আক্রোশের শিকার হয়েছে।' তারা তাঁকে ভূপাতিত হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল।[১০৩] আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুসলিমবাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশে বলছিল, 'তোমাদের কারও সাধ্য থাকলে দ্বিতীয়বার মূর্তি ধ্বংসের চেষ্টা করে দেখো! আল্লাহর শপথ, কখনোই তোমরা তা করতে পারবে না।' মুগিরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, 'হে সাকিফের লোকেরা, নিশ্চয় এটা একটা পাথরের মূর্তি। তোমরা এর শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করো এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হও।'[১০৪]

মুগিরা ও তাঁর সঙ্গীরা মূর্তিটা সম্পূর্ণ ধসিয়ে দিলে এর পুরোহিত রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে এবং তাদের কল্পিত প্রভুর পক্ষ থেকে এঁদের ধ্বংস করার অপেক্ষা করতে থাকে।[১০৫] মূর্তির কাঠামো ধসে পড়লে সে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'যদি তোমরা মূর্তির

---

[৯৯] প্রাগুক্ত : ৪/ ১৯৫।

[১০০] *দালায়িলুন নুবুওয়াহ,* বায়হাকি : ৫/৩০৪।

[১০১] *মাগাজি,* ওয়াকিদি : ৩/৬৭১।

[১০২] *দালায়িলুন নুবুওয়াহ,* বায়হাকি : ৪/৩০৩-৩০৪।

[১০৩] *আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুস* : ৩০০।

[১০৪] *দালায়িলুন নুবুওয়াহ,* বায়হাকি : ৫/৩০৪।

[১০৫] *আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুস* : ৩০০।

বেদীতে আঘাত হানো, তাহলে অবশ্যই তোমাদের কাজের মন্দ ফল দেখতে পাবে।'[১০৬] তার এই মূর্খতাপূর্ণ কথা শুনে মুগিরা বলে ওঠেন, 'দেখো, আমি এই মূর্তিটার বেদীতে কী করি!' এরপর তিনি মূর্তির বেদী খনন করে সেখান থেকে তার মাটি সরিয়ে প্রোথিত সোনাদানা বের করে আনেন। এই দৃশ্য দেখে মূর্তির তত্ত্বাবধায়ক স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং তার দৃষ্টি থেকে অন্ধত্বের পর্দা সরে যায়।

রাসুলের পাঠানো বাহিনী তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে মূর্তির কাপড় ও অলংকারাদি নিয়ে ফিরে আসে। মুসলিমবাহিনীর সফলতায় আল্লাহর প্রশংসা করে তাঁদের আনীত সম্পদ রাসুল ﷺ সেদিনই তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।[১০৭]

এভাবেই আরবভূমি থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মূর্তি অপসারণ করে সেখানে আল্লাহর ঘর নির্মাণ করা হয়। কেননা, রাসুল ﷺ তায়েফে নিযুক্ত তাঁর প্রতিনিধি উসমান ইবনু আবিল আসকে[১০৮] আদেশ দিয়েছিলেন, যেন তায়েফের সেই প্রসিদ্ধ মূর্তির স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়।[১০৯]

পাঁচ. বনু হারিস ইবনু কাআবের বিরুদ্ধে খালিদের যাত্রা

বনু হারিস ইবনু কাব নাজরানে থাকত। তখন পর্যন্ত তাদের গোত্রের কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। রাসুল ﷺ দশম হিজরির রবিউল আউয়াল অথবা জুমাদাল উলায় খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান যে, তিনি তাদের পরপর তিনবার ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। যদি তারা সাড়া দেয়, তাহলে তা মেনে নেবেন; অন্যথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। খালিদ রা. সেখানে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে চারদিকে অশ্বারোহী পাঠান। বনু হারিস তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামগ্রহণ করলে তিনি রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে অবস্থান করেন এবং তাঁদের ইসলাম, কিতাবুল্লাহ ও রাসুলের সুন্নাহ শিক্ষা দেন। এরপর রাসুলের কাছে গোত্রবাসীর ইসলামগ্রহণ এবং তাঁদের মধ্যে অবস্থান করার সংবাদ জানিয়ে চিঠি লিখলে রাসুল ﷺ তাঁকে গোত্রবাসীর পক্ষ থেকে একটা প্রতিনিধিদল নিয়ে মদিনায় ফিরে আসতে বলেন। নবিজির নির্দেশ অনুযায়ী গোত্রের প্রতিনিধিদল নিয়ে মদিনায় রওনা হন খালিদ।

মদিনায় রওনা হওয়ার আগে কায়েস ইবনু হুসাইন রা.-কে তাঁদের নেতা মনোনীত করেন। পরবর্তী সময়ে তাঁদের দীনি শিক্ষা প্রদান ও রাসুলের সুন্নাহ শেখাতে আমর

[১০৬] *মাগাজি*, ওয়াকিদি : ৩/৯৭২।

[১০৭] *তারিখু ইবনি শায়বাহ* : ২/৫০৭।

[১০৮] *আস-সারায়া ওয়াল বুয়ুস* : ৩০০।

[১০৯] *দালায়িলুন নুবুওয়াহ*, বায়হাকি : ৫/২৯৯-৩০৩।

ইবনু হাজম রা.-কে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়।[১১০]

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুল ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পরিবর্তে আলি রা.-কে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে যখন তিনি হামাদান গোত্রে পৌঁছান, তখন তাঁদের সামনে রাসুলের চিঠি পাঠ করলে তাঁরা সবাই ইসলামগ্রহণ করে। আলি রা. রাসুলের কাছে তাঁদের ইসলামগ্রহণের কথা জানিয়ে চিঠি লিখলে তিনি তা পাঠে আনন্দিত হন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এরপর মাথা উঠিয়ে বলেন, 'হামাদানের ওপর শান্তি বর্ষুক! হামাদানের ওপর শান্তি বর্ষুক!'

দক্ষিণাঞ্চল তথা ইয়ামেনবাসী ইসলাম গ্রহণ করুক—রাসুল ﷺ তা মনেপ্রাণে প্রত্যাশা করতেন। তাঁর চাওয়ামতো দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু করলে ইয়ামেন থেকে একের পর এক প্রতিনিধিদল মদিনায় আসতে শুরু করে। এ থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে, ইয়ামেন অভিমুখী বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের কার্যক্রম প্রায় একই সময়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে পরিচালিত হয়েছিল। রাসুলের প্রতিনিধিদল মূলত শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামি দাওয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করত। আর এ ধরনের পরিকল্পনা নিয়েই প্রথমে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ এবং পরে আলি ইবনু আবি তালিবকে পাঠানো হয়েছিল।[১১১]

---

[১১০] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ৪/২৫০।

[১১১] *আল-ফিকহুস সিয়াসি লিল-ওসায়িকিন নাবাবিয়া* : ২৩১।

চতুর্থ অধ্যায়

ইরতিদাদি ফিতনা দমনে খালিদের অভিযান

এক. আবু বকরের শাসনামলে খালিদ

১. আবু বকরের শাসনামলে বিভিন্ন শহরে গভর্নর নিয়োগ

নবিজির ইনতিকালের পর আবু বকর রা. খলিফা মনোনীত হন। তিনি শহরে শহরে গভর্নর নিযুক্ত করে বিভিন্ন দপ্তর পরিচালনা, কেন্দ্রীয় নির্দেশনা বাস্তবায়ন, সালাতের ইমামত, সাদাকা-কর আদায় ইত্যাদির দায়িত্ব দিতেন। আমির ও গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি রাসুলের অনুসরণ করতেন। এ জন্য নবিজির নিয়োগকৃত গভর্নরদের স্বপদে বহাল রাখেন। তবে গুরুত্ব ও প্রয়োজন বিবেচনায় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাঁদের বদলি করেছেন; কিন্তু কাউকে পদচ্যুত করেননি—যেমনটা ঘটেছিল আমর ইবনুল আসের ক্ষেত্রে।[১১২]

গভর্নর তাঁর অধীন এলাকার তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার পুরোপুরি দায়িত্বশীল ছিলেন। কোথাও সফরে গেলে তাঁর ওপর দায়িত্ব থাকত, তিনি অন্য কাউকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যাওয়ার। যেমন : মুহাজির ইবনু উমাইয়াকে রাসুল ﷺ কিন্দার শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। রাসুলের ইনতিকালের পরও তিনি সে দায়িত্বে বহাল ছিলেন; কিন্তু অসুস্থতার কারণে ইয়ামেন যেতে দেরি হলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত জিয়াদ ইবনু লাবিদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। পরে আবু বকরও ভারপ্রাপ্ত হিসেবে তাঁকে এই পদে বহাল রাখেন। একইভাবে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইরাকের গভর্নরপদে থাকার সময় যখন হিরায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না, তখন অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে যেতেন।

আমির ও গভর্নরদের নিয়োগ দেওয়ার আগে আবু বকর রা. অন্যান্য সাহাবির সঙ্গে পরামর্শ করতেন—চাই তা সেনাবাহিনীর আমির নির্ধারণের বিষয়ে হোক কিংবা কোনো অঞ্চলের। এসব পরামর্শে উমর ও আলি রা. সবার চেয়ে এগিয়ে থাকতেন। এ ছাড়া

---

[১১২] *আল-ওয়ালায়াতু আলাল বুলদান*, আবদুল আজিজ ইবরাহিম আল উমরি : ১/৫৫।

তিনি যাকে গভর্নর নিয়োগের ইচ্ছা করতেন, তার সঙ্গেও ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ করে নিতেন। বিশেষত যখন কাউকে স্থানান্তরের প্রয়োজন দেখা দিত। সুতরাং যখন আমর ইবনুল আসকে তাঁর শাসনাধীন অঞ্চল থেকে ফিলিস্তিনে বদলির প্রয়োজন দেখা দিলো, তখন নির্দেশটি ততক্ষণ কার্যকর করেননি, যতক্ষণ-না এ ব্যাপারে সরাসরি আমরের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। একইভাবে মুহাজির ইবনু উমাইয়াকে ইয়ামেন বা হাজারামাউত— যেকোনো একজায়গার গভর্নর পদ গ্রহণের অনুমতি দেন। এরপর মুহাজির ইয়ামেনকে বেছে নিলে আবু বকর তাঁকে সেখানকার গভর্নর হিসেবেই নিয়োগ দেন।

আবু বকরের নীতি ছিল, তিনি নবিজির সুন্নাহর ওপর আমল করতেন। কোনো সম্প্রদায়ের ওপর কাউকে গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে আগে দেখতেন সে সম্প্রদায়ে পুণ্যবান, বুদ্ধিমান উপযুক্ত কেউ আছে কি না। থাকলে তাকেই নিয়োগ দিতেন। কাউকে কোনো অঞ্চলের গভর্নর নিয়োগ দিলে সেখানে তার গভর্নরবিষয়ক ফরমান লিখে পাঠাতেন। অনেক সময় তাকে সেখানে যাওয়ার পথও নির্ধারণ করে দিতেন। সেসব এলাকার নামও বলে দিতেন, যেসব এলাকা হয়ে তিনি সেখানে যাবেন। বিশেষ করে ওইসব এলাকার ক্ষেত্রে এ পন্থা অবলম্বন করতেন, যেসব এলাকা তখনো বিজিত হয়নি; যেগুলো তখনো ইসলামি খিলাফতের আওতার বাইরে ছিল। শাম ও ইরাক বিজয় এবং ইরতিদাদবিরোধী যুদ্ধকালে এ বিষয়টা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

অনেক সময় কোনো এলাকাকে অন্য এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতেন। মুরতাদবিরোধী যুদ্ধের পর এ বিষয়টা লক্ষ করা যায়। যেমন : জিয়াদ ছিলেন হাজারামাউতের গভর্নর। একপর্যায়ে কিন্দাও তাঁর শাসনাধীন করা হয়। তখন থেকে তিনি হাজারামাউত ও কিন্দার গভর্নর গণ্য হন।

২. উসামাবাহিনী পাঠানোর উদ্দেশ্য

আরবরা তখন যদিও দলে দলে ইসলামগ্রহণ করছিল, তবু তাদের অন্তরে রোমানভীতি কাজ করছিল। কারণ, রোমানরা তখন বিশ্বপরাশক্তি। আরবদের অন্তর থেকে রোমানভীতি দূর করতে রাসুল ﷺ সেনা অভিযান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। নবিজির এই আক্রমণ-পরিকল্পনার দুটি উদ্দেশ্য ছিল :

১. রোমানদের কাছে নিজেদের অবস্থান জানান দেওয়া এবং তাদের দ্বিধায় ফেলা।
২. মুসলিমদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস তৈরি করা যে, আল্লাহর সাহায্যে তাঁরাও রোমানদের মোকাবিলায় দাঁড়াতে পারেন।

এরপর নবিজির নির্দেশে মুসলিমরা সে অঞ্চল জয়ে বেরিয়ে পড়েন। সপ্তম হিজরিতে

একটা বাহিনী পাঠালে আরব ও রোমান-খ্রিষ্টানদের যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে মুতা প্রান্তরে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধ হয়। ইতিহাসে এটা 'মুতার যুদ্ধ' নামে পরিচিত। যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে তিনজন মুসলিম সেনাপতি—জায়েদ ইবনু হারিসা, জাফর তাইয়ার এবং আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা.—শাহাদাতবরণ করেন। শেষপর্যন্ত বাহিনীর নেতৃত্ব নেন সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহর তরবারিখ্যাত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। তিনি অসামান্য যোগ্যতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে মুসলিমবাহিনীকে নিরাপদে মদিনায় ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।[১১৩]

এর পর নবম হিজরিতে খোদ রাসুল ﷺ বড় একটা বাহিনী নিয়ে শাম অভিমুখে রওনা হয়ে তাবুক পর্যন্ত পৌঁছে যান।[১১৪] এ অভিযানে মুসলিম ও রোমানবাহিনীর মধ্যে সরাসরি কোনো যুদ্ধ হয়নি। তবে সেখানকার নেতৃস্থানীয় ও শাসকশ্রেণির লোকজন জিজয়া আদায়ের মাধ্যমে সন্ধি করতে আগ্রহী হয়। তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করে বাহিনী নিয়ে রাসুল ﷺ মদিনায় ফেরেন।[১১৫]

তাবুক অভিযানের পর ১১ হিজরিতে রাসুল ﷺ বালকা (জর্দান) ও ফিলিস্তিনে রোমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। এ জন্য বাহিনীও প্রস্তুত করেন। শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনীর সেনাপতি নির্ধারণ করেন তরুণ সাহাবি উসামা ইবনু জায়েদকে।[১১৬]

হাফিজ ইবনু হাজার রাহ. বলেন, নবিজির ইনতিকালের দু-দিন আগে শনিবারে উসামাবাহিনীর প্রস্তুতি পূর্ণতায় পৌঁছায়। তবে অসুস্থ হওয়ার অনেক আগে সফর মাসের শেষ দিকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন নবিজি। উসামাকে বলেছিলেন, 'তোমার পিতার শাহাদাতস্থলের দিকে বেরিয়ে পড়ো। আমি তোমাকে এই বাহিনীর সেনাপতি নির্ধারণ করলাম।'[১১৭]

উসামাকে সেনাপতি মনোনীত করায় কয়েকজন সাহাবি নবিজির কাছে আপত্তি জানান। কারণ, একে তো তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ, তার ওপর যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ। তা ছাড়া বাহিনীতে আবু বকর ও উমরের মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবিও ছিলেন। কিন্তু যাঁরা আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন, তাঁরা এটা হয়তো লক্ষ করেননি যে, এ সিদ্ধান্ত খোদ রাসুল ﷺ নিয়েছেন; আর রাসুলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার সুযোগ নেই।

রাসুল ﷺ আপত্তিকারীদের বলেন, 'আজ যদি তোমরা উসামার নেতৃত্বে অভিযোগ

---

১১৩ *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া লিস সাহিহা*, উমারি : ২/৪৬৭-৪৭০।

১১৪ *সহিহ মুসলিম—আল-ফাজায়িল* : ৪/৪৭৮৪।

১১৫ *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া আস-সাহিহা* : ২/৫৩৫।

১১৬ *কিসসাতু বা'সি জায়শি উসামা রা.* : ড. ফজলে এলাহি : ৮।

১১৭ *ফাতহুল বারি* : ৮/১৫৪।

উত্থাপন করো, তাহলে ইতিপূর্বে তো তাঁর পিতার নেতৃত্ব নিয়েও অভিযোগ ছিল। আল্লাহর শপথ, তাঁর পিতা নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল। সে ছিল আমার প্রিয়ভাজন। তাঁর অবর্তমানে তাঁর সন্তান উসামাও আমার কাছে প্রিয়দের একজন।'[১১৮]

যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু হওয়ার দু-দিনের মাথায় রাসুল ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতা ক্রমশ বেড়েই চলছিল। ফলে উসামাবাহিনীও রওনা হতে পারছিল না। তাঁরা মদিনার পার্শ্ববর্তী জুরফে[১১৯] শিবির স্থাপন করে অবস্থান করছিলেন। পরে নবিজির ইনতিকালের সংবাদ পেয়ে মদিনায় চলে আসেন।[১২০]

নবিজির ইনতিকালের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এ সময়ের পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে আয়েশা রা. বলেন, 'রাসুলের ইনতিকালের পর অধিকাংশ আরব মুরতাদ হয়ে যায়। সর্বত্র নিফাক ছড়িয়ে পড়ে।[১২১] আমার ওপর[১২২] এমন বিপদ নেমে আসে, যদি তা কোনো পাহাড়ে পড়ত, তাহলে পাহাড়ও ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত।[১২৩] তখন সাহাবিদের অবস্থা এমন ছিল, যেন বৃষ্টিঝরা রাতে ভেজা বকরিগুলো হিংস্র পশুতে ভরপুর কোনো মাঠে অবস্থান করছে।'[১২৪]

এর পর আবু বকর রা. খিলাফতের দায়িত্ব নিজ কাঁধে উঠিয়ে নিলে নবিজির ইনতিকালের তৃতীয় দিন ঘোষক মারফত জনগণকে জানিয়ে দেওয়া হয়—'উসামাবাহিনী তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাবে। অতএব, যাঁরা ইতিপূর্বে তাঁর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা যেন দ্রুত মদিনার বাইরে জুরফে চলে যায়।'[১২৫]

৩. আবু বকর কর্তৃক উসামাবাহিনী প্রেরণ

উসামাবাহিনী ৪০ দিন, মতান্তরে দু-মাস পর মদিনায় ফিরে এলে আবু বকর রা. সাহাবিদের নিয়ে মদিনা থেকে এক দিনের দূরত্বে অবস্থিত 'জুল-কিসসা'য় মুরতাদ এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে চড়াও হন। সাহাবিরা তাঁর কাছে আবেদন করেন, 'আপনি অন্য কাউকে পাঠিয়ে নিজে মদিনায় থাকুন এবং খিলাফত পরিচালনা করুন।' তাঁরা এই দাবির ওপর খুবই জোর দিচ্ছিলেন। আয়েশা রা. বলেন,

---

[১১৮] *সহিহ বুখারি,* কিতাবুল মাগাজি : ৪৪৬৯।

[১১৯] জুরফ হচ্ছে শামের দিকে মদিনা থেকে তিন মাইল দূরের একটি জায়গার নাম।

[১২০] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া আস-সাহিহা* : ২/৫৫২; *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া ফি জু-ইল মাসাদিরিল আসলিয়াহ* : ৬৮৫।

[১২১] *আন-নিহায়া ফিল গারিবিল হাদিস* : ২/৪৫৫।

[১২২] *তারিখু খলিফা* : ১০২। 'আমার পিতার ওপর'।

[১২৩] *আন-নিহায়া* : ৫/২৮৮।

[১২৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩০৯।

[১২৫] প্রাগুক্ত : ৬/৩০৭।

আব্বাজান তরবারি বের করে 'জুল-কিসসা' অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন। তখন আলি ইবনু আবি তালিব বেরিয়ে এসে তাঁর উটের লাগাম ধরে বলতে থাকেন, 'আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আমি আপনাকে তা-ই বলব, যা উহুদের দিন নবিজি আপনাকে বলেছিলেন[১২৬]—“তরবারি খাপে ঢুকিয়ে নাও এবং নিজের ব্যাপারে দুঃসংবাদ শুনতে না দাও!” আল্লাহর শপথ, আপনার যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তাহলে মদিনায় ইসলামের অবস্থা বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। অতএব, আপনি ফিরে আসুন।'[১২৭]

৪. মুসলিমবাহিনীকে ১১ ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের আমির নির্ধারণ

আবু বকর মুসলিমবাহিনীকে ১১ ভাগে ভাগ করেন এবং প্রত্যেক ভাগে একজন করে আমির নিযুক্ত করেন।[১২৮] আর আমিরদের নির্দেশ দেন, যে এলাকার পাশ দিয়েই যাবে, সেখানকার মুসলিমদের নিজেদের সঙ্গে নিয়ে নেবে। সেই বাহিনীগুলো ছিল নিম্নরূপ :

- খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বাহিনী : প্রথমে বনু আসাদের দিকে, এরপর বনু তামিমের দিকে, সব শেষে ইয়ামামার দিকে।
- ইকরিমা ইবনু আবি জাহলের বাহিনী : প্রথমে বনু হানিফায় মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবের দিকে, এরপর যথাক্রমে ওমান, মাহরা, হাজারামাউত ও ইয়ামেনের দিকে।
- শুরাহবিল ইবনু হাসানার বাহিনী : প্রথমে ইয়ামামায় ইকরিমার পেছনে পেছনে, এরপর হাজারামাউতের দিকে।
- তুরায়ফা ইবনু হাজিবের বাহিনী : হাওয়াজিন গোত্রের শাখা বনু সালিমের দিকে।
- আমর ইবনুল আসের বাহিনী : কুজাআর দিকে।
- খালিদ ইবনু সাআদ ইবনু আসের বাহিনী : শামের দিকে।
- আলা ইবনুল হাজরামির বাহিনী : বাহরাইনের দিকে।
- হুজায়ফা ইবনু মিহসান গিলফায়ির বাহিনী : ওমানের দিকে।
- আরফাজা ইবনু হারমাসার বাহিনী : মাহরার দিকে।
- মুহাজির ইবনু উমাইয়ার বাহিনী : ইয়ামেনের দিকে (সানা হাজারামাউত)।

---

[১২৬] এর দ্বারা ইশারা হচ্ছে সেই ঘটনার দিকে যে, উহুদের দিন যখন আবু বকর রা. প্রতিপক্ষে থাকা তাঁর ছেলে আবদুর রাহমানকে হত্যার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন নবিজি বলেছিলেন, 'তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে তোমার জায়গায় চলে যাও!'

[১২৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩১৯।

[১২৮] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/৪৯।

- সুওয়াইদ ইবনু মুকাররিনের বাহিনী : তিহামা ও ইয়ামেনের দিকে।[১২৯]

এভাবে জুল-কিসসাকে কেন্দ্র বানিয়ে চারদিকে সেনাবাহিনী ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আবু বকরের পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত বিরল সামরিক যোগ্যতার স্বাক্ষর এবং এটা ছিল তাঁর সূক্ষ্ম ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচায়ক।[১৩০]

৫. বাহিনী পরিচালনায় আবু বকরের প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা

বাহিনীবণ্টন এবং স্থাননির্ধারণ থেকে আবু বকরের ভৌগোলিক জ্ঞানের গভীরতা স্পষ্ট। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি ভূখণ্ডের চিহ্ন, জনবসতি এবং জাজিরাতুল আরবের রাস্তাঘাট সম্পর্কে ছিলেন সম্যক অবহিত। তাঁর সামনে জাজিরাতুল আরব যেন একটা কায়া হিসেবে দৃশ্যমান ছিল; তিনি যেন তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলেন। তাঁর সে কেন্দ্রটা যেন ছিল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধকেন্দ্রসমূহের মতো, যেখানে বসে যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বাহিনী পাঠানো, তাদের গন্তব্য নির্ধারণ, বিচ্ছিন্নতা দেখা দিলে পুনরায় সংগঠিতকরণের ব্যবস্থাপনা নিয়ে চিন্তা করবে। যারা জাজিরাতুল আরবের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে অবহিত, তারা অবশ্যই অনুমান করতে পারবে—আবু বকরের এই ব্যবস্থাপনা ছিল আদর্শিক ও যুগান্তকারী একটা ব্যবস্থাপনা।

এই ১১ বাহিনীর এক দলের সঙ্গে অপর দলের যোগাযোগব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত চমৎকার। আবু বকর কেন্দ্রে বসে সারাক্ষণ জানতে পারতেন তাঁর কোন বাহিনী কোথায় অবস্থান করছে। তাদের প্রতিটা পদবিক্ষেপের খবর রাখতেন। জানতেন কোথায় আজ সফলতা এসেছে এবং তাদের কালকের পরিকল্পনাই-বা কী! যোগাযোগব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত গোপন অথচ গতিময়। প্রতিটা রণক্ষেত্র থেকে মদিনায় তাঁর কাছে তাৎক্ষণিকভাবে খবর আদানপ্রদান হতো। এককথায়, পুরো বাহিনীর সঙ্গে যেন তাঁর অদৃশ্য এক যোগাযোগ ছিল। কেন্দ্র ও রণক্ষেত্রে সংবাদ আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে আবু খায়সামা আনসারি, সালমা ইবনু সালামা, আবু বারজা আসলামি ও সালমা ইবনু ওয়াক্‌শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১৩১]

আবু বকর রা. যেসব বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা যেন একটা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলেন। এ ছিল খিলাফতের অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা। এসব বাহিনীর মধ্যে নেতৃত্বের দক্ষতার পাশাপাশি সুশৃঙ্খলা ছিল অটুট। এঁরা ছিলেন যুদ্ধের ব্যাপারে পূর্ব-অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। রাসুলের যুগেই তাঁরা নিজেদের সামরিক দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

---

[১২৯] *তারিখুত তাবারি* : ৪/৬৮; *দিরাসাতুন ফি আসরিন নুবুওয়াহ* : ৩২১।

[১৩০] *দিরাসাতুন ফি আহদিন নুবুওয়াতি ওয়াল খুলাফায়ির রাশিদিন* : ৩২১।

[১৩১] *ফিত তারিখিল ইসলামি*, শাওকি আবু খলিল : ২২৬-২২৭।

আবু বকরের সামরিক প্রজ্ঞা জাজিরাতুল আরবের সকল সামরিক নেতার চেয়ে ছিল অনেক উর্ধ্বে, অনেক আধুনিক।[১৩২]

দুই. ইরতিদাদি ফিতনা দমনে খালিদ

আবু বকর রা. এই ১১ বাহিনীর সামগ্রিক নেতৃত্ব অর্পণ করেছিলেন আল্লাহর তরবারিখ্যাত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের হাতে। খালিদ ছিলেন ইসলামের বিজয়াভিযানের প্রাণপুরুষ এবং ইরতিদাদি ফিতনা দমনে অনুপম সামরিক প্রজ্ঞা প্রদর্শনকারী ব্যক্তি। মুসলিমবাহিনীর এই বণ্টনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যবস্থাপনা। মুরতাদরা তখনো ছিল যার যার এলাকায় পৃথক পৃথক অবস্থানে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে তখনো ঐক্যবদ্ধ ছিল না। বড় বড় গোত্র ছিল দূরদূরান্তে বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। তারা একত্রিত হওয়ার সময় করে উঠতে পারেনি। কারণ, প্রথমত ইরতিদাদি ফিতনা শুরু হওয়ার পর তখনো তিন মাস অতিক্রান্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত, তারা মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিজেদের কোনো প্রকার শঙ্কার মধ্যে আছে বলে মনে করেনি। তারা এই দিবাস্বপ্নে বিভোর ছিল যে, কয়েক মাসের মধ্যেই মুসলিমদের নির্মূল করে ফেলবে। তাই আবু বকর রা. চাচ্ছিলেন, সংগঠিত হওয়ার আগেই ওদের শক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলবেন। ঝটিকা আক্রমণের মাধ্যমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলবেন।[১৩৩] এ উদ্দেশ্যে ফিতনাটা পূর্ণ শক্তিতে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার আগেই তিনি তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর অবকাশটুকুও দেননি। আবু বকর তখন এই হিকমাহর ওপর আমল করেছিলেন,

বুদ্ধিমান হয়ে থাকলে সাপের লেজ কেটে ছেড়ে দেবে না
যদি পারো লেজের সঙ্গে মাথাটাও কেটে ফেলো।

তিনি এই ফিতনার ভয়াবহতা ও এর মন্দ পরিণতি ভালো করে আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, শুরুতেই যদি এর টুঁটি চেপে ধরা না যায়, তাহলে ভবিষ্যতে ছাইচাপা আগুন থেকে লেলিহান শিখা জ্বলে উঠতে পারে। তখন ওই আগুন শুকনো ও ভেজা সবকিছু পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেবে। কবি বলেন,

ছাইয়ের নিচে আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি,
শীঘ্রই তা দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে।[১৩৪]

---

[১৩২] *মিন দাওলাতি উমারা ইলা দাওলাতি আবদিল মালিক*, ইবরাহিম বায়জুন : ২৭।

[১৩৩] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/৫১।

[১৩৪] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ৩১২-৩১৩।

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর ছিলেন প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ এবং দক্ষ একজন সমরবিদ। যেকোনো বিষয়ের সঠিক ধারণা রাখায় ছিলেন বিশেষ পারঙ্গম। এ ছাড়া ছিলেন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাগ্রহণে অত্যন্ত দক্ষ।

একপর্যায়ে সেই ১১টা বাহিনী বেরিয়ে পড়ে। তাঁদের হাতে ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়ছিল। তাঁদের ইমানে দেখা দিয়েছিল জগৎপ্লাবী জোয়ার। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর বড়ত্ব উপস্থাপনকারী। তাঁদের অন্তর থেকে নিষ্ঠাপূর্ণ দুআ বের হতো। কণ্ঠ কেবল আল্লাহর জিকির দ্বারা সচল থাকত। আল্লাহ তাঁদের পবিত্র দুআ কবুল করেন। তাঁদের ওপর তাঁর সাহায্য অবারিত করেন। তাঁদের মাধ্যমে তাঁর বাণী ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন। দীনের হিফাজতের যে অঙ্গীকার তিনি দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়ন করেন। ফলে মাত্র কয়েক মাসেই জাজিরাতুল আরব ইসলামের অনুগত হয়ে যায়।[১৩৫]

আবু বকর রা. ইরতিদাদের শিকার গোত্রগুলোর উদ্দেশে একটা চিঠি লেখেন। চিঠিতে তাদের ইসলামের দিকে ফিরে আসা এবং একে সত্যিকার অর্থে ধারণের আহ্বান জানান। বাতিল আঁকড়ে থাকার ব্যাপারে ইহ ও পরকালীন শাস্তির ভয় দেখান। এতে কঠোর ভাষা ব্যবহার করেন। পদ্ধতিটা ছিল দীন থেকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ার এবং বাতিলের ওপর জমে থাকার মোকাবিলায় যথোপযুক্ত প্রতিষেধক। তাদের নেতাদের মাথায় ঔদ্ধত্য ও অহংকার ছেয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা তাদের অনুসারীদের মস্তিষ্ক গুলিয়ে দিয়েছিল। এ জন্য তাদের মাথা থেকে ঔদ্ধত্যের এই ভূত নামাতে কঠোরতাই কাম্য ছিল।[১৩৬]

তিন. তুলায়হা আসাদির ফিতনা মোকাবিলায় খালিদ

১. তুলায়হা আসাদির ফিতনা

নবুওয়াতের দাবিদারদের মধ্যে তুলায়হা আসাদি ছিল তৃতীয় অবস্থানে। সে নবিজির জীবনের একেবারে অন্তিম মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে। তার নাম তুলায়হা ইবনু খুওয়াইলিদ ইবনু নাওফাল ইবনু নাজলা আল আসাদি। নবম হিজরিতে সে একদল প্রতিনিধিসহ রাসুলের দরবারে আসে। মদিনায় পৌঁছে রাসুল ﷺ-কে সালাম দেয়। এরপর অনুগ্রহের প্রকাশ দেখাতে গিয়ে বলে, 'আমরা নিজে থেকে আপনার খিদমতে এসেছি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি তাঁর বান্দা ও রাসুল; অথচ তিনি আমাদের কাছে কাউকে পাঠাননি। আমরা আমাদের পেছনে

---

[১৩৫] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/৫১।

[১৩৬] প্রাগুক্ত : ৯/৫৫।

থাকা লোকদের জন্য যথেষ্ট।' এর ভিত্তিতে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়,

﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ۖ قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ ۖ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

তারা মুসলমান হয়ে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাকে ধন্য করেছ এটা মনে করো না; বরং আল্লাহ ইমানের পথে পরিচালিত করে তোমাদের ধন্য করেছেন; যদি তোমরা সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকো। [সুরা হুজুরাত : ১৭]

এরপর প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তুলায়হাও নিজের এলাকায় ফিরে আসে এবং একসময় ইরতিদাদের শিকার হয়ে নবুওয়াতের দাবি করে বসে।[১৩৭] নবুওয়াতের দাবি করার পর চতুর তুলায়হা যখন বুঝতে পারে—মুসলিমদের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য, তখন সামিরা অঞ্চলকে নিজের সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে নেয়। এভাবে সাধারণ মানুষ তার অনুগত হতে থাকলে ধীরে ধীরে তার নবুওয়াতের বিষয়টাও ছড়াতে থাকে। মানুষের পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ ছিল, তারা তার সঙ্গে এক সফরে ছিল। সফরের একপর্যায়ে তাদের সঙ্গে থাকা পানি শেষ হয়ে যায় এবং প্রচণ্ড পিপাসায় তারা কাতরাতে থাকে। তখন সে লোকজনকে বলে, 'তোমরা আমার ঘোড়া "ইলালে" চড়ে কয়েক মাইল যাও, পানি পেয়ে যাবে।' তারা এমনটা করলে পানি পেয়ে যায়। এভাবে গ্রাম্য সহজ-সরল লোকগুলো তার ফিতনায় পড়ে।[১৩৮]

তার কুকীর্তির মধ্যে এটাও একটা যে, সে সালাতের মধ্যে সিজদা ছেড়ে দেয়। তার ধারণা ছিল, আসমান থেকে তার ওপর ওহি নাজিল হয়। তার ছন্দোবদ্ধ বাক্যসমূহের এটাও একটা, যাকে সে ওহি বলে দাবি করত,

والحمام واليمام، والصرد والصوام، قد صمن قبلكم باعوام، ليبلغن ملكنا العراق والشام.

কবুতর ও জংলি কবুতর, সুরদ ও সাওয়াম, তোমরা ইতিপূর্বে অনেক বছর রোজা রেখেছ। ইরাক ও শামে আমাদের রাজত্ব হবে।[১৩৯]

তুলায়হার অহংকার ক্রমশ বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে তার শক্তি ও জনবল। রাসুল ﷺ তার এসব কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর জিরার ইবনুল আজওয়ার

---

১৩৭ *উসদুল গাবাহ* : ৩/৯৫।

১৩৮ *হুরুবির রিদ্দাহ,* মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমিল : ৭৯।

১৩৯ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৩।

আসাদিকে তার মোকাবিলায় পাঠান; কিন্তু আসাদ ও গাতফানের মতো শক্তিশালী দুই গোত্র তার অনুগত ছিল। এ কারণে তার মোকাবিলা করা জিরারের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[১৪০]

দায়িরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া (ইসলামি এনসাইক্লোপিডিয়া) তুলায়হার ব্যাপারে ভুল তথ্য উপস্থাপন করেছে। এতে লেখা হয়েছে, 'সে উপস্থিত কবিতা আবৃত্তি করতে পারত। রণাঙ্গনে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই সেনাদের মধ্যে উদ্দীপনামূলক ভাষণ দিতে পারত।' এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, সে ছিল জাহিলি যুগের নেতাদের অনুসরণীয় ব্যক্তি। তার মধ্যে অনেক গুণের সমাহার ছিল। সে ছিল গণক, কবি, বক্তা ও যোদ্ধা।[১৪১]

এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে তুলায়হা আসাদির প্রশংসা করা হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, সে ছিল একজন আদর্শ নেতা। উপস্থিত কবিতা আবৃত্তি ও ভাষণ দিতে ছিল পারঙ্গম। তৎকালে আরবরা এ দুটি গুণের খুব কদর করত। আর এনসাইক্লোপিডিয়ার পক্ষ থেকে এমন ব্যক্তির প্রশংসা নতুন কিছু নয়; বরং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে ইসলাম নিয়ে সমালোচনা। আমাদের জানা নেই তারা জানে কি না যে, তুলায়হা তাওবা করে ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে খাঁটি মুসলিম হিসেবে বাকি জীবন অতিবাহিত করেছেন।

২. তুলায়হার মোকাবিলায় খালিদ

তুলায়হার ব্যাপারটা ঝুলন্ত অবস্থায়ই নবিজি ইনতিকাল করেন।[১৪২] এর পর খিলাফতের বাগডোর আবু বকরের হাতে আসে। তিনি খলিফা হওয়ার পরই মুরতাদদের নির্মূল করতে সেনাবাহিনী গঠন করতে মনোযোগী হন। পৃথক পৃথক সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তুলায়হা আসাদিকে দমন করতে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে পাঠিয়েছিলেন।

ইমাম আহমাদের বর্ণনা; আবু বকর রা. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করার সময় বলেছিলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "খালিদ আল্লাহর উত্তম একজন বান্দা। নিজের গোত্রেও উত্তম ব্যক্তি। তিনি আল্লাহর তরবারিসমূহের একটি তরবারি। আল্লাহ তাঁকে কুফফার ও মুনাফিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।"'[১৪৩]

খালিদ রা. জুল-কিসসা অভিমুখে রওনা হলে আবু বকর রা. তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়ে বলেন, তিনি অন্যান্য নেতাকে নিয়ে খায়বারের দিক থেকে এসে তাঁর সঙ্গে

---

[১৪০] *উসদুল গাবাহ* : ৩/৯৫।

[১৪১] *দায়িরাতুল মাআরিফিল ইসলামিয়া—হারকাতুর রিদ্দাহ* : ৭৮।

[১৪২] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ৭৮।

[১৪৩] *মুসনাদু আহমাদ* : ১/১৭৩। শায়খ আহমাদ শাকির হাদিসটির সনদ বিশুদ্ধ বলেছেন।

মিলিত হবেন। তাঁকে নির্দেশ দেন, 'প্রথমে আপনি তুলায়হার দিকে যাবেন। তাদের শায়েস্তার পর বনু তামিমের মোকাবিলা করবেন।'

তুলায়হা এ সময় বনু আসাদ ও গাতফানে অবস্থান করছিল। ইতিমধ্যে বনু আবস ও জুবইয়ানের লোকেরা তার সঙ্গ দেয়। সে তখন বনু তাইয়ের শাখা জাদিলা ও গাওসের সাহায্য চায়। লোক পাঠিয়ে দ্রুত তাদের তার সঙ্গ দেওয়ার আহ্বান জানায়। এদিকে আবু বকর রা. বনু তাইকে তুলায়হার সঙ্গ দেওয়া থেকে বিরত রাখতে আদি ইবনু হাতিমকে খালিদের আগেই বনি তাইয়ের দিকে পাঠিয়ে দেন। তিনি আদিকে বলেন, 'তুমি তাদের বিরত রাখার চেষ্টা করবে। বিরত না হলে ভয়ংকর পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।'

আদি রা. বনু তাইয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁর গোত্রকে আবু বকরের হাতে বায়আত হতে আহ্বান জানান।[১৪৪] তাদের বলেন, 'আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো।' তারা জবাব দেয়, 'আমরা আবু ফুসাইলের[১৪৫] (আবু বকর) হাতে বায়আত হব না।' আদি বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আবু বকরের বাহিনী তোমাদের পর্যন্ত পৌঁছে গেলে যতক্ষণ-না তোমরা জেনে যাচ্ছ যে, আবুল ফাহাল[১৪৬] হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয়, ততক্ষণ তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।'

আদি ইবনু হাতিম তাদের পেছনে লেগে থাকেন। একপর্যায়ে তারা অনেকটা নমনীয় হয়ে আসে। এরইমধ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদও তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছান। তাঁর সঙ্গে যে-সকল আনসার সাহাবি ছিলেন, তাঁদের প্রথম কাতারের সেনাপতি ছিলেন সাবিত ইবনু কায়েস ইবনু শাম্মাস। তিনি সেখানে এসেই শত্রুবাহিনীর গতিবিধির খোঁজ নিতে সাবিত ইবনু আকরাম ও উক্কাশা ইবনু মিহসানকে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা তুলায়হার ভাতিজা হিবালকে পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন। সংবাদটা জানতে পেরে তুলায়হা ও তার ভাই সালমা বেরিয়ে আসে। ফলে সাবিতের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হয়। একপর্যায়ে তুলায়হা উক্কাশা ও সাবিতকে শহিদ করে ফেলে।

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. সেখানে পৌঁছে তাঁদের শহিদ অবস্থায় দেখতে পেয়ে জ্বলে ওঠেন। প্রত্যেক মুসলিমের কাছে ব্যাপারটা ভীষণ পীড়াদায়ক ঠেকে। খালিদ তখন সেখান থেকে সোজা বনু তাইয়ের দিকে মোড় নেন। সেখানে পৌঁছতেই আদি ইবনু হাতিম বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তিনি তাঁর কাছে আবেদন জানান, 'আপনি আমাকে আরও তিনটা দিন অবকাশ দিন। তারা আমার কাছে এই অবকাশটুকু চেয়েছে, যাতে তাদের যে লোকজন তুলায়হার সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে

১৪৪ *তারতিবু ওয়া তাহজিবুল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খিলাফাতু আবি বাকরিন,* ড. সামিল সুলামি : ১০১।

১৪৫ *ফুসাইল* অর্থ ছোট উট বা উটের বাচ্চা।

১৪৬ *ফাহাল* অর্থ বড় ষাঁড় উট।

পারে। তারা আশঙ্কা করছে, এই মুহূর্তে তারা আপনার সঙ্গ দিলে তুলায়হা হয়তো তার কাছে থাকা বনু তাইয়ের যুবকদের হত্যা করে ফেলতে পারে। আশা করি, তারা জাহান্নামে পড়ার চেয়ে তাদের প্রত্যাবর্তন আপনার কাছে ভালোই লাগবে।' তিন দিন পর আদি রা. তাঁর গোত্রের ৫০০ মুজাহিদ নিয়ে খালিদের সঙ্গে যোগ দেন। এভাবে তাঁরা সবাই সত্যের দিকে ফিরে এসেছিল।

চার. বনু জাদিলা অভিমুখে খালিদ

এর পর খালিদ বনু জাদিলা অভিমুখে বের হন। আদি তখনো এগিয়ে এসে বলেন, 'আমাকে কয়েকটা দিনের অবকাশ দিন, ইনশাআল্লাহ আমি তাদেরও আপনার কাছে নিয়ে আসছি। আমি যথেষ্ট আশাবাদী যে, আল্লাহ তাদেরও বনু গাওসদের মতো রক্ষা করবেন।'[১৪৭] সুযোগ পেয়ে আদি রা. তাদের কাছে যান এবং নাছোড়বান্দার মতো তাদের পেছনে লেগে থাকেন। একপর্যায়ে তারা আদির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামের দিকে ফিরে আসে। তাদের ১ হাজার যোদ্ধা মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। এভাবে আদি তাঁর গোত্রের উভয় শাখার জন্য একজন মহান ত্রাতা ও বরকতময় সত্তা হিসেবে আবির্ভূত হন।[১৪৮]

পাঁচ. বুজাখার যুদ্ধ এবং বনু আসাদের বিদ্রোহ দমন

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বনু আদির ব্যাপারটা সফলভাবে সমাধানের পর সেখান থেকে বেরিয়ে 'আজা' ও 'সালমা'য় যান। এরপর সেনাবিন্যাস করে তুলায়হার মুখোমুখি হন। তখন অনেক গোত্র দেখতে চেয়েছিল কারা বিজয়ী হয়। তুলায়হা তার গোত্র ও সহযোগী গোত্রগুলো নিয়ে ময়দানে চলে আসে। বনু ফাজারার উয়াইনা ইবনু হিসনও ৭০০ সেনা নিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেয়। সেনাসারি বিন্যস্ত করার পর সে নিজেকে চাদরে জড়িয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যাচ্ছিল। অপেক্ষা করছিল তার কল্পিত ওহি অবতরণের। ইতিমধ্যে উয়াইনা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে যায়। যুদ্ধ করতে করতে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তখন তুলায়হার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কী খবর, জিবরিল এসেছিলেন?' তুলায়হা জবাব দেয়, 'না।' উয়াইনা তখন ফিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর পুনরায় এসে জিজ্ঞেস করে, 'জিবরিল এসেছিলেন?' এবারও সে উত্তর দেয়, 'না।' সে পুনরায় ফিরে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে জিজ্ঞেস করে, 'এসেছিলেন?' তুলায়হা জবাবে বলে, 'হ্যাঁ, এসেছিলেন।' উয়াইনা জানতে চায়, 'তিনি কী বললেন?' তুলায়হা বলে, 'জিবরিল বলেছেন "তোমার জন্য রয়েছে একটা

---

[১৪৭] *তারতিবু ওয়া তাহজিবুল বিদায়া ওয়ান নিহায়া—খিলাফাতু আবি বাকরিন*, ড. মুহাম্মাদ সামিল সুলামি : ১০২।

[১৪৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৩২২।

চাকা, ঠিক তার চাকার মতো। আর এমন ঘটনা, যা জীবনেও ভুলতে পারবে না।"'

উয়াইনা তখন তাকে বলে, 'মনে হয়, আল্লাহ জেনে গেছেন তোমার সঙ্গে অনুরূপ ঘটনাই ঘটতে যাচ্ছে, যা তুমি জীবনে কখনো ভুলতে পারবে না।' এরপর সে উঁচু আওয়াজে বনু ফাজারাকে বলে, 'যুদ্ধ বন্ধ করো, আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি।' মুসলিমরা তুলায়হার কাছাকাছি পৌঁছে দেখতে পান, সে আগে থেকেই তার ঘোড়া প্রস্তুত করে রেখেছে এবং সে ও তার স্ত্রী নাওয়ার উটে সওয়ার হয়ে আছে। তারা আরেকটু কাছাকাছি হতেই তুলায়হা সস্ত্রীক শামের দিকে পালিয়ে যায়। সে পালানোর সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনীও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তখন মুসলিমদের হাতে তার সঙ্গী-সাথিদের বড় একটা অংশকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দেন।

খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকরের কাছে খালিদের বিজয় এবং তুলায়হার পরাজয়ের সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি এক চিঠিতে খালিদকে বলেন,

> *আল্লাহ তোমার ওপর যে অনুগ্রহ করেছেন, এতে নিশ্চয় তোমার কল্যাণে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। তুমি নিজের ব্যাপারে খোদাভীতি অবলম্বন করবে। আল্লাহ মুত্তাকি ও পরহেজগারদের সঙ্গ দেন। নিজের অভিপ্রায়ে অটল থাকবে। কখনো নরম হবে না। যদি মুশরিকদের এমন কাউকে পাও, যারা মুসলিমদের হত্যা করেছে, তাকে শিক্ষণীয় শাস্তি দেবে।*

১. বুজাখায় খালিদের অবস্থান

এরপর খালিদ রা. বুজাখায় এক মাস অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানকালে সে-সকল লোককে খুঁজতে থাকেন, যাদের ব্যাপারে আবু বকর রা. উপরিউক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইরতিদাদি ফিতনা চলাকালে কোনো মুসলমানকে হত্যা করেছে—তিনি সেখানে এমন যাকেই পেতেন—তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে থাকেন। এক মাস তিনি এই অভিযানেই ব্যস্ত থাকেন। কাউকে কিসাসস্বরূপ আগুনে ঠেলে দেন। কাউকে পাথর দিয়ে থ্যাঁতলে দেন। কাউকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা করেন। এসব করার কারণ ছিল—মুরতাদরা আরবের মুসলিমদের এমন বেদনাদায়ক কষ্ট দিয়েই হত্যা করেছিল।

২. উম্মু জিমালের কাহিনি

তুলায়হার ভ্রান্ত সঙ্গীদের মধ্যে বনু গাতফানের বড় একটা দল জাফারে[১৪৯] উম্মু

---

[১৪৯] এটি বসরা থেকে মদিনার পথে হাওয়াবের কাছে অবস্থিত।

জিমাল সালমা বিনতু মালিক ইবনু হুজায়ফা নামের এক মহিলার পাশে জড়ো হয়। এই মহিলাও ছিল উম্মু কিরফার মতো আরবের নেতৃস্থানীয় মহিলা। মর্যাদা ও অবস্থান বোঝাতে গিয়ে তার মায়ের উদাহরণ পেশ করা হয়। তার প্রচুর সন্তান ছিল। এ ছাড়া তার পরিবার ছিল সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদার দিক দিয়ে বিখ্যাত। তারা মহিলাটার পাশে জড়ো হলে সে খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাদের উসকানি দেয়। এতে তারা আগুনের মতো জ্বলে ওঠে এবং বনু সালিম, তাই, হাওয়াজিন ও আসাদের লোকজন তার সঙ্গী হয়ে যায়। এরপর উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। মহিলা তার মায়ের উটে আরোহী ছিল—যে উটের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, যে ব্যক্তি এই উটকে উত্তেজিত করতে পারবে, তার জন্য রয়েছে ১০০টা উট পুরস্কার। এটা শুধু এর সম্মান ও শক্তি দেখানোর উদ্দেশ্যেই। খালিদ তাদের স্পষ্ট পরাজয় উপহার দেন। তার উটসহ তাকে হত্যা করেন। এরপর বিজয়ের সুসংবাদ মদিনায় সিদ্দিকে আকবরের কাছে পাঠান।[১৫০]

৩. শিক্ষা ও তাৎপর্য

ক. আবু বকরের আল্লাহ-নির্ভরতা ও সামরিক দক্ষতা

আবু বকর রা. আদি ইবনু হাতিমকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার গোত্রে দ্রুত পৌঁছে যাও, যাতে তারা তুলায়হার সঙ্গে যোগ দিয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি না হয়।' এটা তাঁর বিশ্বাস এবং আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের ওপর পূর্ণ আস্থার স্পষ্ট দলিল। বনু তাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর আগেই যুদ্ধের পরিণতির কথা বলে দিয়েছিলেন। এরপর খালিদকে এই নির্দেশনা দিয়ে পাঠান—'বনি তাইকে দিয়েই যুদ্ধ শুরু করবে।' অথচ তারা ছিল তুলায়হার অবস্থান থেকে অনেক দূরে। উদ্দেশ্য ছিল, বনি তাই যেন ভয়ে তুলায়হার সঙ্গ না দেয়। যারা ইতিমধ্যে যোগ দিয়েছে, তারাও যাতে নিজের গোত্র-রক্ষার লক্ষ্যে তুলায়হার সঙ্গ ছেড়ে মুসলিমবাহিনীতে যোগ দেয়। এ ছিল অত্যন্ত দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ও সুচিন্তিত যুদ্ধপরিকল্পনা। তিনি চাচ্ছিলেন বনু তাই ও তাদের পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোকে ভয় পাইয়ে দিতে।

খ. খালিদের প্রতি আবু বকরের উপদেশ

এ অভিযানের জন্য আবু বকর রা. আবু সুলায়মান খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে নির্বাচন করেন, যাঁর পতাকা কখনো নিচু হয়নি।[১৫১] এর মাধ্যমে ব্যক্তিনির্বাচনেও তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পায়। আর বুজাখার যুদ্ধের পর খালিদকে লেখা আবু বকরের চিঠিতে বেশকিছু উপদেশ ছিল। যেমন :

---

[১৫০] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৩২৩।

[১৫১] *আত-তারিখুল ইসলামি*, হুমায়দি : ৯/৬০-৬৩।

- খালিদ রা.-কে দুআ দেন এবং তাঁর উচ্চপ্রশংসা করেন।
- চিঠিতে তাঁকে তাকওয়া অবলম্বনের পরামর্শ দেন, যা মানুষকে তার প্রবৃত্তিগত ভুলত্রুটি থেকে নিরাপদ রাখার সবচেয়ে কার্যকারী মাধ্যম।
- তাঁকে অহংকারে স্ফীত শত্রুর বিরুদ্ধে বাহাদুরি ও বীরত্ব প্রদর্শনের নির্দেশ দেন।

আবু বকরের এই যে কঠিন অবস্থান, এটা তাঁর দৃঢ় সংকল্প ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। কারণ, সেখানে তখন এমন বহু গোত্র ছিল, যারা হক-বাতিল তথা ইমান ও কুফরের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। তাই অবস্থার চাহিদা ছিল, তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে বাকিদের অন্তর থেকে সংশয় দূর করা এবং কুফর থেকে বিরত রাখা। এই পদক্ষেপ তাঁর সীমাহীন শক্তি, সংকল্পের দৃঢ়তা এবং দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণের অনন্য উপমা। স্বভাবত নম্র হলেও কঠোরতার জায়গায় কঠোরতা এবং নম্রতার জায়গায় নম্রতা অবলম্বনে তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ। কবি কতই-না উত্তম বলেছেন,

শবনমকে তরবারির জায়গায় রাখা ভুল
যেভাবে ভুল তরবারিকে শবনমের জায়গায় রাখা।[১৫২]

ছয়. আদি ইবনু আবি হাতিমের প্রচেষ্টা

১. আদি কর্তৃক নিজের গোত্রকে উপদেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

আদি ইবনু আবি হাতিম রা. তাঁর গোত্রে পৌঁছে ইসলামের প্রতি তাদের আহ্বান জানান। তারা প্রথমে ঔদ্ধত্যের সুরে জবাব দেয়, 'আমরা আবু ফুসাইলের হাতে বায়আত হব না।' জবাবে আদি বলেন, 'তোমাদের কাছে এমন এক জাতি এসে পৌঁছেছে, যারা তোমাদের নারীদের নিজেদের জন্য হালাল করে নেবে। এরপর তোমরা তাঁকে আবু ফাহাল উপনামে ডাকতে বাধ্য হবে। এবার তোমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারো কী করবে।' গোত্রের লোকজন তখন তাঁকে বলে, 'তাহলে তুমি তাদের কয়েকটা দিন থামিয়ে রাখো, যাতে আমাদের যে-সকল যুবক ইতিমধ্যে তুলায়হার কাছে বুজাখায় চলে গেছে, তাদের ফিরিয়ে আনতে পারি। আমরা যদি এখনই তুলায়হার বিরুদ্ধে চলে যাই, তাহলে তার কাছে থাকা আমাদের যুবকদের সে হত্যা করবে; অথবা পণবন্দি করে নিতে পারে।'

এরপর আদি রা. সুনাহ নামক স্থানে খালিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছে আবেদন জানান, 'অনুগ্রহ করে আপনি এখানে তিন দিন অপেক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে ৫০০ যোদ্ধা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদের সঙ্গে নিয়ে আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে

---

[১৫২] প্রাগুক্ত : ৯/৬৪-৬৫।

পারবেন। এখনই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাদের জাহান্নামি বানানো থেকে এটা উত্তম হবে বলে মনে করি।' খালিদ তাঁর কথা মেনে নেন। এরপর আদি তাদের ইসলামগ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে খালিদের কাছে পৌঁছান।[১৫৩]

এভাবে আদি তাঁর গোত্রের উভয় শাখা তথা বনু গাওস ও জাদিলা থেকে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা আদায় করেন যে, তারা তুলায়হার সঙ্গ ত্যাগ করে খালিদের দলে যোগ দেবে। বনু তাইয়ের এই প্রত্যাবর্তন ও বিপ্লব বুজাখাযুদ্ধের ফলাফলে ব্যাপক অবদান রেখেছিল।

যখন মুসলিমদের জন্য সম্পদের প্রয়োজন ছিল অন্য সময়ের চেয়ে বেশি, ঠিক তখন আবু বকরের কাছে সর্বাগ্রে নিজ গোত্রের জাকাত নিয়ে উপস্থিত হওয়াটা ইতিহাসের পাতায় আদির মহান মর্যাদা ও কৃতিত্ব হিসেবে অক্ষয় হয়ে থাকবে। ইসলামগ্রহণের প্রথম দিন থেকেই তাঁর মধ্যে একজন বুদ্ধিদীপ্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি ছিল। তিনি অন্তহীন সংযম ও সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম ও মুসলিমদের বিজয়ের ব্যাপারে তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল পাথরের মতো। নবিজি যে দিন তাঁকে ইসলামে দীক্ষিত করেছিলেন, সে দিনই তাঁকে ইসলামের বিশাল বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। বনু আদির ইসলামে ফেরার নেপথ্যে তাঁর ইমানের দৃঢ়তারও একটা প্রভাব ছিল। তাঁর অল্পে তুষ্টি, সাবধানতা ও ধৈর্যের কোনো তুলনা ছিল না। তিনি নিজের গোত্রকে দ্বিধাগ্রস্ত থাকার সুযোগ না দিয়ে তাদের থেকে দেড় হাজার যোদ্ধা নিয়ে মুসলিমবাহিনীতে যোগ দেন। এ ঘটনাটা গোত্রে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।[১৫৪]

২. বনু আদির আবেদন ও খালিদের জবাব

এক বর্ণনায় আছে, বনু আদি খালিদের কাছে তাদের বংশীয় সহযোগী বনু আসাদের বিপরীতে বনু কায়েসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিল। উত্তরে খালিদ বলেন, 'উভয় গোত্রের যার বিরুদ্ধে ইচ্ছা যুদ্ধ করতে পারো। তবে বনু কায়েস কিন্তু বনু আসাদ থেকে মোটেও দুর্বল নয়।' তখন আদি বলেন, 'আমার বংশের নিকটজনরাও যদি দীনকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আল্লাহর শপথ, বনু আসাদ একসময় আমাদের সহযোগী ছিল বলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না, এমনটা হতে পারে না।' খালিদ বলেন, 'আদি, ওরা যার সঙ্গেই লড়াই করুক না কেন, তা জিহাদ গণ্য হবে। আপনি গোত্রের বিরোধিতা না করে বরং তারা যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ চালিয়ে যান।'[১৫৫]

---

[১৫৩] প্রাগুক্ত : ৯/৫৭।

[১৫৪] প্রাগুক্ত : ৯/৬১।

[১৫৫] *তারিখুত তাবারি* : ৪/৭৫।

৩. আদির ইমানি শক্তি ও প্রজ্ঞা

এখানে আদির নিজের গোত্রের মতের বিরুদ্ধে যাওয়া মূলত তাঁর ইমানি শক্তি ও প্রজ্ঞার গভীরতার দলিল। বংশ ও রক্তের দিক থেকে অনেক দূরে থাকলেও তিনি মূলত আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে চাচ্ছিলেন। তাঁরাই ছিল তাঁর নিকটাত্মীয় পর্যায়ের। একই সঙ্গে এই ঘটনা থেকে খালিদের সামরিক প্রজ্ঞাও ফুটে ওঠে। তিনি আদিকে বলেছিলেন, 'আপনি আপনার গোত্রের চাহিদার বিরুদ্ধে যাবেন না। জিহাদের ওই ময়দানে তাদের নিয়ে যান, যেখানে গিয়ে তারা লড়াই করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।'[১৫৬]

আদির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি তাঁর গোত্রকে মুসলিমবাহিনীতে যোগ দেওয়ার দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং তাতে সফলতাও অর্জন করেছিলেন। খালিদের বাহিনীতে বনু তাইয়ের যোগ দেওয়া ছিল শত্রুবাহিনীর প্রথম পরাজয়। কারণ, জাজিরাতুল আরবে বনু তাই ছিল ঐতিহ্যবাহী ও শক্তিশালী একটা গোত্র। অন্যান্য গোত্র তাদের খুবই মূল্যায়ন করত। তাদের শক্তিসামর্থ্য ছিল উল্লেখযোগ্য। ফলে অন্য গোত্রগুলো তাদের সমীহ করত। এলাকায় তাদের প্রভাব ও সম্মান ছিল সবার ওপরে। প্রতিবেশী গোত্রগুলো তাদের সহযোগী হওয়ায় নিজেদের ধন্য মনে করত।

যখন কুফরের দলে দুর্বলতা আসে, তখন ইমান ও কুফরের বাহিনীতে যুদ্ধ বেঁধে যায়। আল্লাহ ইমানদারদের ভাগ্যে বিজয় ও সাহায্য নির্ধারণ করে দেন। দ্রুত তারা শত্রুদের হত্যা ও বন্দি করা শুরু করেন। এভাবেই শত্রুদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। শুধু তারাই বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়, যারা আনুগত্য গ্রহণ করেছিল কিংবা পালিয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনার পর জাজিরাতুল আরবে মুরতাদরা দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এরপর মুসলিমবাহিনীকে অন্যান্য জায়গায় মুরতাদদের পরাজিত করতে তেমন বেগ পেতে হয়নি।[১৫৭]

সাত. খালিদের মোকাবিলায় তুলায়হার পরাজয়ের কারণ

তুলায়হা আসাদির পরাজয়ের অনেক কারণ রয়েছে। যেমন :

> মুসলিমরা অটল আকিদা, আল্লাহর সাহায্যের দৃঢ় বিশ্বাস এবং শাহাদাতের প্রবল আগ্রহ নিয়ে জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের প্রেরণা একটা অব্যর্থ ও তীক্ষ্ণ মানসিক অস্ত্র। খালিদ রা. শত্রুদের কাছে এই সংক্ষিপ্ত বার্তা পাঠাতেন, 'আমি তোমাদের কাছে এমন এক বাহিনী নিয়ে এসেছি, যাদের কাছে শাহাদাত এতটাই কাম্য, তোমাদের কাছে বেঁচে থাকা যতটা কাম্য।'[১৫৮] মুসলিমদের

---

[১৫৬] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/৬১।

[১৫৭] *আল-হারবুন নাফসিয়াহ মিন মানজুরিল ইসলামি*, ড. আহমাদ নাওফাল : ২/১৪৩-১৪৪।

[১৫৮] *হারকাতুর রিদ্দাহ* : ২৮৯।

বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে শত্রুদেরও এই অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বুজাখার মাঠে তুলায়হা পরাজয়ের পর বিস্ময়ের সঙ্গে তার অনুসারীদের বলে, 'তোমাদের কী হলো! তোমরা পরাজিত হলে কেন।' তখন তাদের একজন বলে, 'এর কারণ হচ্ছে, আমাদের প্রত্যেকেই চেয়েছিল সে যেন তার সাথির পরে নিহত হয়; আর বিরোধী পক্ষের প্রত্যেকে চেয়েছিল, সে যেন তার সাথির আগে শহিদ হয়।'[১৫৯]

মুসলিমদের দলে বনু তাইয়ের অংশগ্রহণ তাঁদের শক্তিমত্তা বৃদ্ধি এবং শত্রুদের দুর্বলতার অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। একইভাবে উক্কাশা ইবনু মিহসান ও সাবিত ইবনু আকরামের শাহাদাত মুসলিমদের ক্ষোভের আগুন তীব্র করে তোলে। ফলে যুদ্ধের জন্য তাঁরা প্রস্তুত হয়ে যান। অনুরূপ আবু বকরের 'তাওরিয়া'ও (গোপনীয়তা) বনু তাইয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে তারা সহযোগীদের সঙ্গ ছাড়তে এবং নিজ অবস্থানে অটল থাকতে উৎসাহী হয়ে ওঠে। আবু বকর রা. অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মানুষকে এই ধন্দে ফেলে রাখেন যে, এই বাহিনী মূল রণক্ষেত্র এড়িয়ে খায়বারের দিকে যাচ্ছে।

অনুরূপ বনু তাইকে তাদের চাহিদামতো বনু কায়েসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের প্রভাবও ছিল অত্যন্ত গভীর। খালিদ রা. যদি আদির চাহিদামতো বনু কায়েসের পরিবর্তে বনু আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাদের বাধ্য করতেন, তাহলে বনু তাই হয়তো যুদ্ধের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রদর্শন করত।[১৬০] এ ছাড়া আরও কিছু কারণ ছিল।

আট. বুজাখাযুদ্ধের ফল

নবুওয়াতের এক মিথ্যা দাবিদারের ক্ষমতা গুঁড়িয়ে দেওয়া হলে আরবের বড় একটা অংশ পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে। বুজাখার পরাজয়ের পর বনু আমির এই বলে তাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসে, 'আমরা যেখান থেকে বেরিয়েছিলাম, সেখানে ঢুকে যাচ্ছি।' খালিদ রা. তাদের থেকে সেই শর্তে ইসলামের বায়আত নেন, যে শর্তে ইতিপূর্বে বুজাখাবাসীসহ বনু আসাদ, গাতফান ও তাই থেকে বায়আত নিয়েছিলেন। তিনি ইসলামের নামে নিজের হাত তাদের ওপর রেখে দেন।

নয়. ইরতিদাদি ফিতনার কুশীলবদের করুণ পরিণতি

খালিদ রা. আসাদ, গাতফান, হাওয়াজিন, সালিম ও তাই গোত্রের ওপর এই শর্ত

---

১৫৯ *তারিখুল খামসিন*, দিয়ার বিকরি : ২/২০৭; *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৮৯।

১৬০ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.*, শিত খাত্তাব : ৯৬-৯৭; *হুরুবুর রিদ্দাহ*, আহমাদ সায়িদ : ১২৪।

চাপিয়ে দেন যে, সেই লোকদের উপস্থিত করতে হবে, যারা ইরতিদাদি ফিতনা চলাকালে মুসলিমদের আগুনে ঠেলে দিয়েছিল। তাঁদের অঙ্গ বিকৃত করে অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছিল। তারা ওদের তাঁর সামনে নিয়ে এলে তিনি অপরাধের ভিত্তিতে ওদের কাউকে আগুনে ঠেলে দেন, কাউকে পাথর দ্বারা থ্যাঁতলে দেন, কাউকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেন। অনেককে কূপে উপুড় করে ঝুলিয়ে রাখেন। কতিপয় পাপিষ্ঠকে তির মেরে হত্যা করেন। বাকরা ইবনু হুবায়রাসহ কিছু বন্দিকে মদিনায় খলিফার কাছে পাঠিয়ে দেন।

এ ছাড়া আবু বকরের কাছে এই মর্মে চিঠি পাঠান যে, 'বনু আমির ইসলাম থেকে ফিরে যাওয়ার পর পুনরায় ইসলামে চলে এসেছে। যারা আমার মোকাবিলায় যুদ্ধ করেছে কিংবা আমার কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, আমি এই শর্ত ছাড়া তাদের বায়আত নিইনি যে, তারা সে-সকল লোককে আমার কাছে অর্পণ করবে, যারা মুসলিমদের ওপর নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিল। এ পর্যায়ে আমি বাকরা ও তার সাথিদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'[১৬১]

দশ. বুজাখাযুদ্ধে বন্দিদের সঙ্গে খালিদের আচরণ

বন্দিদের একজন ছিল উয়াইনা ইবনু হিসন। খালিদ রা. উচিত শিক্ষা দিতে তাকে শক্ত করে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মদিনায় প্রবেশের সময় তার উভয় হাত ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধা ছিল। তার সঙ্গে এমন আচরণের উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তার পরিণতি দেখে অন্য অপরাধীরা শিক্ষা নেয়। সে ওই অবস্থায় মদিনায় প্রবেশ করছিল; আর মদিনার শিশু-কিশোররা তাকে নিয়ে উপহাসে মেতে উঠছিল। তারা এই বলে কচি হাত দ্বারা তাকে ঘুসি মারছিল, 'আল্লাহর দুশমন, তুই ইসলাম থেকে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলি।' সে বলছিল, 'আমি তো আদতে ঈমানই আনিনি!'

এরপর তাকে আবু বকরের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তার সঙ্গে এমন ক্ষমাসুলভ আচরণ করেন, যা সে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। আবু বকর তার হাত খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। তাকে তাওবা করান। উয়াইনা তখন নিষ্ঠ চিত্তে তাওবা করে এবং নিজের ভুল স্বীকারপূর্বক ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ইসলামগ্রহণ করে। এরপর আজীবন ইসলামে অটল থাকে।[১৬২]

অপরদিকে তুলায়হা পালিয়ে বনু কালবের আশ্রয়ে চলে যায়। আবু বকরের ইনতিকাল

---

১৬১ *তারিখুত তাবারি* : ৪/৮২।

১৬২ *আস-সিদ্দিক আওয়ালুল খুলাফা* : ৮৭।

পর্যন্ত সে ওখানেই থাকে। এরপর বনু আসাদ, গাতফান ও আমিরের ইসলামগ্রহণের কথা জানতে পেরে সে-ও মুসলমান হয়। আবু বকরের খিলাফতকালেই সে উমরা পালন করতে মক্কার দিকে রওনা হয়। সে যখন মদিনার কাছাকাছি চলে আসে, তখন লোকজন আবু বকরকে তার সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বলেন, 'আমি কী করতে পারি? তাকে ছেড়ে দাও; আল্লাহ তাকে ইসলামের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন।'[১৬৩]

ইবনু কাসির রাহ. উল্লেখ করেছেন, এর পর তুলায়হা ইসলামের দিকে ফিরে আসে এবং সিদ্দিকে আকবরের শাসনামলেই মক্কায় উমরার উদ্দেশ্যে গমন করে। তবে লজ্জায় সে আবু বকরের সঙ্গে তাঁর জীবদ্দশায় সাক্ষাৎ করেনি।

এগারো. আবু বকরের সাবধানতা

একসময় যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল, আবু বকর রা. ইরাক ও শামের বিজয়াভিযানসমূহে তাদের অংশগ্রহণের অধিকার দেননি। এটি ছিল উম্মাহর কল্যাণে তাঁর সাবধানতা। কারণ, তাদের ওপর আস্থা রাখা ছিল ঝুঁকির ব্যাপার। হতে পারে, তাদের আনুগত্য ছিল কেবল মুসলিমদের শক্তির ভয়ে। কারণ, আবু বকর ছিলেন মানুষের কল্যাণের পথনির্মাতা। মানুষ তাঁর কথা ও কাজের আনুগত্য করত। তাই যদিও এর ফলে কিছুসংখ্যক মানুষের মর্যাদাহানি হচ্ছিল, তবু উম্মাহর সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই তিনি এ ক্ষেত্রে উদারতার চেয়ে সাবধানতার ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দেন। উম্মাহ এ থেকে এক বিরাট শিক্ষা নিতে পারে। অর্থাৎ, এমনসব মানুষের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখা যাবে না, যারা অতীতে ধর্মদ্রোহিতায় লিপ্ত ছিল; কিন্তু পরে দীনের বৃত্তে ঢুকে পড়েছে।

এমন মানুষের ওপর নিবিড় আস্থা রাখা, উদারতা দেখানো এবং তাদের হাতে নেতৃত্বভার দেওয়ার কারণে উম্মাহকে যুগে যুগে বড় ধরনের দুর্যোগময় পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। তবে সাবধানতা অবলম্বনের অর্থ এই নয় যে, আদতেই তাদের বিশ্বাসযোগ্য মনে করা হবে না। কিন্তু এ ধরনের মানুষের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে সিদ্দিকি আদর্শ হচ্ছে শ্রেয়।[১৬৪]

বারো. তুলায়হার ইসলামগ্রহণ

তুলায়হা ইসলামগ্রহণ করেছিল। এরপর উমর রা. খলিফা মনোনীত হলে সে তাঁর হাতে বায়আতের জন্য মদিনায় উপস্থিত হয়। উমর বলেন, 'তুমি তো উক্কাশা ইবনু

---

[১৬৩] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/৫৯।

[১৬৪] প্রাগুক্ত : ৯/৬৮।

মিহসান ও সাবিত ইবনু আকরামের হত্যাকারী। আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে কখনো পছন্দ করতে পারি না।' তুলায়হা বলে, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনি আমাকে এমন দুই ব্যক্তির নামে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন, আল্লাহ আমার হাতে যাঁদের বিশাল মর্যাদা দান করেছেন। তাঁদের তিনি লজ্জিত ও অপমানিত করেননি।' এ কথা শুনে উমর রা. তার বায়আত নেন। এরপর বলেন, 'হে প্রতারিত ব্যক্তি, তোমার জ্যোতিষবাদের কিছু কি বাকি রয়েছে?' তুলায়হা বলে, 'কামারের চুলার একটা অথবা দুটো ফুঁক!'

এরপর তুলায়হা তাঁর গোত্রের কাছে চলে যান। সেখানে কিছুদিন বসবাসের পর ইরাক গিয়ে স্থায়ী হন।[১৬৫] তাঁর ইসলামগ্রহণ ছিল অন্তর থেকে। এ ক্ষেত্রে তাঁকে সমালোচনায় বিদ্ধ করা যাবে না। তুলায়হা তাঁর দুর্বলতার ওপর লজ্জিত ও মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন,

উক্কাশা ও সাবিত; এরপর মাবাদের
মৃত্যুর ওপর আমি বড়ই লজ্জিত।
উভয়কে হত্যার চেয়ে আমার বড় অপরাধ ছিল
স্বেচ্ছায় জেনেবুঝে ইসলাম থেকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া।
বিপদ অনেকই গেছে, এর মধ্যে ছিল দেশান্তরিত হওয়া
আমি তো বরাবরই দেশান্তরী জীবন কাটিয়েছি।
সিদ্দিক কি আমার ফিরে আসাকে গ্রহণ করে নেবেন?
তিনি কি বায়আতের জন্য তাঁর হাতটি আমার দিকে মেলে ধরবেন?
ভ্রান্তির পর আমি কালিমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্য দিচ্ছি
এই সাক্ষ্যে আমি নিশ্চিত যে, আমি মুলহিদ নই।
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মানুষের রবই আমার রব
আমি লাঞ্ছিত আর মুহাম্মাদের দীনই সঠিক।[১৬৬]

---

[১৬৫] প্রাগুক্ত : ৯/৫৯; *তারিখুত তাবারি* : ৪/৮১।

[১৬৬] *দিওয়ানুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ৮৬।

পঞ্চম অধ্যায়

ভণ্ড নবি দাবিদারদের দমনে খালিদের অভিযান ও উম্মু তামিমের সঙ্গে তাঁর বিয়ে

এক. সাজাহ, বনু তামিম ও মালিক ইবনু নুবায়রার হত্যা

ইরতিদাদি ফিতনার সময় বনু তামিম ছিল শতধাবিভক্ত। তাদের কিছুসংখ্যক মুরতাদ হয়ে নিজেদের জাকাত আটকে দেয়। কিছুসংখ্যক তাঁদের জাকাত আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আর কেউ কেউ এ নিয়ে দ্বিধা ও সংশয়ে ভুগতে থাকে। ইতিমধ্যে তাদের কাছে সাজাহ বিনতু হারিস ইবনু সুওয়াইদ ইবনু উকফানের আগমন ঘটে। সে ছিল বনু তাগলিব বংশোদ্ভূত এবং ধর্মবিশ্বাসে খ্রিষ্টান। লোকটা নবুওয়াতের দাবি করে বসে। তার সঙ্গে ছিল গোত্র ও সহকারীদের বড় এক বাহিনী। তারা আবু বকরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকার করেছিল। এ লক্ষ্যে তারা বনু তামিমের বস্তি অতিক্রমকালে তাদের সঙ্গ দেওয়ার আহ্বান জানালে অধিকাংশ তামিমি তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তাদের মধ্যে মালিক ইবনু নুবায়রা তামিমি, উতারিদ ইবনু হাজিবসহ বনু তামিমের সরদারদের বড় একটা দল ছিল; আর কিছুসংখ্যক এ থেকে দূরে থাকে। তবে উভয় দল পরস্পর যুদ্ধে না জড়াতে সমঝোতা করে নিয়েছিল।

মালিক ইবনু নুবায়রা সাজাহের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পর এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ফেলে। সে সাজাহকে বনু ইয়ারবুর বিরুদ্ধে উসকে দিলে তারা পারস্পরিক যুদ্ধের জন্য তেতে ওঠে; কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায়—কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে! তখন সাজাহ ছন্দোবদ্ধ বাক্যে বলে ওঠে,

اعدوا الركاب، واستعدوا النهاب، ثم اغيروا على الرباب، فليس دونها حجاب

বাহন প্রস্তুত করো। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। এরপর রুবাবের ওপর আক্রমণ চালাও;[১৬৭] ওদের মধ্যে কোনো বাধা নেই।

---

[১৬৭] রুবাব হচ্ছে বনু তামিমের একটি শাখা।

এরপর বনু তামিম তাকে ইয়ামামার দিকে অভিযানে নিয়ে যেতে সফল হয়, যাতে ইয়ামামাকে মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা যায়; কিন্তু তার জাতি মুসায়লিমার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়ে। তারা তার প্রতিপত্তি দেখে ঘাবড়ে যায়। কারণ, সে ততদিনে তার শক্তি সংহত করে তুলেছিল। তখন সাজাহ বলে ওঠে,

عليكم باليمامة، دفوا دفيف الحمامة، فانها غزوة صرامة، لا تلحقكم بعدها ملامة.

ইয়ামামার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। কবুতরের মতো উড়াল দাও। এটা শত্রুকে কেটে রাখার যুদ্ধ, এরপর তোমরা কোনোভাবে সমালোচিত হবে না।

সাজাহের নির্দেশ পেয়ে তামিমিরা মুসায়লিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মুসায়লিমা সংবাদটা শুনে ভীত হয়ে পড়ে। কারণ, সে তখন সুমামা ইবনু উসালের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এদিকে ইকরিমাও সুমামার সহায়তায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া খালিদ ইবনুল ওয়ালিদও ধেয়ে আসছিলেন। মুসায়লিমা এ পরিস্থিতিতে সাজাহের কাছে দূত পাঠিয়ে নিরাপত্তা চায়। তাকে ওয়াদা দেয়—'আমি সফল হতে পারলে কুরাইশের অর্ধেক ভূখণ্ড তোমাকে দেবো।' এ ছাড়া সাজাহকে লিখে জানায়, সে তার গোত্রের কিছুসংখ্যক লোকসহ তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। সাজাহ এতে সম্মতি প্রকাশ করলে মুসায়লিমা ৪০ জন সাথি নিয়ে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। উভয় ভণ্ড একটা তাঁবুতে মিলিত হয় এবং একান্তে আলোচনা করে। মুসায়লিমা তাকে বিজিত ভূখণ্ডের অর্ধেক দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলে সাজাহ তা মেনে নেয়। মুসায়লিমা বলে, 'আল্লাহ শ্রবণকারীর কথাই শ্রবণ করেন। যখন সে লোভ করে, তখন কল্যাণ প্রদান করা হয়। এখন পর্যন্ত যা কিছু হচ্ছে, সবকিছু ঠিকমতো হচ্ছে।'

সাজাহ বলে, 'তুমি আমাকে বিয়ে করতে সম্মত হবে? যদি সম্মত হও, তাহলে উভয়ে স্ব স্ব গোত্র সঙ্গে নিয়ে আরবদের গিলে ফেলতাম।' মুসায়লিমা জবাবে বলে, 'আমি রাজি।' লোকজন যখন সাজাহকে জিজ্ঞেস করে, 'মুসায়লিমা তোমাকে কী মোহর দিলো?' সাজাহ বলে, 'না তো, কোনো মোহর দেয়নি।' লোকজন বলে, 'তোমার মতো একজন নারী মোহর ছাড়া বিয়েতে বসতে পারে?' সাজাহ তখন মোহরের দাবি জানিয়ে মুসায়লিমার কাছে লোক পাঠালে সে উত্তরে বলে, 'তুমি তোমার ঘোষককে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।' সাজাহ তার ঘোষক শাবত ইবনু রিবয়ি আর-রিয়াহিকে তার কাছে পাঠালে সে তাকে বলে, 'যাও, তোমার জাতির কাছে গিয়ে এই ঘোষণা দাও যে, আল্লাহর রাসুল মুসায়লিমা তোমাদের ওপর থেকে ফজর ও ইশার দুই ওয়াক্ত সালাত—যা মুহাম্মাদ তোমাদের ওপর জরুরি করেছিলেন—রহিত করিয়ে দিয়েছেন। আর এটাই হচ্ছে সাজাহের মোহর!'

পরে খালিদ রা. ইয়ামামার নিকটবর্তী হলে সাজাহ মুসায়লিমার কাছ থেকে ভূমির অর্ধেক কর সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে বনু তাগলিবের কাছে চলে আসে। এর অনেক দিন পর 'আমুল জামাআহ'য় মুআবিয়া রা. খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে বনু তাগলিবকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেন।[১৬৮]

১. বুতাহের পথে খালিদের যাত্রা এবং আনসারদের অসম্মতি

সাজাহ জাজিরা থেকে আরবে এসে পৌঁছালে মালিক ইবনু নুবায়রা তার সঙ্গ দিয়েছিল। সে তাকে মুসায়লিমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানি দিয়ে ইয়ামামার দিকে নিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু সাজাহ কোথায় তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; বরং তার সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে ইবনু নুবায়রা নিজের ব্যর্থতার ওপর চরমভাবে লজ্জিত হয়। এতে সে সন্দেহে পড়ে যায় এবং বুতাহে[১৬৯] বসবাস করতে থাকে। খবর পেয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে বুতাহের দিকে যাত্রা করলে আনসাররা এই বলে পেছনে থেকে যান যে, 'আবু বকর আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমরা তা আদায় করে নিয়েছি।' খালিদ বলেন, 'এটাও করা আবশ্যক এবং এখনই উপযুক্ত সময়। এই সুযোগকে গনিমত মনে করা জরুরি। যদিও এ ব্যাপারে খলিফাতুর রাসুলের কোনো চিঠি এসে পৌঁছায়নি; কিন্তু আমি তো দলের আমির। আর ভালোমন্দের খবর তো আমার কাছেই এসে পৌঁছায়। আমি তোমাদের বাধ্য করতে পারি না, তবে আমি বুতাহের দিকে এগিয়ে চললাম।'

তিনি চলে যাওয়ার দু-দিন পর আনসারদের পক্ষ থেকে একব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'অনুগ্রহপূর্বক আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আনসাররাও আপনার সঙ্গ দিতে চলে আসছেন।' খানিক পর তাঁরা এসে গেলে খালিদ রা. সবাইকে নিয়ে বুতাহ পৌঁছান।

২. মালিক ইবনু নুবায়রার হত্যা

মালিক ইবনু নুবায়রা তখন বুতাহে অবস্থান করছিল। খালিদ রা. সেখানে পৌঁছে চতুর্দিকে ছোট ছোট বাহিনী ছড়িয়ে দেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াত দিতে থাকেন। বনু তামিমের লোকজন তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করে। নেতারা তাদের কথা মেনে নিয়ে আনুগত্যের ঘোষণা জানিয়ে দেয়; কিন্তু মালিক ইবনু নুবায়রা তখনো দ্বিধান্বিত ছিল। সে তার লোকজন থেকে পৃথক হয়ে যায়। একপর্যায়ে মুসলিমবাহিনী তাকে তার সঙ্গী-সাথিসহ বন্দি করে ফেলে। তাকে যে অবস্থায় বন্দি করা হয়েছিল, সে অবস্থার বিবরণে মুসলিমবাহিনীর সদস্যরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। আবু কাতাদা

---

[১৬৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৬।

[১৬৯] এটি নাজদে বনু আসাদের এলাকাধীন একটি কূপের নাম।

বলেন, তারা সালাত পড়ছিল; আর অন্যরা বলেন, তারা আজানও দেয়নি, সালাতও পড়েনি। এক বর্ণনামতে, বন্দিরা শেকলবন্ধ অবস্থায় রাতযাপন করছিল। তখন প্রচণ্ড শীত ছিল। খালিদ রাতে ঘোষণা দেন, 'কয়েদিদের তাপ দাও।' মানুষ তাঁর এ কথার ভুল মর্ম বুঝে নেয়। তারা মনে করে, তিনি তাদের হত্যার নির্দেশ দিচ্ছেন। সুতরাং তারা সকল বন্দিকে হত্যা করে ফেলে। জিরার ইবনুল আজওয়ার নিজে মালিক ইবনু নুবায়রাকে হত্যা করেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ শোরগোল শুনে যখন তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন, ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সবাই মারা গেছে। খালিদ তখন বলেন, 'আল্লাহ যা করার ইচ্ছা করেন।'

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. মালিক ইবনু নুবায়রাকে ডেকে পাঠান। তাকে সাজাহের সঙ্গদান এবং জাকাত আটকে রাখার ব্যাপারে খুব করে শাসিয়ে বলেন, 'তুমি কি জানো না সালাত ও জাকাতের বিধান একই?' মালিক উত্তরে বলে, 'তোমাদের নবির ধারণামতে তো তা-ই।' খালিদ বলেন, 'তিনি কি কেবল আমাদের নবি, তোমার নবি নন?' এরপর জিরার রা.-কে ডেকে বলেন, 'জিরার, ওর গর্দান উড়িয়ে দাও।'

৩. খালিদের বিরুদ্ধে খলিফার কাছে নালিশ

আবু কাতাদা রা. এই হত্যাকাণ্ডের বিষয় নিয়ে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন। পরে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে আবু বকরের কাছে চলে যান এবং তাঁকে বিষয়টা খুলে বলেন। এ সময় উমর রা.-ও খালিদের বিরুদ্ধে আবু কাতাদার পক্ষ হয়ে আবু বকরের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, 'আপনি খালিদকে অপসারণ করুন, তার তরবারি থেকে অন্যায় রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।' উত্তরে আবু বকর বলেন, 'আল্লাহ যে তরবারি কাফিরদের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, আমি সেই তরবারি কোষবন্ধ করতে পারি না।' মুতাম্মিম ইবনু নুবায়রাও এই অভিযোগ নিয়ে তাঁর কাছে যান। উমর তাঁকেও এ ব্যাপারে সহায়তা করেন। মুতাম্মিম আবু বকরকে মালিকের যে শোকগাথা শুনিয়েছিলেন, এটা শুনে তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার রক্তপণ আদায় করেন।[১৭০]

৪. খালিদ কর্তৃক ইবনু নুবায়রার হত্যাকাণ্ড নিয়ে ইতিহাসবিদদের মত

ইবনু নুবায়রা হত্যার উপযুক্ত ছিল, নাকি তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, এ ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. আলি আতুম তাঁর *আল-হারকাতুর রিদ্দাহ* এবং শায়খ মুহাম্মাদ তাহির ইবনু আশুর তাঁর *নাকদুন ইলমিয়ুন আলা কিতাবিল ইসলামি*

---

১৭০ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৭।

ওয়া উসুলিল হুকমি গ্রন্থে এই কাহিনি আলোচনায় নিয়ে এসেছেন।[১৭১] অনুরূপ জাহিদ কাওসারি তাঁর *মাকালাতুল কাওসারি* গ্রন্থে খালিদের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেছেন।[১৭২]

এ ছাড়া অনেকে প্রসঙ্গটা নিয়ে গবেষণা করেছেন; কিন্তু আমি এ ব্যাপারে ড. আলি আতুমের গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। কেননা, এ বিষয়ে তিনি বিরল ইলমি গবেষণার স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি ইরতিদাদের বিষয়টাকে যে পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, আমার জানামতে সমকালের আলিমদের মধ্যে এর কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

ড. আতুম ওই হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে গবেষণা-পর্যালোচনার পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আমি এর সঙ্গে পুরোপুরি একমত। মালিক ইবনু নুবায়রাকে যে জিনিস ধ্বংস করেছিল, তা ছিল তার অহংকার ও দ্বিধা। তার ভেতরে জাহিলিয়াতের গোঁয়ারতুমি রয়ে গিয়েছিল। নতুবা রাসুলের ইনতিকালের পর আবু বকরের হাতে খিলাফতের বায়আতগ্রহণ এবং জাকাত আদায়ে ইতস্তত করত না। আমার ধারণা, সে প্রচণ্ড ক্ষমতালিপ্সু ছিল। পাশাপাশি তামিমি মুসলিম সরদারদের ব্যাপারে তার অন্তরে হিংসা ও সন্দেহ ছিল। ইবনু নুবায়রার কথা ও কাজ এই সত্যেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তার মুরতাদ হওয়া, সাজাহকে সঙ্গদান, জাকাতের উট নিজেদের লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া, আবু বকরের কাছে জাকাতপ্রদানে বাধা দেওয়া, অহংকার ও অবাধ্যতার বশে মুসলিমদের উপদেশকে অবমূল্যায়ন—এসব বিষয় তাকে অপরাধীই প্রমাণিত করে। এর মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সে ইমানের চেয়ে কুফরের নিকটবর্তী ছিল।

মালিক ইবনু নুবায়রার বিরুদ্ধে যদি শক্তিশালী কোনো দলিল না-ও থাকে, তথাপি জাকাত আটকে রাখার অপরাধই তার এ শাস্তির জন্য যথেষ্ট ছিল। শীর্ষস্থানীয় ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত সত্য হচ্ছে, সে জাকাত আদায়ে অস্বীকার করেছিল। ইবনু আবদিস সালামের *তাবাকাতু ফুহুলিশ শুআরা* গ্রন্থে আছে, 'এটা সর্বসম্মত বাস্তবতা যে, খালিদ তার সঙ্গে কথা বলেছেন, তাকে তার অবস্থান থেকে ফেরানোর চেষ্টা করেছেন; কিন্তু মালিক সালাত স্বীকার করলেও জাকাত প্রদানে অস্বীকার করে।'[১৭৩] আর *মুসলিম শরিফের* ব্যাখ্যাগ্রন্থে আল্লামা নববি রাহ. মুরতাদদের ব্যাপারে বলেন, 'এর মধ্যে তারাও গণ্য ছিল, যারা জাকাত স্বীকার করত এবং তা আটকেও রাখেনি। তবে তাদের নেতারা জাকাত তাদের দিতে আটকে রেখেছিল।' যেমন : বনু ইয়ারবু; তারা তাদের জাকাত একত্রিত করে আবু বকরের কাছে পৌঁছাতে চাইলে মালিক ইবনু নুবায়রা তাদের আটকে রাখে। সে ওই জাকাত লোকদের বণ্টন করে দিয়েছিল।[১৭৪]

---

১৭১ *নাকদুন ইলমিয়ুন আলা কিতাবিল ইসলামি ওয়া উসুলিল হুকমি* : ৩৩।

১৭২ *মাকালাতুল কাওসারি* : ৩১২; জাহাবির *আল-খুলাফাউর রাশিদুন* : ৩৬ থেকে উদ্ধৃত।

১৭৩ *তাবাকাতু ফুহুলিশ শুআরা*, তাহকিক মাহমুদ শাকির : ১৭২।

১৭৪ *শারহুন নাবাবি আলা সাহিহিল মুসলিম* : ১/২০৩।

৫. খলিফা কর্তৃক খালিদের দায়মুক্তির ঘোষণা

খালিদের বাহিনীর কয়েকজন সদস্যের ভাষ্য ছিল, 'মুসলিমদের আজান শুনতে পেয়ে মালিক ইবনু নুবায়রার লোকজনও আজান দেয়।' এভাবেই তারা নিজেদের রক্ত নিরাপদ করে নেয়। এই দলে আবু কাতাদার মতো মহান ব্যক্তিও ছিলেন। তাঁর কাছে বিষয়টা অত্যন্ত বড় মনে হচ্ছিল। এরপর যখন দেখতে পান, খালিদ রা. মালিক ইবনু নুবায়রার স্ত্রীকে বিয়ে করে নিয়েছেন, তখন তাঁর এই মানসিকতা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। তিনি খালিদের সঙ্গ ত্যাগ করে অভিযোগ নিয়ে খলিফার কাছে চলে যান; কিন্তু আবু বকর রা. আবু কাতাদার এ অবস্থানকে মোটেও সমর্থন করেননি।

খালিদ ছিলেন তাঁর আমির, তিনি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন; অথচ সঙ্গত্যাগের জন্য তিনি খালিদের পক্ষ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত ছিলেন না। তাঁর এই পদক্ষেপ মুসলিমদের জন্য ক্ষতির কারণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই খলিফা আবু কাতাদার সঙ্গে কঠোর আচরণ করেন। তাঁকে তৎক্ষণাৎ খালিদের কাছে পাঠিয়ে দেন। পুনরায় খালিদের পতাকাতলে যোগ দিতে বাধ্য করেন। এ ছাড়া ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তিনি রাজি হননি।[১৭৫] আবু বকরের এ সিদ্ধান্ত ছিল ইসলামি যুদ্ধের জন্য আদর্শিক একটা সিদ্ধান্ত।

আবু বকর রা. মালিক ইবনু নুবায়রার হত্যা-সংক্রান্ত ঘটনার ব্যাপারে পূর্ণ অনুসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, রটানো অপবাদ থেকে খালিদ সম্পূর্ণ মুক্ত।[১৭৬] ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে আবু বকরই অন্যদের থেকে বেশি অবহিত হওয়ার কথা। কারণ, তিনি ছিলেন খলিফা। ইতি-নেতিবাচক সব খবরই তাঁর কাছে বেশি পৌঁছাত। অন্যদের তুলনায় তাঁর ইমানও বেশি মজবুত ছিল। খালিদ রা. এ ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসুলেরই অনুসরণ করেছিলেন। খোদ রাসুল ﷺ তাঁকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। যদিও কয়েকবার তাঁর পক্ষ থেকে এমনকিছু আচরণ প্রকাশ পেয়েছিল, যার ওপর নবিজি সন্তুষ্ট ছিলেন না, তথাপি কখনো তাঁকে পদচ্যুত করেননি। এমন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর ওজর গ্রহণ করে বলতেন, 'খালিদকে কষ্ট দিয়ো না। সে আল্লাহর তরবারিসমূহের একটা তরবারি, যে তরবারি আল্লাহ কাফিরদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।'[১৭৭]

৬. ভারসাম্য রক্ষায় আবু বকরের নম্রতা ও খালিদের কঠোরতা

আবু বকরের শ্রেষ্ঠত্ব তো এখানেই যে, তিনি খালিদের কাঁধে নেতৃত্বের রশি তুলে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে সেবা নিতে পেরেছিলেন। অথচ তাঁর মধ্যে ছিল কঠোরতা; আর

---

[১৭৫] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৩১।

[১৭৬] *আল-খিলাফাতু ওয়াল খুলাফাউর রাশিদুন*, বাহানসাবি : ১১২; *আল-খুলাফাউর রাশিদুন*, নাজ্জার : ৫৮।

[১৭৭] *ফাতহুল বারি* : ৭/১০১।

বিপরীতে আবু বকরের মধ্যে ছিল কোমলতা। তিনি চাচ্ছিলেন তাঁর নম্রতার প্রভাবে খালিদের কঠোরতার মধ্যে একপ্রকার ভারসাম্য আসুক। স্রেফ কঠোরতা কিংবা নম্রতা ধ্বংসাত্মক। এ জন্য আবু বকর উমর থেকে পরামর্শ নিলেও খালিদকে তাঁর পদে বহাল রাখেন। এটাই ছিল পূর্ণতা ও পরিপক্বতা। খলিফাতুর রাসুল এ পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই মুরতাদদের ব্যাপারে খলিফার অবস্থান ছিল উমরের অবস্থানের চেয়ে কঠোর। আল্লাহ তাঁর মধ্যে এমন কঠোরতা দান করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে কখনো তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি; আর উমরের মধ্যে কঠোরতা থাকলেও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই নিহিত ছিল যে, তিনি আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আবু উবায়েদ সাকাফি, নুমান ইবনু মুকাররিন ও সায়িদ ইবনু আমির রা.-দের মতো কোমলপ্রাণ ব্যক্তির সেবা নিয়েছিলেন, যাঁরা পরহেজগারি ও ইবাদত-বন্দেগিতে ছিলেন খালিদ থেকে অনেক অনেক এগিয়ে। এর ফল দাঁড়িয়েছিল, খিলাফতগ্রহণের পর তাঁর মধ্যে এত নম্রতা দেখা যাচ্ছিল, যা ইতিপূর্বে কখনো পরিলক্ষিত হয়নি।[১৭৮]

আল্লামা ইবনু তাইমিয়া এ ব্যাপারে সুন্দর আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, 'আবু বকর ইরতিদাদবিরোধী যুদ্ধসহ ইরাক ও শামের বিজয়াভিযানে খালিদের সেবা নিতে থাকেন। যদিও ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর থেকে মাঝেমধ্যে ভুল হয়ে যেত। অনেকবার তাঁর কাছে এ নিয়ে অভিযোগও করা হয়; কিন্তু তিনি একবারও তাঁকে পদচ্যুত করেননি। শুধু তিরস্কারকে যথেষ্ট মনে করতেন। তাঁকে তো সেনাপতি হিসেবে রাখাই ছিল উম্মাহর জন্য কল্যাণকর। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কেউ ছিলেন না। নিয়ম হচ্ছে, সর্বোচ্চ নেতাদের মধ্যে যদি নম্রতা থাকে, তাহলে সহযোগী হিসেবে কোনো কঠোর ব্যক্তিকে নির্বাচন করা বিধেয়। আর যদি সর্বোচ্চ ব্যক্তির মধ্যে কঠোরতা থাকে, তাহলে তার সহকারী হিসেবে নম্র প্রকৃতির লোক নির্বাচন করা আবশ্যক, যাতে ভারসাম্য রক্ষা পায়। এ জন্যই আবু বকর রা. খালিদের জন্য সহকারী নিয়োগ দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিচ্ছিলেন; আর উমর রা. তাঁকে পদচ্যুত করে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানানোকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। খালিদ ছিলেন উমরের মতো কঠোর প্রকৃতির আর ইবনুল জাররাহ ছিলেন আবু বকরের মতো কোমলপ্রাণ। তাঁরা উভয়ে নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ছিল সম্পূর্ণ সঠিক পদ্ধতি। এভাবেই তাঁদের শাসনকালে ভারসাম্য পূর্ণমাত্রায় বহাল ছিল এবং আদর্শপুরুষ হিসেবে নবিজির সত্যিকার খলিফা হতে পেরেছিলেন তাঁরা।[১৭৯]
রাসুল ﷺ বলেছেন, 'আমি রহমতের নবি, আমি মালহামার (যুদ্ধের) নবি।'[১৮০]

---

১৭৮ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক আফজালুস সাহাবাতি ওয়া আহাক্কুহুম বিল খিলাফাতি* : ১৯৩-১৯৪।
১৭৯ *মাজমুউল ফাতাওয়া* : ২৮/১৪৪।
১৮০ *মুসনাদু আহমাদ* : ৪/৩৯৫-৪০৪-৪০৭।

দুই. উম্মু তামিমের সঙ্গে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বিয়ে

১. উম্মু তামিমের সঙ্গে খালিদের বিয়ে

মালিক ইবনু নুবায়রার স্ত্রী উম্মু তামিমের নাম ছিল লায়লা বিনতু সিনান আল মিনহাল। তার সঙ্গে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের বিয়ের ঘটনা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। কিছু মানুষ নিজেদের কুৎসিত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এ নিয়ে খালিদের প্রতি তীর্যক মন্তব্য করে থাকে, রটিয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ; অথচ বাস্তবতার সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশুদ্ধ ইলমি তাহকিকের সামনে এসব ধোপে টিকবে না।

ঘটনা হচ্ছে, কিছুসংখ্যক মানুষ খালিদের ওপর এই অপবাদ রটিয়ে থাকে যে, উম্মু তামিম বন্দি হওয়ামাত্রই তাকে বিয়ে করে ফেলেন। তিনি নাকি তার সৌন্দর্যে আত্মহারা ছিলেন, তাকে ভালোবাসতেন। তাকে ছাড়া তিনি একমুহূর্তও ধৈর্যধারণ করতে পারেননি। তাদের এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটা বিয়ে ছিল না; বরং এ ছিল একপ্রকার ব্যভিচার (নাউজুবিল্লাহ)। তবে সত্য হচ্ছে, তাদের এ দাবি ও প্রচারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সত্যের সঙ্গে এর দূরতম সম্পর্ক নেই।[১৮১] পুরানো কোনো ঐতিহাসিক উৎসে এ ব্যাপারে সামান্য কোনো ইঙ্গিতও খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল্লামা মাওয়ারদি রাহ. স্পষ্টভাবে লেখেন, খালিদ রা. কর্তৃক মালিক ইবনু নুবায়রাকে হত্যার একমাত্র কারণ ছিল সে জাকাত আটকে রেখেছিল। এ কারণে তার রক্ত হালাল হয়ে গিয়েছিল। একই কারণে উম্মু তামিমের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।[১৮২] মুরতাদদের নারীদের ব্যাপারে শরিয়তের বিধান হচ্ছে, তারা দারুল হারবে গিয়ে মিলিত হলে তাদের শুধু বন্দি করা যাবে, হত্যা করা যাবে না। ইমাম সারাখসি রাহ. এ কথার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।[১৮৩]

উম্মু তামিম বন্দি হলে খালিদ তাকে নিজের জন্য নির্ধারণ করেন। এরপর হালাল হয়ে গেলে তার সঙ্গে সহবাস করেন।[১৮৪] শায়খ আহমাদ শাকির এই ঘটনায় সংযুক্তি করে বলেন, 'খালিদ উম্মু তামিম ও তার ছেলেকে "মিলকে ইয়ামিন"-এর ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিলেন। কেননা, তারা ছিল যুদ্ধবন্দি। এ ধরনের নারীদের কোনো ইদ্দত পালন করতে হয় না। তবে গর্ভবতী হলে প্রসবকাল পর্যন্ত মালিকের জন্য ভোগ করা হারাম। গর্ভবতী না হলে একবার হায়িজ হলেই সে হালাল হয়ে যায়। এরপর তার সঙ্গে সম্ভোগ

---

[১৮১] পাকিস্তানের জেনারেল আকরাম তাঁর *সাইফুল্লাহ হজরত খালিদ রা.* গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্ঠায় লেখেন, 'খালিদ রা. সে রাতেই তাঁকে বিয়ে করেন।'

[১৮২] *আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ*, : ৪৭; *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২২৯।

[১৮৩] *আল-মাবসুত* : ১০/১১১; *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২২৯।

[১৮৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৬।

বৈধ। এ হুকুম শরিয়তসিদ্ধ তথা জায়িজ। এ নিয়ে সমালোচনার কোনো অবকাশ নেই।' কিন্তু খালিদের শত্রুরা সুযোগটাকে তাদের কুৎসিত উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে অস্ত্র হিসেবে নেয়। তাদের ধারণা, মালিক ইবনু নুবায়রা মুসলিম ছিল; খালিদ রা. তার স্ত্রীকে পেতে তাকে হত্যা করেছিলেন।'[১৮৫]

একইভাবে এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, এর মাধ্যমে খালিদ রা. আরবের চিরন্তন ঐতিহ্য ভঙ্গ করেছিলেন। যেমন : আক্কাদ বলেন, 'ইবনু নুবায়রাকে হত্যা করে রণাঙ্গনেই তার সঙ্গে সহবাস ছিল আরবদের জাহিলি ও ইসলামি যুগের ঐতিহ্যের পরিপন্থি। একইভাবে এটা ছিল মুসলিমদের সংস্কৃতি ও শরিয়তের পরিপন্থি।'[১৮৬]

কিন্তু আক্কাদের এ কথায় সত্যের লেশমাত্র নেই। আরবদের কাছে ইসলামপূর্ব যুগে যুদ্ধে শত্রুর ওপর বিজয়ের পর শত্রুর নারীদের বিয়ে করার ব্যাপক নজির রয়েছে। তারা বরং এ নিয়ে গৌরব প্রকাশ করত। অনুরূপ তাদের সমাজে বন্দি নারীদের প্রচুর সন্তান ছিল। হাতিম তাইয়ের ভাষ্য লক্ষ করুন,

তারা সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদের সঙ্গে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেয়নি;
কিন্তু আমরা তরবারির জোরে তাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছি।
তোমরা আমাদের মধ্যে যুদ্ধবন্দি নারীদের প্রচুর সন্তান দেখতে পাবে
তারা বাহাদুরদের মুখোমুখি হলে প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে আঘাত করে।
তারা হাতের বর্শায় গেঁথে পতাকা উঠিয়ে থাকে;
যেগুলো শুরুতে থাকে সাদা, এরপর শত্রুর খুনে লাল হয়ে যায়।[১৮৭]

২. শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে উম্মু তামিমের সঙ্গে খালিদের বিয়ে

শরিয়তের দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যাবে, খালিদ রা. কেবল একটা মুবাহ কাজ করেছেন; শরিয়তের বাইরে যাননি। এমনটা খোদ রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত। তিনি নিজেই গাজওয়ায়ে মুরায়সির পর জুওয়াইরিয়া রা.-কে বিয়ে করেছিলেন এবং সে যুদ্ধ গোত্রের জন্য অত্যন্ত বরকতময় প্রমাণিত হয়েছিল। সে গোত্রের প্রায় শতাধিক মানুষকে মুক্ত করা হয়েছিল। তারা নবিজির শ্বশুরালয়ের সম্পর্কযুক্ত হয়ে গিয়েছিল। সে বিয়ের বরকতেই জুওয়াইরিয়ার পিতা হারিস ইবনু জিরার মুসলমান হন।[১৮৮] একইভাবে নবিজি খায়বারযুদ্ধের পরপরই সাফিয়া বিনতু হুয়াই ইবনু আখতাবের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে

---

[১৮৫] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৩০।

[১৮৬] *আবকারিয়াতুস সিদ্দিক* : ৭০।

[১৮৭] *আল-ইকদুল ফরিদ* : ইবনু আবদি রাব্বিহি : ৭/১২৩।

[১৮৮] *সিরাতু ইবনি হিশাম* : ২/২৯০-২৯৫।

আবদ্ধ এবং খায়বারে অথবা ফেরার পথে বাসর যাপন করেছিলেন।[১৮৯] যেহেতু নবিজি ﷺ থেকেই এ বিষয়টা প্রমাণিত, তাই এর জন্য কোনো প্রকার সমালোচনা থাকতে পারে না। এ অভিযোগ এমনিতেই ফালতু প্রমাণিত হয়ে যায়।[১৯০]

অনুরূপ ড. মুহাম্মাদ হুসাইন হায়কাল খালিদের ওপর থেকে অপবাদ দূর করতে যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তা-ও গ্রহণযোগ্য নয়। ড. হায়কাল তো খালিদের ভুলের ওপর পর্দা ফেলতে গিয়ে ইসলামের জানাজাই পড়ে ফেলেছেন! খালিদসহ উম্মাহর সবাই ছিলেন শরিয়তের অধীন। শরিয়ত সবকিছুর ঊর্ধ্বে। ব্যক্তির সাফাই গাওয়ার অর্থ কখনো শরিয়তকে বিকৃতকরণ হতে পারে না। হায়কাল যে পথ অবলম্বন করেছেন, তার সারাংশ হচ্ছে, 'আরবদের সংস্কৃতির বিপরীতে কোনো বন্দি মহিলাকে বিয়ে করা এবং গর্ভাশয় পবিত্র হওয়ার আগে যৌনসম্ভোগ যদি ইসলামের মহান কোনো গাজির পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, তাহলে তা অপরাধ গণ্য হতে পারে না। অবশ্যই তাঁর অধিকার আছে যে, যুদ্ধবন্দি নারীরা তাঁর "মিলকে ইয়ামিন" হবে। গর্ভাশয় পবিত্র হওয়ার আগেই তিনি যুদ্ধবন্দি মহিলাকে সম্ভোগ করতে পারবেন।'

শরিয়তের বিধানে সামঞ্জস্য করতে গিয়ে অতি বাড়াবাড়ি কিংবা ছাড়াছাড়ি কাম্য হতে পারে না। আর এ উদ্দেশ্যে খালিদের মতো সত্তাকে নির্বাচিত করা তো রীতিমতো অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। বিশেষ করে এর ফলে যদি রাষ্ট্রপরিচালনায় কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।[১৯১]

শায়খ আহমাদ শাকির হায়কালের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্যের বিরোধিতায় লেখেন, 'সন্দেহ হচ্ছে, তিনি তো নেপোলিয়নের মতো ইউরোপীয় বাদশাহদের কুকীর্তি ঢাকতে ইংরেজ লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত নন? তারা যেমন তাদের নেতাদের প্রতিষ্ঠিত অপরাধ ঢাকতে বা হালকা করতে তাদের কৃতিত্বপূর্ণ কর্মগুলোকে আড়কাঠি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে, খুব সম্ভব এমন মানসিকতায় তাড়িত হয়েই ড. হায়কালও এই দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করে নিয়েছেন যে, আমাদের সোনালি যুগের আদর্শপুরুষরাও বদমাশ ইংরেজ নেতাদের মতোই ছিলেন। নতুবা শরিয়তবিষয়ক বাড়াবাড়িপূর্ণ কথাগুলো খালিদের মতো ব্যক্তির সঙ্গে জোড়ার সাহস পেতেন না। এই চিন্তাধারা মূলত দীন ও চরিত্রবিধ্বংসী।'[১৯২]

---

[১৮৯] প্রাগুক্ত : ২/২৩৯।

[১৯০] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৩৭।

[১৯১] *আস-সিদ্দিক আবু বাকার* : ১৪০।

[১৯২] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৩২।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ওমান ও বাহরাইনবাসীর ইরতিদাদ দমনে খালিদের অভিযান

এক. ওমানবাসীর ইরতিদাদ

ওমানবাসী ইতিপূর্বে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে নিয়েছিল। রাসুল ﷺ তাদের প্রতি আমর ইবনুল আস রা.-কে পাঠিয়েছিলেন। নবিজির ইনতিকালের পর সেখানকার 'জুত-তাজ' উপাধিধারী লাকিত ইবনু মালিক আল আজদি নামের একব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করে। জাহিলি যুগে তাকে শাহে ওমান জুলান্দাইর সমমানের মনে করা হতো। সে নবুওয়াতের দাবি করে বসে এবং মুর্খরা তার অনুসারী হতে থাকে। লোকটা ওমানে আধিপত্য বিস্তার করে। এরপর জুলান্দাইর দুই পুত্র জায়ফর ও আব্বাদকে পরাজিত করে উপকূলীয় এলাকায় তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে।[১৯৩]

জায়ফর আবু বকরকে বিষয়টা জানিয়ে তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়। আবু বকর হুজায়ফা ইবনু মিহসান গিলফানি হিমইয়ারি ও আরফাজা বারকা আজদি নামের দুই আমিরকে তার কাছে পাঠিয়ে দেন। হুজায়ফাকে পাঠান ওমানের দিকে; আর আরফাজাকে মাহরার দিকে। তাদের নির্দেশ দেন, 'তোমরা আগে ওমানের দিকে যাবে। সেখানে হুজায়ফা হবে আমির। এরপর যখন মাহরার দিকে যাবে, তখন আমির হবে আরফাজা।' এ ছাড়া তাদের সাহায্যের জন্য ইকরিমাকেও নির্দেশনামা পাঠান। আবু বকর হুজায়ফা ও আরফাজার কাছে লিখে পাঠান, 'ইকরিমা তোমাদের কাছে এসে পৌঁছলে তোমরা তাঁর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবে।' সেনাপতিদ্বয় ওমান এসে প্রথমে জায়ফরের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। এদিকে লাকিত ইবনু মালিকের কাছে মুসলিমবাহিনীর আগমনের সংবাদ পৌঁছে যায়। সে তখন তার বাহিনী নিয়ে দাবা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে।

দাবা ছিল সেখানকার কেন্দ্রীয় শহর ও বিখ্যাত বাজার। সেনারা যাতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে, এই লক্ষ্যে লাকিত নারী, শিশু ও জিনিসপত্র বাহিনীর পেছনে রাখে। এদিকে

[১৯৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৩৪।

জায়ফর ও আব্বাদ সুহার নামক স্থানে অবস্থান নিয়ে আবু বকরের প্রেরিত আমিরদের তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত করে। তারা মুসলিমদের সঙ্গে এসে মিলিত হলে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। মুসলিমদের জন্য সময়টা ছিল কঠিন পরীক্ষার। তাঁরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল এই বুঝি পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হবে; কিন্তু সেই নাজুক মুহূর্তে তাঁদের ওপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে বনু নাজিয়া ও বনু আবদি কায়েসের নেতাদের অধীনে একটা দল এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারা যোগ দিতেই মুসলিমরা বিজয় ছিনিয়ে আনেন। মুশরিকরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। মুসলিমবাহিনী তখন ধাওয়া করে তাদের ১০ হাজার যোদ্ধাকে খতম করে ফেলে। তারা তাদের নারী ও শিশুদের বন্দি করে মালসামানাসহ পুরো বাজার দখল করে নেয়। এরপর আরফাজার মাধ্যমে সেগুলোর এক-পঞ্চমাংশ মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[১৯৪]

কঠিন এ যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল, ওমানের সকল মুসলমান জায়ফর ও তার ভাই আব্বাদের নেতৃত্বে জুত-তাজ লাকিত ইবনু মালিকের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিমবাহিনী আসা অবধি তারা নিরাপদ অঞ্চলকে তাদের আবাসস্থল বানিয়ে রাখে। এভাবে বনু হাদিদ, নাজিয়া ও আবদি কায়েসের ইসলামে অটল থাকা এবং মোক্ষম সময়ে তাদের সশস্ত্র উপস্থিতি এই বিশাল বিজয়ে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল।[১৯৫]

দুই. বাহরাইনবাসীর ইরতিদাদ

রাসুল ﷺ আলা ইবনুল হাজরামিকে বাহরাইনের বাদশাহ মুনজির ইবনু সাবি আবাদির কাছে পাঠালে তিনি তাঁর পুরো জাতিকে নিয়ে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। এরপর মুনজির তাঁর জাতির মধ্যে ইসলাম ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন।[১৯৬] রাসুলের ইনতিকালের কিছুদিন পর তিনিও ইনতিকাল করেন। তাঁর ইনতিকালের পরপরই বাইরাইনবাসী মুরতাদ হয়ে মুনজির ইবনু নুমান আল গুরুরকে তাদের বাদশাহ বানিয়ে নেয়।

আবু বকর রা. আলা ইবনুল হাজরামির নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ পাঠান। তাঁরা যখন বাহরাইনের কাছে এসে পৌঁছান, তখন সুমামা ইবনু উসালও তাঁর গোত্র সুহাইমের একটা বিশাল দল নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন এবং এলাকার অন্য মুসলিমদেরও ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসতে উদ্দীপ্ত করেন। অপরদিকে জারুদ ইবনু মুআল্লাও তাঁর গোত্রের লোকজন নিয়ে সেখানে পৌঁছান। এভাবে মুসলিমদের দল ভারী হয়ে ওঠে। তাদের সঙ্গে নিয়ে আলা রা. মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। আল্লাহ তখন

---

১৯৪ প্রাগুক্ত : ৬/৩৩৫।

১৯৫ *আস-সাবিতুনা আলাল ইসলাম* : ৫৯-৬০।

১৯৬ *আত-তারাতিবুল ইদারিয়াহ* : ৬/৩৩৫।

ইমানদারদের সাহায্য করেন। ফলে বাহরাইনে ইরতিদাদি ফিতনার মূলোৎপাটন ঘটে। যাঁরা আলা রা.-কে সহায়তা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কায়েস ইবনু আসিম মিনকারি, আফিফ ইবনুল মুনজির এবং মুসান্না ইবনুল হারিসা শায়বানির নাম তালিকার শীর্ষে।[১৯৭]

১. আলা ইবনুল হাজরামির কারামত

আলা ইবনুল হাজরামি ছিলেন একজন আলিম, আবিদ ও মুসতাজাবুদ দাওয়াত (যার দুআ কবুল হয়) সাহাবি। তিনি যুদ্ধের জন্য শত্রুদের এলাকায় যাওয়ার সময় মরুভূমির মধ্যখানে একজায়গায় শিবির স্থাপন করেন।[১৯৮] মুজাহিদরা তাঁদের উট থেকে নেমে স্থির হওয়ার আগেই উটগুলো তাদের পিঠে থাকা খাবার-পানীয়, যুদ্ধসরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্রসহ পালিয়ে যায়। একটা উটও পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি। মুজাহিদদের কাছে তখন শরীরের পরিধেয় পোশাক ছাড়া আর কিছু ছিল না। সবাই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভয়াবহ এ অবস্থায় একজন অপরজনকে অসিয়ত করা শুরু করেন।

এমন নাজুক মুহূর্তে আলা ইবনুল হাজরামি রা. সবাইকে একত্রিত করে বলেন, 'আপনারা কি মুসলমান নন? আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হিসেবে তাঁর পথে বের হননি?' তারা বলেন, 'অবশ্যই।' আলা বলেন, 'তাহলে চিন্তা করবেন না, আল্লাহ আপনাদের মতো লোকদের লজ্জিত করতে পারেন না।' এরপর ফজরের আজান দেওয়া হলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে হাঁটু গেড়ে বসেন। সবাই আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দুআ শুরু করেন। দুআ অবস্থায়ই সূর্যোদয় হয়। মানুষ সূর্যের আলোকরশ্মি তাকিয়ে দেখছিল। সময় যত গড়াচ্ছিল, সূর্য তার তাপ মেলে ধরছিল। আলা তখনো দুআ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এভাবে বেলা গড়িয়ে তৃতীয় প্রহরে উপনীত হলে আল্লাহ তাআলা তাঁদের পাশেই মিঠা পানির একটা কূপ তৈরি করে দেন। তিনি লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই কূপের পানি পান করেন। গোসলও করেন। আরেকটু পর সূর্য যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, উটগুলো একে একে চতুর্দিক থেকে তাদের পিঠের মাল-সামানাসহ ফিরে আসতে থাকে। লোকজন তাঁদের সাজসরঞ্জাম যে যতটুকু রেখেছিলেন, সবই পান। কোনো কমবেশ হয়নি। এরপর তাঁরা উটগুলোকে পরিতৃপ্ত করে পানি পান করান। এই অভিযানে মুমিনরা চাক্ষুষভাবে আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করেন।[১৯৯]

২. মুরতাদদের পরাজয়

আলা রা. মুরতাদদের বিশাল বাহিনীর পাশেই শিবির স্থাপন করেন। রাতে হঠাৎ করে

---

[১৯৭] *আস-সাবিতুনা আলাল ইসলাম* : ৬৩।

[১৯৮] *তাবাকাত,* ইবনু সাআদ : ৪/৩৬৩।

[১৯৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৩৩।

শত্রুশিবির থেকে শোরগোল শুনতে পেয়ে সেনাদলকে বলেন, 'কে ওদের সংবাদ নিয়ে আসতে পারবে?' আবদুল্লাহ ইবনু হাজফ দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি।' তিনি সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েন। দেখতে পান, তারা মদপান করে মাতাল হয়ে আছে। ফিরে এসে সংবাদ দেওয়ামাত্র আলা রা. তৎক্ষণাৎ তাদের ওপর চড়াও হন এবং ইচ্ছামতো কচুকাটা করতে থাকেন। এই অতর্কিত হামলায় অল্পসংখ্যকই পালিয়ে যেতে পেরেছিল। যুদ্ধে তাদের সমুদয় মালসামানা মুসলিমদের হস্তগত হয়। এ ছাড়াও তাঁরা বিপুল গনিমত লাভ করেন।

হুতাম ইবনু জুবায়আ ছিল বনু কায়েস ইবনু সালাবার নেতা। মুসলিমদের আচমকা হামলায় ভীতসন্তস্ত্র হয়ে ঘুম থেকে উঠেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে; কিন্তু তার ঘোড়ার পা-দানি ভেঙে যায়। সে তখন ডেকে বলে, 'কেউ কি আমার ঘোড়ার পা-দানিটা ঠিক করে দেবে?' রাত ছিল গভীর অন্ধকার। একজন মুজাহিদ এগিয়ে এসে বলেন, 'আমি ঠিক করে দিচ্ছি, পা ওঠাও।' সে পা তোলামাত্রই তিনি তরবারি দিয়ে তার পা কেটে ফেলেন। হুতাম তখন তাকে বলে, 'এভাবে ফেলে না রেখে মেরে ফেলো।' ওই মুজাহিদ তখন জবাব দেন, 'না, আমি তা করতে পারি না।' সে তখন ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। এরপর যে-ই তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, হুতাম তাকেই ডেকে বলছিল, 'আমাকে শেষ করে দিয়ে যাও!' কিন্তু কেউই তাকে হত্যা করতে রাজি হয়নি।

একপর্যায়ে কায়েস ইবনু আসিম তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে ডেকে বলে, 'আমি হুতাম, আমাকে শেষ করে যাও!' কায়েস তাকে হত্যা করে ফেলেন; কিন্তু পরে তার পা কাটা দেখতে পেয়ে এ হত্যাকাণ্ডের ওপর লজ্জিত হন। কায়েস বলেন, 'বিষয়টা আগে থেকে জানা থাকলে আমি তাকে ওই অবস্থায় ফেলে যেতাম।'

মুসলিমরা পলায়নপরদের ধাওয়া করছিলেন, তাঁরা প্রতিটা রাস্তায় তাদের হত্যা করে চলছিলেন। যারা পালাতে পেরেছিল, তারা নৌযোগে দারিনে[২০০] গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এদিকে আলা ইবনুল হাজরামি রা. গনিমত বণ্টন শুরু করে দেন। বণ্টন শেষে তিনি মুসলিমদের উদ্দেশে বলেন, 'চলো আমরা দারিন যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে আবারও জিহাদ চালাতে হবে।' লোকজন দ্রুত প্রস্তুতি সেরে নেন। তারা যখন সমুদ্রতীরে গিয়ে নৌকায় উঠতে যাবেন, তখন দেখেন দূরত্বটা অনেক—নৌযোগে সেখানে যেতে যেতে শত্রুরা পালিয়ে যাবে। তখন তিনি এই বলে ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন,

يا ارحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا احد يا صمد ياحى يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا اله الا انت يا ربنا.[২০১]

---

[২০০] বাহরাইনের একটি বস্তির নাম।

[২০১] *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া* : ৬/১২১।

তিনি তাঁর বাহিনীকেও নির্দেশ দেন, 'আল্লাহর জিকির করতে করতে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ো।' নির্দেশ পেয়ে পুরো সেনাদল সাগরে নেমে যায়। আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা উপসাগরটা এমনভাবে পাড়ি দেন যে, যেন তাঁরা এমন নরম বালিতে ঘোড়া দৌড়াচ্ছিলেন, যে বালির উপর রয়েছে পানি, যা তাদের ঘোড়া ও উটের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছায়নি। দূরত্বটা ছিল নৌযোগে এক দিন ও এক রাতের সমান; কিন্তু মুসলিমবাহিনী মাত্র এক দিনে সেখানে গিয়ে আবার ফিরে আসেন। শত্রুবাহিনীর মধ্যে সংবাদ পৌঁছানোর মতোও কেউ তখন বাকি থাকেনি। তাঁরা তাদের যাবতীয় মালসামানা, গবাদি পশু এবং নারী ও শিশুদের ধরে নিয়ে আসেন। সমুদ্রে মুসলিমদের কোনো জিনিস খোয়া যায়নি। ঘোড়া থেকে শুধু একজনের একটা থলে পড়ে গিয়েছিল। আলা রা. সেটাও ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। এরপর গনিমতের সেই মাল মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। বাহিনীর সেনাসংখ্যা প্রচুর হওয়ার পরও অশ্বারোহীরা ৬ হাজার এবং পদাতিকরা ২ হাজার করে মুদ্রা পেয়েছিলেন।

তারা আবু বকর রা.-কে এ বিজয় সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেন।

মুসলিমদের পাশাপাশি হিজরের এক পাদরিও আলার কারামত দেখতে পেয়েছিল। এটা দেখে সে তখনই ইসলামগ্রহণ করে। পাদরি বলছিল, 'আমার ভয় হচ্ছিল, আমি যদি তা না করি তাহলে আল্লাহ আমার রূপ পরিবর্তন করে দেবেন। কেননা, আমি আল্লাহর নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছি। এ ছাড়া আমি ভোরে ইথারে একটা প্রার্থনা শুনেছিলাম।' মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে, 'প্রার্থনাটা কী ছিল?' সে বলে,

> اَللّٰهُمَّ انت الرحمٰن الرحيم، لا اله غيرك، والبديع ليس قبلك شيئ ، والدائم غير الغافل، والذى لا يموت، وخالق ما يرى وما لا يرى وكل يوم انت فى شان، وعلمت اللّٰهُمَّ كل شيئ علما .
>
> আল্লাহ, আপনি দয়ালু ও মেহেরবান। আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আপনার আগে কোনো উদ্ভাবক নেই। আপনি সর্বস্থায়ী, অসতর্ক নন। আপনি এমন সত্তা, যাঁর কোনো মৃত্যু নেই। আপনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের স্রষ্টা। আপনি প্রতিদিন আপনার মর্যাদা অনুযায়ী আছেন। আল্লাহ, আপনি সবকিছু জানার মতোই জানেন।

এ থেকে আমি বুঝে নিয়েছি, 'ফেরেশতাদের মাধ্যমে এ জন্য তাদের সহায়তা করা হয়েছে যে, তারা তাঁর দীনে অটল আছেন।' এরপর তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায়। সাহাবিরা তখন কান পেতে তার কথাগুলো শুনছিলেন।[২০২]

---

[২০২] প্রাগুক্ত : ৬/৩৩৪।

মুরতাদদের পরাজয়ের পর ইবনুল হাজরামি বাহরাইন চলে আসেন। ইসলাম তখন সেখানে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ইসলাম ও মুসলিমরা সেখানে সম্মানের শীর্ষস্থানে পৌঁছায়; আর কুফর-শিরক লজ্জিত ও অপমানিত হয়।[২০৩] যদি মুরতাদরা বাইরের সাহায্য না পেত, তাহলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে থাকার অবস্থায় ছিল না। পারসিকরা মুরতাদদের ৯ হাজার সেনাসহায়তা দিয়েছিল। আরব মুরতাদদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার। বিপরীতে মুসলিমদের সেনাসংখ্যা ছিল মোট ৪ হাজার।[২০৪]

বাহরাইনে ইরতিদাদি ফিতনার আগুন নেভানোর ক্ষেত্রে মুসান্না ইবনুল হারিসা বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে ইবনুল হাজরামির সঙ্গে যোগ দেন। নিজের বাহিনী নিয়ে বাহরাইন থেকে উত্তর দিকে রওনা হয়ে কাতিফ ও হিজরে আধিপত্য বিস্তার করে একেবারে দিজলার তীর পর্যন্ত পৌঁছে যান। মুসান্না এই মিশনেই লেগে থাকেন। একপর্যায়ে মুরতাদদের সহায়তাকারী পারস্যবাহিনী ও তাদের গভর্নরদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। এরপর মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য ওই এলাকার ইসলামের দৃঢ় বিশ্বাসীদের নিয়ে আলার সঙ্গে এসে মিলিত হন। এরপর উপকূল ধরে উত্তর দিকে এগোতে থাকেন। একপর্যায়ে দিজলা ও ফুরাতের মোহনায় অবস্থিত আরব গোত্রসমূহের কাছে পৌঁছে যান। তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শেষে সন্ধি স্থাপন করেন।

খলিফাতুর রাসুল আবু বকর রা. মুসান্না ইবনুল হারিসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কায়েস ইবনু আসিম মিনকারি বলেন, 'তিনি অজ্ঞাত, বংশপরিচয়হীন বা অনভিজাত কোনো লোক নন। তিনি তো মুসান্না ইবনুল হারিসা শায়বানি।'[২০৫]

আবু বকর তখন মুসান্নার নামে এই বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন ইরাকে আরবদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন। মুসান্নার কার্যক্রমকে তিনি ইরাক বিজয়ের প্রাথমিক পদক্ষেপ আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর পরই খালিদ রা. সেখানে মুসলিমবাহিনী নিয়ে ইতিহাসের মোড় পালটানো পদক্ষেপ নেন।[২০৬]

---

[২০৩] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১০৫।

[২০৪] *ফুতুহু ইবনু আ'সাম* : ৪৭; *আস-সাবিতুনা আলাল ইসলাম* : ৬৪।

[২০৫] *ফুতুহুল বুলদান*, বালাজুরি রা. : ২৪২; *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, খালিদ জাসিম : ৪৪।

[২০৬] *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, ৪৪, খালিদ আল জুনাবি ও নাজার আল হাদিসি।

সপ্তম অধ্যায়

বনু হানিফাকে শায়েস্তা ও মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবকে নির্মূল করতে খালিদের অভিযান

এক. মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব ও বনু হানিফা

১. পরিচিতি ও ভূমিকা

তার নাম মুসায়লিমা ইবনু সুমামা ইবনু কাবির ইবনু হাবিব হানাফি। উপনাম আবু শামাহ। সে ছিল নবুওয়াতের দাবিদারদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। মিথ্যাবাদিতায় তার বেশ নামডাক ছিল। মানুষ উপমাস্বরূপ বলত 'লোকটা মুসায়লিমার চেয়েও বড় মিথ্যাবাদী।' ইয়ামামার একটা ছোট্ট বস্তিতে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। এলাকাটা বর্তমানে জাবালিয়া নামে পরিচিত। এটা নাজদের উয়াইনার পার্শ্ববর্তী ওয়াদিউল হানিফিয়াতে অবস্থিত। জাহিলি যুগে তার উপাধি ছিল রাহমান। সে 'রাহমানুল ইয়ামামা' নামে খ্যাত ছিল।[২০৭]

আরব-অনারবে ভ্রমণ করে লোকজনকে আকর্ষণের বিদ্যা ভালো করেই রপ্ত করে নিয়েছিল। পূজারি, পুরোহিত, ভবিষ্যদ্‌বক্তা, গণক, জ্যোতিষী, জাদুকর, ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি এবং জিনের মক্কেলদের কাছ থেকে এসব কু-জ্ঞান অর্জন করেছিল। তার ইন্দ্রজালের মধ্যে একটা ছিল—পাখির কাটা পাখা তার ডানায় জুড়ে দিতে পারত, ডিমকে বোতলে ভরে নিতে পারত।[২০৮] মুসায়লিমা রাসুলের জীবদ্দশায়ই নবুওয়াতের দাবি করে। সে কুরআন শুনে আসতে লোকজনকে মক্কায় পাঠাত, যেন কুরআনের মতো কথা তৈরি করতে পারে; কিংবা একেই তার কথা বলে চালিয়ে দিতে পারে।[২০৯]

নবম হিজরিতে ইসলাম পুরো জাজিরাতুল আরবে ছড়িয়ে পড়লে মুসায়লিমাও বনু হানিফার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মদিনায় আসে। মানুষ তাকে তাদের কাপড়ের আড়ালে

---

[২০৭] *হুরুবুর রিদ্দাহ ওয়া বিনাউদ দাওলাহ,* আহমাদ সায়িদ : ১২৩; *আজ-জিরকিলি* : ২/১২৫।

[২০৮] *হারকাতুর রিদ্দাহ,* ড. আলি আতুম : ৭১।

[২০৯] *আল-বাদউত তারিখ* : ৫/১৬০; মাকদিসি কৃত *হারকাতুর রিদ্দাহ,* ড. আলি আতুম : ৭১।

লুকিয়ে রেখেছিল। সে যখন রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে, তখন রাসুলের হাতে ছিল খেজুরগাছের একটা কাণ্ড। নবিজি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি আমার কাছে মূল্যহীন খেজুরগাছের এই কাণ্ডটাও চাও, তথাপি এটা আমি তোমাকে দেবো না।'[২১০] এ থেকে এটাই প্রকাশ পায় যে, সে হয়তো নবুওয়াতে অংশীদারত্ব কিংবা তাঁর পরে খিলাফতের দাবি জানিয়েছিল।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মুসায়লিমা প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে নবিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি; বরং কাফেলার মালসামানা দেখাশোনার জন্য পেছনে থেকে গিয়েছিল। নবিজি প্রতিনিধিদলকে কিছু উপহার দিলে তাকেও তাদের সমান অংশ দেন। এরপর তাদের বলেন, 'সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নয়, সে তোমাদের মালসামানার নিরাপত্তা দিচ্ছে।'[২১১]

প্রথম বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয়, সে ছিল সন্দেহভাজন ব্যক্তি; যে কারণে তাকে কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়েছিল। সে তার ভেতরে অনেক কিছু লুকিয়ে রেখেছিল, যা ছিল বাস্তবতাবিবর্জিত। সে মূলত এমনই ছিল। নবিজির উক্তি 'সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নয়'-এর অর্থ কিন্তু এটা নয় যে, সে ভালো মানুষ ছিল; বরং নবিজির উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা সবাই খারাপ। সে-ও তোমাদের মতোই খারাপ। ভবিষ্যতে এ সত্যই প্রকাশ পেয়েছিল। বনু হানিফার কেউ-ই ভালো ছিল না। আর তাদের নেতা মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব তো ছিল অনিষ্টের মূল।

২. বনু হানিফার প্রতিনিধিদলের প্রত্যাবর্তন

বনু হানিফার প্রতিনিধিদল রাসুলের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পর মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব রীতিমতো নিজেকে নবি দাবি করে বসে। সে নবিজির সঙ্গে নবুওয়াতে শরিক বলে ঘোষণা দেয়। ভণ্ডটা নবিজির এই কথাকে আড়কাঠি বানাচ্ছিল—'সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ নয়।' মুসায়লিমা তার জাতিকে ছন্দোবদ্ধ বাক্য শোনাতে থাকে এবং ইচ্ছামতো যেকোনো বিষয়কে হালাল-হারাম ঘোষণা করতে শুরু করে। এভাবে সে তার নবুওয়াতের বগলবাদ্য বাজিয়ে চলছিল। তার কল্পিত কুরআনের আয়াতের নমুনা হচ্ছে,

لقد انعم الله على الحبلى، اخرج منه نسمة لا تسعى، من بين صفاق وحشى، فمنهم من يموت ويدس الى الثرى، ومن يبقى الى اجل مسمى والله يعلم السر و اخفى.

নিঃসন্দেহে আল্লাহ গর্ভবতীদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যিনি হালকা

---

২১০ *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, ইবনু হিশাম : ২/৫৭৬-৫৭৭।

২১১ প্রাগুক্ত : ২/৫৭৭।

চামড়া ও নাড়িভুঁড়ির মধ্যখান থেকে প্রাণবান সত্তার জন্ম দিয়েছেন।[২১২] এদের মধ্যে কতক মরে যায়, মাটির নিচে তাদের পুঁতে রাখা হয়। আর কতক তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বাকি থাকে। আল্লাহ গোপন বিষয়াদি সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[২১৩]

يا ضفدع بنت ضفدعين! نقى ما تنقين، اعلاك فى الماء واسفلك فى الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين.

হে ব্যাঙদের মেয়ে ব্যাঙ, ঘ্যাঙরঘ্যাং করতে থাক। তোর মাথা পানিতে আর পাছা কাদায়। পানি পানকারীকে তুই বাধা দিস না; আর পানিও ঘোলা করিস না![২১৪]

মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব অর্থ পরিবর্তন করে কুরআনের বাচনভঙ্গি চুরি করার প্রয়াস পাচ্ছিল। সে কুরআনকে বিকৃত করতে চেয়েছিল। যেমন : তার কথা ছিল,

فسبحان الله اذا جاء الحياة فكيف تحيون؟ والى ملك السماء ترقون، فلو انها حبة خردلة لقام عليها شهيد يعلم ما فى الصدور ولا كثر الناس فيها ثبور.

সুবহানাল্লাহ, যখন জীবন এসে যাবে, তখন কীভাবে জীবিত থাকবে? কীভাবে ঊর্ধ্বগামী হবে আকাশের দিকে। যদি সরিষার দানাও হয়, সে তার সামনে সাক্ষ্য দেবে যিনি অন্তর্যামী। অধিকাংশ মানুষের জন্য এতে রয়েছে ধ্বংস।[২১৫]

এগুলো যে অর্থহীন ও অসামঞ্জস্যে ভরপুর একধরনের প্রলাপ, তা সাধারণ কোনো মানুষের কাছেও অবোধ্য নয়। ইবনু কাসির বলেন, ইসলাম গ্রহণের আগে আমর ইবনুল আস মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'মুহাম্মাদের ওপর কুরআনের মধ্যে কী বিষয় নাজিল হয়?' আমর জবাব দিয়েছিলেন, 'তাঁর ওপর সুরাতুল আসর নাজিল হয়েছে।' সে বলে ওঠে, 'আমার ওপরও আল্লাহ অনুরূপ কালাম নাজিল করেছেন,

يا وبر يا وبر انما انت اذنان وصدر وسائرك حفر نقر.

---

২১২ *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ৭৩।

২১৩ *আল-বাদউত তারিখ* : ৫/১৬২, মাকদিসি।

২১৪ *তারিখুত তাবারি* : ৪/১০২।

২১৫ *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৭১।

> হে ওবর, হে ওবর![২১৬] তোমার দুই কান ও বক্ষ এবং বাকি সারা শরীর খোদাইকৃত, কুৎসিত।[২১৭]

আমর তখন বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ হে মুসায়লিমা, জানিস আমি তোকে মিথ্যাবাদী মনে করি!'

আল্লামা ইবনু কাসির রাহ. বলেন, মুসায়লিমা তার এই প্রলাপের মাধ্যমে কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিল; কিন্তু তখনকার কোনো মূর্তিপূজারির ওপরও তার এই ভোজবাজি কোনো ফল দেয়নি।[২১৮]

আবু বকর বাকিল্লানি রাহ. বলেন, কুরআন হিসেবে দাবিকৃত মুসায়লিমার এসব কথাবার্তা এতটাই হাস্যকর ছিল যে, তা শ্রবণযোগ্য ছিল না। এগুলো এতই নিম্নমানের যে, তাতে চিন্তার কোনো খোরাক ছিল না। তা ছিল শ্রোতাকে কেবল ক্ষণিকের জন্য বিস্ময়ের ঘোরে ফেলে রাখার টোটকা। শিক্ষা ও উপদেশ নেওয়ার মতো কিছুই তাতে ছিল না। সর্বোপরি তা ছিল ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ।[২১৯]

৩. রাসুলের নামে মুসায়লিমার চিঠি ও এর উত্তর

হিজরতের দশম বর্ষে নবিজি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে এই দুর্মতির দুঃসাহস চরমে পৌঁছায়। নবিজিকে চিঠি পাঠিয়ে জানায়, নবুওয়াতে সে তাঁর সঙ্গে অংশীদার! চিঠিটা লিখেছিল আমর ইবনু জারুদ হানাফি এবং এর বাহক ছিল ইবনুন নাওয়াহা-খ্যাত উবাদা ইবনু হারিস হানাফি। চিঠির ভাষ্য ছিল,

> *আল্লাহর রাসুল মুসায়লিমার পক্ষ থেকে মুহাম্মাদুর রাসুলের নামে।*
>
> *অর্ধেক ভূখণ্ড আমাদের আর অর্ধেক কুরাইশিদের; কিন্তু কুরাইশরা আমাদের সঙ্গে ইনসাফ করছে না।*

রাসুল ﷺ জবাব দেন। উবাই ইবনু কাব জবাবটা রচনা করেন। জবাব ছিল,

> *বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।*
>
> *আল্লাহর নবি মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবের নামে। জমিন আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাকেন।*

---

২১৬ 'ওবর' বিড়ালের মতো ছোট্ট একটি প্রাণী। যার কান দুটো লম্বা হয়ে থাকে। *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৪/৫৪৭।

২১৭ *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৪/৫৪৭, আল-হালাবি প্রকাশনী।

২১৮ *তাফসিরু ইবনি কাসির* : ৪/৫৪৭।

২১৯ *ইজাজুল কুরআন*, তাহকিক—সাইয়িদ সাকার : ১৫৬।

আর ভালো পরিণতি মুমিনদের জন্যই। যারা হিদায়াতের পথ অনুসরণ করে তাদের সালাম।

মুসায়লিমা দুজন বাহকের মাধ্যমে তার চিঠি পাঠিয়েছিল। একজন ছিল উল্লিখিত ইবনুন নাওয়াহা। নবিজি চিঠি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তাদের বলেন, 'তোমরা কী বলো?' তারা জবাব দেয়, 'আমরা তা-ই বলি, যা মুসায়লিমা বলে থাকে।' রাসুল ﷺ তখন বলেন, 'আমি যদি দূতহত্যা সঠিক মনে করতাম, তাহলে তোমাদের ঘাড় মটকে দিতাম।'[২২০]

৪. নবিজির পত্রবাহক হাবিব ইবনু জায়েদ আনসারির অবস্থান

উম্মু আম্মারা নাসাবিয়া বিনতু কাব মাজানিয়ার সন্তান হাবিব ইবনু জায়েদ রাসুলের চিঠি নিয়ে মুসায়লিমার কাছে যান। তিনি তার হাতে চিঠিটা তুলে দিলে সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' এরপর বলে, 'তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল?' হাবিব বলেন, 'আমি বধির; শুনতে পাচ্ছি না।' মুসায়লিমা বার বার একই প্রশ্ন করছিল আর তিনিও সেই একই জবাব দিচ্ছিলেন। যখনই হাবিব থেকে তার প্রত্যাশিত উত্তর পেত না, তখনই তাঁর একটা অঙ্গ কেটে ফেলত। এভাবেই শেষপর্যন্ত হাবিব শাহাদাতের সুধা পান করেন।[২২১]

একদিকে রাসুলের আচরণ দেখুন—তিনি কীভাবে অঙ্গীকার রক্ষা করছেন এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতিকে কেমন শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন। তিনি তার দূতদ্বয়কে হত্যা করেননি। যদিও তারা ছিল জঘন্য শত্রু এবং ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাঁর সামনে কুফরির প্রকাশ ঘটিয়েছিল। অপরদিকে কাজ্জাবের আচরণ দেখুন—সে সকল অঙ্গীকার থেকে চোখ বন্ধ করে রাখে। আন্তর্জাতিক নীতির বিরোধিতা করে যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত হয়। তা-ও সাধারণ হত্যা নয়; বরং দূতকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলেছিল। ইসলাম আর জাহিলিয়াতে পার্থক্য এখান থেকেই অনুমেয়। ইসলাম কথার মর্যাদা দেয়, মানুষের মর্যাদা দেয়। শত্রুর সঙ্গেও ভদ্রজনোচিত আচরণ এবং বীরত্বের প্রদর্শনী ঘটায়। আর জাহিলিয়াত আল্লাহর জমিনে কেবল ফ্যাসাদই বিস্তার করে। তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছুই বোঝে না, জানে না।[২২২]

দুই. রাজ্জাল ইবনু উনফুয়া হানাফি

বনু হানিফায় মুসায়লিমার দাওয়াত শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, তারা এই চক্রান্ত

---

২২০ *তারিখুত তাবারি* : ৩/৩৮৬-৩৮৭।

২২১ *উসদুল গাবা* : ১০৪৯।

২২২ *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ৭৪।

ও ধোঁকাগ্রহণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত। কারণ, হিজরত করে নবিজির হাতে ইসলামগ্রহণকারী, তাঁর কাছে কুরআনের শিক্ষার্থী, কুরআনের বেশকিছু সুরা মুখস্থকারী রাজ্জাল ইবনু উনফুয়ার মতো ব্যক্তিও এই ফিতনার শিকারে পরিণত হয়। রাসুল ﷺ তাকে মুসায়লিমার কাছে এ জন্য পাঠিয়েছিলেন যে, সে ওখানে গিয়ে মানুষকে এই ফিতনার বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত করবে, যাতে মুসায়লিমার সঙ্গী-সাথিরা তার সঙ্গ ছেড়ে সৎপথে চলে আসে; কিন্তু বিষয়টা আমূল পালটে যায়। রাজ্জাল সেখানে গিয়ে এ ঘোষণা দিতে থাকে যে, মুহাম্মাদ ﷺ মুসায়লিমাকে তাঁর নবুওয়াতে শরিক করে নিয়েছেন। এই হতভাগা মানুষের জন্য মুসায়লিমার চেয়ে বড় ফিতনার কারণ হয়ে উঠেছিল।[২২৩]

নবিজি তাঁর জীবদ্দশায়ই রাজ্জালের করুণ পরিণতির দিকে ইশারা করে যান। আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমি কতিপয় লোকের সঙ্গে রাসুলের কাছে বসা ছিলাম। রাজ্জাল ইবনু উনফুয়াও ছিল আমাদের সঙ্গে। নবিজি বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন এক জাহান্নামি রয়েছে, যার দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বড়।' এই সমাবেশের সবাই ইনতিকাল করেছেন, কেবল আমি আর উনফুয়া জীবিত আছি। আমি ভীতিজাগানিয়া এ কথাটা শোনার পর সবসময় সন্ত্রস্ত থাকতাম। একপর্যায়ে রাজ্জাল মুসায়লিমার পক্ষ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তার নবুওয়াত স্বীকার করে নেয়। রাজ্জালের ফিতনা ছিল মুসায়লিমার ফিতনার চেয়েও ভয়ংকর।[২২৪]

তিন. বনু হানিফার যাঁরা ইসলামে অটল ছিলেন

ইয়ামামায় মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবের ইরতিদাদের সংবাদ বেশ প্রসার লাভ করে। ফলে ইয়ামামার, বিশেষ করে বনু হানিফার খাঁটি মুসলিমদের ইসলামে দৃঢ় থাকার সংবাদটা এর নিচে চাপা পড়ে যায়। এ জন্য অধিকাংশ নতুন ইতিহাসবিদ তাদের কোনো আলোচনাই করেন না, যাঁরা সেই কঠিন মুহূর্তে ইসলামে দৃঢ়পদ ছিলেন। ফিতনার বিরুদ্ধে নিজেদের সীমিত সামর্থ্যে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এই ফিতনাকে গুঁড়িয়ে দিতে খিলাফতের পক্ষ থেকে আগত বাহিনীর সঙ্গ দিয়েছিলেন। আমি এমনকিছু গ্রহণযোগ্য বর্ণনা খুঁজে

---

[২২৩] প্রাগুক্ত : ৭৫। আল্লামা ইবনু কাসিরের বর্ণনামতে, রাজ্জালকে আবু বকর রা. ইয়ামামাবাসীকে ইরতিদাদি ফিতনা থেকে বিরত এবং দাওয়াতের মাধ্যমে লোকজনকে ইসলামের ওপর অটল রাখতে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে পৌঁছে সে মুসায়লিমার ডান হাতে পরিণত হয়ে যায়। দ্র. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৩। আর আবু হুরায়রা থেকে হাদিসটি বর্ণনা করা হয়েছে, এটিও ইবনু কাসিরের বর্ণনাকে সমর্থন করে। তার থেকে ইরতিদাদ প্রকাশ পেয়েছিল আবু বকরের যুগে।

[২২৪] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১০৬। তবে এ বর্ণনাটি ইবনু ইসহাক একজন অপরিচিত রাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাই বর্ণনাটি সনদের দিক দিয়ে দুর্বল।

পেয়েছি,[২২৫] যা এই বাস্তবতার কথা বলে। যেগুলো আজও অধিকাংশ মানুষের কাছে অজানা।[২২৬]

১. সুমামা ইবনু উসাল হানাফি

ইবনু আসামের বর্ণনা, ইয়ামামায় দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের শীর্ষে ছিলেন সুমামা ইবনু উসাল হানাফি রা.। তিনি ছিলেন বনু হানিফার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। লোকজন যখন জানতে পারেন, খালিদ রা. মুসায়লিমাকে দমনের জন্য ধেয়ে আসছেন, তখন তাঁরা সুমামার পাশে জড়ো হতে থাকে। সুমামা ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও গভীর প্রজ্ঞার অধিকারী। ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে পারঙ্গম ব্যক্তি। ইরতিদাদের প্রশ্নে ছিলেন মুসায়লিমার ঘোর বিরোধী। এ প্রসঙ্গে তিনি মুসায়লিমার সঙ্গী-সাথিদের যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন, সেগুলোয় এ ভাষণটি ছিল অন্যতম—

> হে বনু হানিফা, আমার কথা শোনো, তোমরা সফল হবে। আমার অনুসরণ করো, সত্য পথ পাবে। জেনে রেখো, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত নবি। তাঁর নবুওয়াত সন্দেহের ঊর্ধ্বে। মুসায়লিমা আপাদমস্তক মিথ্যাবাদী। তার কথা আর মিথ্যা কাহিনি শুনে ধোঁকা খেয়ো না। তোমরা সেই কুরআন শুনেছ, যা মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর কাছ থেকে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, 'হা-মিম। কুরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থ্যবান। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' [সুরা মুমিন : ১-৩]
>
> কোথায় আল্লাহর কালাম, আর কোথায় মুসায়লিমার প্রলাপ! উভয়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে? তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করো এবং এ থেকে বিমুখ হয়ো না। সাবধান হয়ে যাও, আমি রাতেই নিজের জানমাল ও পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার লক্ষ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে যাচ্ছি।

বনু হানিফার হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকজন উত্তরে বলে, 'আবু আমির, আমরা আপনার সঙ্গে আছি, থাকব।' এরপর সুমামা রা. রাতের আঁধারে বনু হানিফার কতিপয় লোককে নিয়ে খালিদের কাছে চলে যান। তাঁর কাছে নিরাপত্তা কামনা করেন। খালিদ রা. সুমামা ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের নিরাপত্তা দেন।[২২৭] কিলায়ির বর্ণনামতে, তাঁর এ কথাটিও বর্ণিত হয়েছে যে, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে কিংবা তাঁর পরে কোনো নবি

---

[২২৫] আমি এসব বর্ণনা ড. মাহদি রিজকুল্লাহর *আস-সাবিতুনা আলাল ইসলাম* গ্রন্থে খুঁজে পেয়েছি।

[২২৬] *আস-সাবিতুনা আলাল ইসলাম* : ৫১।

[২২৭] প্রাগুক্ত : ৫২।

নেই।' এরপর তিনি মুসায়লিমার ধারণাপ্রসূত কুরআনের কিছু উদ্ধৃতি পেশ করেন, যাতে এর অসারতা, মিথ্যা ও দুর্বলতা ফুটে ওঠে।[২২৮] এ প্রসঙ্গে সুমামার দিকে সংশ্লিষ্ট করা এমন কয়েকটা পঙ্‌ক্তি হচ্ছে,

মুসায়লিমা, তুই তোর অবস্থান থেকে ফিরে আয়! ঝগড়া করিস না,
তুই কখনো আল্লাহর রাসুলের নবুওয়াতে অংশীদার নয়।
ওহির ব্যাপারে তুই আল্লাহর ওপর মিথ্যাপ্রতিপাদন করছিস।
তোর খাহেশ হচ্ছে কতিপয় আহাম্মকের খাহেশের মতো।
তোর জাতি তোকে আশ্বাস দিচ্ছে তারা তোর নিরাপত্তা দেবে;
কিন্তু খালিদের বাহিনী আসার পর তারা পালিয়ে যাবে।
এমতাবস্থায় তুই না পাবি আকাশে ওঠার কোনো সিঁড়ি,
না পাবি জমিনে পালিয়ে নিরাপত্তালাভের স্থান।[২২৯]

অন্য বর্ণনায়ও মুসায়লিমাবিরোধী যুদ্ধে ইকরিমা ইবনু আবি জাহলের সঙ্গদানে সুমামার কৃতিত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে।[২৩০]

সুমামা বাহরাইনের ইরতিদাদ দমনে আলা ইবনুল হাজরামির সঙ্গে আন্তরিক সঙ্গ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বনু হানিফার শাখা বনু সুহাইমসহ কতিপয় শাখাগোত্রের মুসলিমরা ছিলেন। ওই যুদ্ধে তিনি বীরত্বের অন্তহীন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন।[২৩১]

২. মামার ইবনু কিলাব রুমানি

ইয়ামামায় সত্যে অবিচল থাকা ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন মামার ইবনু কিলাব রুমানি। তিনি মুসায়লিমা ও তার অনুসারীদের উপদেশ দেন। ইরতিদাদ থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি ছিলেন সুমামার অনুসারী। ইয়ামামার যুদ্ধে খালিদের সঙ্গ দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া ইয়ামামার নেতৃস্থানীয়দের যাঁরা নিজেদের ইসলাম গোপন করে রেখেছিলেন, রাজ্জালের অন্যতম বন্ধু ইবনু আমর ইয়াশকুরি তাঁদের একজন। তিনি তখন কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছেন, যা ইয়ামামার লোকজনের মুখে মুখে ফিরে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। কয়েকটা পঙ্‌ক্তি হচ্ছে,

নিঃসন্দেহে আমার দীন হচ্ছে মুহাম্মাদের দীন
জাতির অনেক মানুষ আমার মতোই সত্যের ওপর দৃঢ় রয়েছে।

---

[২২৮] *হুরুবুর রিদ্দাহ,* আল কিলায়ি : ১১৭।

[২২৯] *আস-সাবিতুনা আলাল ইসলাম* : ৫৩।

[২৩০] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৬১।

[২৩১] *আস-সাবিতুনা আলাল ইসলাম* : ৫৪।

জাতির মধ্যে সবার চেয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে মুহকাম ইবনু তুফায়েল
এবং রাজ্জালও, যারা আমাদের কাছে পুরুষ হিসেবে বিবেচিত নয়।
যদি সত্য দীনের ওপর আমার মৃত্যু হয়
তাহলে আমার তাতে কোনো পরোয়া নেই।

এই পঙ্‌ক্তিগুলো মুসায়লিমা, মুহকামসহ ইয়ামামার নেতাদের কানে গেলে তারা তাঁকে গ্রেপ্তার করতে উদ্ধত হয়; কিন্তু তিনি এর আগেই খালিদের কাছে চলে যান। সেখানে গিয়ে খালিদকে ইয়ামামাবাসীর অবস্থা জানান। এ ছাড়া তাদের গোপন কিছু বিষয় সম্পর্কেও অবহিত করেন।[২৩২]

একইভাবে ইয়ামামায় ইসলামের ওপর দৃঢ় বিশ্বাসীদের মধ্যে আমির ইবনু মাসলামা ও তাঁর গোত্র ছিল উল্লেখযোগ্য। আবু বকর রা. ইসলামে অটল বনু হানিফার লোকদের অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেন। অনেক কিছু তাঁদের উপহার দেন। মুতরিফ ইবনু নুমানকে ইয়ামামার গভর্নর নিযুক্ত করেন। মুতরিফ ছিলেন সুমামা ইবনু উসাল ও আমির ইবনু মাসলামার ভাতিজা।[২৩৩]

চার. মুসায়লিমার ওপর খালিদের চড়াও হওয়া

আবু বকর রা. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন—'আসাদ, গাতফান ও মালিক ইবনু নুবায়রাকে দেখে নেওয়ার পর ইয়ামামা অভিমুখে এগিয়ে যাবে।' বিষয়টাতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করছিলেন। শারিক আল ফাজারি[২৩৪] বলেন, বুজাখার যুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিল, আমিও তাঁদের সঙ্গে ছিলাম। এরপর আমি খলিফার কাছে গেলে তিনি আমাকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে পাঠিয়ে দেন। আমার মাধ্যমে খালিদকে উদ্দেশ্য করে একটা চিঠি পাঠান, তাতে লেখা ছিল,

বার্তাবাহকের মাধ্যমে তোমার চিঠি আমার হস্তগত হয়েছে। এতে বুজাখার যুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের কথা উল্লেখ আছে। এ ছাড়া আসাদ ও গাতফানের সঙ্গে তুমি যে ব্যবহার করেছ, তারও উল্লেখ আছে। তুমি আরও উল্লেখ করেছ, 'আমি ইয়ামামার অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছি'; এ ক্ষেত্রে আমার উপদেশ থাকবে, এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর তাকওয়া বুকে ধারণ করবে। তোমার সঙ্গে যে-সকল মুসলিম আছেন, তাঁদের সঙ্গে

---

২৩২ *হুরুবুর রিদ্দাহ,* আল কিলায়ি : ১০৪-১০৬।

২৩৩ *আস-সাবিতুনা আলাল ইসলাম* : ৫৭-৫৮।

২৩৪ শারিক আল ফাজারি রা. একজন সাহাবি। তিনি আবু বকর ও খালিদ রা.-এর মধ্যে যুদ্ধবিষয়ক পত্র আদানপ্রদানের দায়িত্বে ছিলেন।

পিতার মতো আচরণ করবে।

খালিদ, সাবধান, বনু মুগিরার অহংকার ও ঔদ্ধত্য থেকে বেঁচে থাকবে। আমি তোমার সম্পর্কে তাদের কথা গ্রহণ করিনি, যাদের কথা আমি কখনোই প্রত্যাখ্যান করতাম না। অতএব, তুমি যখন বনু হানিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে, তখন সাবধানতা অবলম্বন করবে। স্মরণ রাখবে, বনু হানিফার মতো শক্তিশালী কারও সঙ্গে এখনো তোমার মোকাবিলা হয়নি। এরা সবাই তোমার বিরোধী। এদের শাসনাধীন এলাকা বেশ প্রশস্ত। অতএব, সেখানে পৌঁছে বাহিনীর কমান্ড নিজের হাতে উঠিয়ে নেবে। ডান বাহুতে একজন আর বাম বাহুতে একজন নির্দিষ্ট করে রাখবে। আর অশ্বারোহীদের নেতৃত্বও ঠিক করে দেবে। তোমার সঙ্গে যে-সকল আনসার ও মুহাজির প্রবীণ সাহাবি আছেন, প্রতিনিয়ত তাঁদের পরামর্শ নেবে। তাঁদের মর্যাদাকে সম্মান জানাবে। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে ময়দানে নামবে। শত্রুবাহিনী যখন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, তখনই তাদের ওপর হামলে পড়বে। তিরের মোকাবিলায় তির, বর্শার মোকাবিলায় বর্শা ও তরবারির মোকাবিলায় তরবারি ব্যবহার করবে। তরবারির জোরে তাদের বন্দিদের উঠিয়ে নেবে।[২৩৫] হত্যার মাধ্যমে ভীতি ছড়িয়ে দেবে। তাদের আগুনে ঠেলে দেবে। আমার নির্দেশ অমান্য করবে না। ওয়াসসালামু আলাইকা।[২৩৬]

চিঠিপ্রাপ্তির পর খালিদ রা. সেটা পাঠ করে বলেন, 'আমরা তাঁর কথা শুনেছি। এসব নির্দেশ অবশ্যই বাস্তবায়ন করব।'[২৩৭]

খালিদ মুসলিমবাহিনীকে প্রস্তুত করে বনু হানিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য এগিয়ে যান। আনসারদের নেতা নিযুক্ত হন সাবিত ইবনু কায়েস ইবনু শাম্মাস। মুরতাদদের যাদের সঙ্গেই পথে সাক্ষাৎ হতো, তিনি তাদের শিক্ষণীয় শাস্তি দিতেন। এদিকে আবু বকর খালিদের পেছন দিকের নিরাপত্তার জন্য বড় একটা সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে দেন। ইয়ামামার যাযাবর অনেক গোত্রের পাশ দিয়ে খালিদবাহিনীকে পথ চলতে হয়। সেসব গোত্রের লোকেরা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। পথ অতিক্রমকালে খালিদ তাদের মোকাবিলা করে পুনরায় ইসলামের দিকে নিয়ে আসেন। পথে সাজাহের বিক্ষিপ্ত বাহিনীর সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাদেরও হত্যা করে সামনের দিকে এগিয়ে যান। এরপর ইয়ামামার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।[২৩৮]

---

[২৩৫] *হুরুবুর রিদ্দাহ*, শাওকি আবু খালিল : ৭৮।

[২৩৬] *মাজমুআতুল ওয়াসায়িকিস সিয়াসিয়া* : ৩৪৮-৩৪৯; *হুরুবুর রিদ্দাহ*, শাওকি আবু খালিল : ৭৯।

[২৩৭] *হুরুবুর রিদ্দাহ*, শাওকি আবু খালিল : ৭৯।

[২৩৮] *আস-সিদ্দিক আওয়ালুল খুলাফা* : ১০৫।

পাঁচ. খালিদবাহিনীর মোকাবিলায় মুসায়লিমার সেনাবিন্যাস

মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব খালিদের বাহিনীর আগমন সম্পর্কে অবহিত হলে ইয়ামামার আকরিবা এলাকায় বাহিনী প্রস্তুত করে। ইয়ামামাবাসী তখন দলে দলে তার কাছে জড়ো হয় এবং সে লোকজনকে খালিদের মোকাবিলায় উদ্দীপ্ত করে। মুসায়লিমা তার বাহিনীর ডান ও বামে যথাক্রমে মুহকাম ইবনু তুফায়েল ও রাজ্জাল ইবনু উনফুয়াকে সেনাপতি নিযুক্ত করে।

এদিকে খালিদ রা. ইকরিমা ও শুরাহবিলের সঙ্গে মিলিত হন। অগ্রবাহিনীতে ছিলেন শুরাহবিল ইবনু হাসানা; আর সেনাবাহিনীর ডান ও বাম বাহুতে ছিলেন যথাক্রমে জায়েদ ইবনুল খাত্তাব ও আবু হুজায়ফা ইবনু উতবা ইবনু রাবিআ।[২৩৯]

ছয়. মুজ্জাআ ইবনু মুরারা হানাফির গ্রেপ্তারি

৪০ অথবা ৬০ জন অশ্বারোহীর একটা বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল মুজ্জাআ ইবনু মুরারা হানাফি। পথিমধ্যে তাদের সঙ্গে খালিদের অগ্রবর্তী বাহিনীর অকস্মাৎ দেখা হয়ে যায়। মুজ্জাআর এই বাহিনী মূলত বনু তামিম ও বনু আমির থেকে প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিল। পথে মুসলিমরা তাদের গ্রেপ্তার করে খালিদের দরবারে নিয়ে আসে। খালিদ তাদের বলেন, 'তোমরা কী বলো?' তারা উত্তর দেয়, 'আমরা বলি, একজন নবি তোমাদের থেকে আর একজন আমাদের থেকে!' এমন উত্তর শুনে তাদের সবাইকে তিনি হত্যা করেন।[২৪০]

অন্য বর্ণনামতে, খালিদ তাদের জিজ্ঞেস করেন, 'তোমরা আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েছ?' তারা বলে, 'আপনাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা ছিল না। আমরা তো বনু তামিম ও আমির থেকে প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।' খালিদ তাদের কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি মুসায়লিমার গোয়েন্দা ভেবে তাদের সবাইকে হত্যা করে ফেলেন। যখন তাদের হত্যা করা হচ্ছিল, তখন তারা মুজ্জাআর দিকে ইশারা করে বলে, 'আপনি ইয়ামামাবাসীর সঙ্গে কল্যাণ বা অকল্যাণ যা-ই চান না কেন, এর জন্য আমাদের নেতা মুজ্জাআকে বাঁচিয়ে রাখুন।' তিনি তাদের কথামতো মুজ্জাআকে বাঁচিয়ে রেখে বাকিদের হত্যা করেন।[২৪১]

মুজ্জাআ ছিল বনু হানিফার সরদার। সে অভিজাত ও অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এরপর খালিদ রা. যেখানেই অবস্থান করতেন, তাকে পাশে ডাকতেন। তাকে

---

২৩৯ *হুরুবুর রিদ্দাহ, শাওকি আবু খালিল* : ৮০।

২৪০ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৮।

২৪১ *তারিখুত তাবারি* : ৪/১০৬; *আস-সিদ্দিক আওয়ালুল খুলাফা* : ১০৫।

সঙ্গে নিয়ে খাবার খেতেন, কথাবার্তা বলতেন। একদিন বলেন, 'মুসায়লিমা সম্পর্কে কিছু বলো! সে কি তোমাকে কিছু পড়ে শোনাত? তার কোনো কথা তোমার স্মরণ আছে?' মুজ্জাআ বলে, 'হ্যাঁ, অবশ্যই স্মরণ আছে।' এরপর সে মুসায়লিমার মুখে শোনা প্রাণোদ্দীপক কিছু কবিতা আবৃত্তি করে। খালিদ তখন নিজের এক হাত অন্য হাতের উপর মেরে বলতে থাকেন, 'মুসলিমরা, শোনো, সে কীভাবে কুরআনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।' এরপর বলেন, 'মুজ্জাআ, তুমি একজন সরদার ও বুদ্ধিমান লোক। অতএব, আগে আল্লাহর কালাম শোনো, এরপর দেখো আল্লাহর এই শত্রু কীভাবে তাঁর কালামের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চায়। পরে খালিদ তাঁকে 'সুরা আলা' তিলাওয়াত করে শোনান।

তিলাওয়াত শোনার পর মুজ্জাআ বলে, 'বাহরাইনের একব্যক্তি ছিল মুসায়লিমার কাতিব। মুসায়লিমা তাকে একেবারে ঘনিষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছিল। অন্য কেউ তার এত ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। সে একদিন আমাদের কাছে এসে বলে, "হে ইয়ামামাবাসী, তোমাদের ধ্বংস হোক। আল্লাহর শপথ, তোমাদের সাথি মিথ্যাবাদী। আমার ধারণা, এতে তোমরা আমাকে অপবাদ আরোপকারী বলবে না। তোমরা জানো তার কাছে আমার মর্যাদা কোথায়; কিন্তু আল্লাহর শপথ, সে তোমাদের সঙ্গে মিথ্যা বলছে। তোমাদের কাছ থেকে অন্যায়ের ওপর বায়আত নিচ্ছে।"'

খালিদ বলেন, 'এরপর এই বাহরাইনি লোকটা কী করল?' মুজ্জাআ বলে, 'তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়।' খালিদ বলেন, 'এই মিথ্যাবাদীর আরও কিছু মিথ্যা বর্ণনা করো।' মুজ্জাআ তখন উদ্দীপনাময়ী তার আরও কিছু পঙ্‌ক্তি তুলে ধরে। এসব শুনে খালিদ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি এগুলো বিশ্বাস করো? এগুলোকে হক মনে করো?' সে উত্তর দেয়, 'এগুলো যদি আমাদের কাছে সত্য মনে না হতো, তাহলে কাল আপনার বিরুদ্ধে ১০ হাজার তরবারি জমায়েত হতো না।' খালিদ বলেন, 'তোমাদের মোকাবিলায় আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই তাঁর দীনকে বিজয়ী করবেন। তারা আমাদের বিরুদ্ধে নয়; আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তাঁর দীনকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে।'[২৪২]

জবাবটি খালিদের দৃঢ় ইমান এবং আল্লাহর ওপর পূর্ণ নির্ভরতার স্পষ্ট দলিল। আল্লাহর ওপর অটল ইমান এবং দীনের ব্যাপারে আল্লাহর সাহায্যের ওপর শর্তহীন নির্ভরতার এই গুণ দুটিই খালিদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সামরিক সক্ষমতা এবং নেতৃপর্যায়ের দক্ষতার জন্ম দিয়েছিল। বুজাখাযুদ্ধে তিনি দুটি তরবারি নিয়ে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। একপর্যায়ে উভয় তরবারি ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর অন্তর ইমানে পরিপূর্ণ। আল্লাহর ওপর ছিল অগাধ আস্থা। যে কারণে তিনি নিজেকে শক্তিমান অনুভব করতেন। তাঁর অন্তর ছিল

---

[২৪২] *হুরুবুর রিদ্দাহ*, শাওকি আবু খালিল : ৮২।

শত্রুদের থেকে ভয়শূন্য। আর শত্রুর অন্তর থাকত আল্লাহর ভীতিতে পরিপূর্ণ। এটিই ছিল বিজয় ও সাহায্য অর্জন এবং শত্রুকে ধ্বংস করার প্রথম কারণ।[২৪৩]

সাত. অস্ত্রযুদ্ধের আগে খালিদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ

খালিদ রা. লড়াইয়ের আগে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালানোর পরিকল্পনা নেন। সুতরাং জিয়াদ ইবনু লাবিদকে তাঁর একসময়ের বন্ধু ইয়ামামার সরদার মুহকাম ইবনু তুফায়েলকে নিজের দিকে টেনে আনতে পাঠিয়ে দেন। খালিদ বলেন, 'যদি তুমি মুহকামকে এমন কোনো জিনিস পাঠাও, যার মাধ্যমে তাকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারো, তাহলে ভালো।' জিয়াদ তাকে নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো লিখে পাঠান,

যদি অশ্বারোহী মুজাহিদরা বর্শাসহ ইয়ামামামায় প্রবেশ করে
তাহলে ইয়ামামায় অনিঃশেষ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।
আল্লাহর শপথ, বর্শার অগ্রপ্রান্ত তোমাদের থেকে ফিরে থাকবে না
যতক্ষণ-না তোমারা কওমে আদ ও সামুদের মতো বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

একইভাবে খালিদ আগেই ইসলামগ্রহণ করা উমায়ের ইবনু সালিহ ইয়াশকুরির দিকে দৃষ্টি দেন। তিনি ছিলেন ইমানে সুদৃঢ় এবং বিশ্বাসে পাক্কা; কিন্তু তিনি তাঁর ইমান গোপন রাখছিলেন। খালিদ তাঁকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার গোত্রের কাছে যাও।' উমায়ের তাদের কাছে গিয়ে বলেন, 'খালিদ মুহাজির ও আনসারদের নিয়ে তোমাদের কাছে এসে গেছেন। আমি তাঁদের এমন জাতি হিসেবে দেখেছি, তোমরা যদি ধৈর্যের মাধ্যমে তাঁদের ওপর বিজয়ী হতে চাও, তাহলে তাঁরা আল্লাহর সাহায্য নিয়ে তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি সংখ্যার দিক দিয়ে বিজয়ী হতে চাও, তাহলে তাঁরা আল্লাহর সহায়তা নিয়ে তোমাদের ওপর বিজয়ী হবে। তোমরা ও তাঁরা কোনো অবস্থায়ই সমান নও। ইসলাম এখানে অবশ্যই পৌঁছবে। অবশ্যই শিরক বিদূরিত হবে। তাঁদের সঙ্গী সত্যিকার নবি আর তোমাদের সঙ্গী মিথ্যুক। তাঁদের সঙ্গে আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, তোমাদের সঙ্গে আছে কেবল অহংকার। এখনো তরবারি খাপে আছে, তির তূণীরে আছে। তরবারি তার খাপ থেকে উন্মুক্ত হওয়ার আগে, তির তূণীর থেকে বেরোনোর আগে বাস্তবতা স্বীকার করে নাও।'[২৪৪]

এরপর খালিদ রা. সুমামা ইবনু উসালের সঙ্গে মিলিত হন। তিনিও তাঁর জাতির কাছে যান। তাদের আনুগত্যের দাওয়াত দেন। তাদের ভেতর থেকে যুদ্ধের পাগলামি বের করে দিতে বলেন, 'দুই নবি একত্রে থাকতে পারেন না। নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ ﷺ-এর

---

[২৪৩] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২১৮-২১৯।

[২৪৪] *আল-হারবুন নাফসিয়াহ*, আহমাদ নাওফাল : ১৪৪-১৪৫।

পর কোনো নবি নেই, তাঁর সঙ্গেও কোনো নবি নেই। আবু বকর তোমাদের কাছে এমন মানুষ পাঠিয়েছেন, যাঁকে তাঁর মা-বাবার রাখা নামে ডাকা হয় না; "সাইফুল্লাহ" ডাকা হয়। তাঁর সঙ্গে আছে অগণিত তরবারি। অতএব, তোমরা নিজেদের নিয়ে চিন্তা করো।'[২৪৫]

খালিদ রা. সুদৃঢ় পরিকল্পনা করেন। তিনি শত্রুবাহিনীকে দুর্বল মনে করেননি। রণাঙ্গনে সর্বদা চৌকশ থাকতেন, যাতে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে শত্রু আক্রমণ করে বসতে না পারে, নতুন কোনো চক্রান্ত আঁটতে না পারে। তাঁর অনন্য এক গুণ ছিল, নিজে বিশ্রাম না নিয়ে অন্যকে বিশ্রামের সুযোগ দিতেন। পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাতযাপন করতেন। তাঁর কাছে শত্রুর কোনো বিষয়ই অস্পষ্ট থাকত না।

আট. খালিদবাহিনীর সেনাবিন্যাস

খালিদ মুসায়লিমার সঙ্গে আকরিবায় যুদ্ধে জড়ানোর আগে মিকনাফ ইবনু জায়েদ ও তাঁর ভাই হুরাইসকে প্রথমসারির অধিনায়ক নিযুক্ত করেন, যাতে তাঁরা যুদ্ধ-সংক্রান্ত জরুরি তথ্য সরবরাহ করতে পারেন। সেনাসারি বিন্যস্ত করার সময় ছিল একেবারে নিকটে। অবস্থা ছিল খুবই গুরুতর। এ জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ ছিল অনিবার্য। যুদ্ধের পতাকাবাহী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু হাফস ইবনু গানিম রা.। এরপর তা আবু হুজায়ফার গোলাম সালিমের কাছে অর্পণ করা হয়।[২৪৬] আরবদের মধ্যে এই প্রবাদ বিখ্যাত ছিল—'লোকজন নিজেদের পতাকাতলে সমবেত থাকে, পতাকা পড়ে গেলে মানুষও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।'

খালিদ এই যুদ্ধে শুরাহবিল ইবনু হাসানাকে আগে রেখে দেন এবং বাহিনীকে মোট পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। সম্মুখসারিতে ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ মাখজুমি, ডান বাহুতে আবু হুজায়ফা, বাম বাহুতে শুজা, মধ্যখানে জায়েদ ইবনুল খাত্তাব এবং অশ্বারোহী বাহিনীতে উসামা ইবনু জায়েদ রা.। উটগুলোকে রাখেন সবার পেছনে। এগুলোর ওপর ছিল তাঁদের তাঁবু। নারীরাও তাতে আরোহী ছিলেন। এ ছিল যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের শেষ সারিবিন্যাস।

নয়. চূড়ান্ত যুদ্ধ

উভয় বাহিনী মাঠে নেমে এলে মুসায়লিমা তার বাহিনীর উদ্দেশে একটা ভাষণ দেয়। সে তাদের বলে, 'আজ আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন। আজ তোমরা হেরে গেলে ওরা

---

[২৪৫] প্রাগুক্ত : ২/১৪৫; *ফান্নু ইদারাতিল মারিকা*, মুহাম্মাদ ফারাজ : ১৩৮-১৪০।

[২৪৬] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ১৯৯-২০০।

তোমাদের নারীদের ধরে নিয়ে বিয়ে করবে। তবে এ বিয়ে তাদের জন্য সুখকর ভবিষ্যৎ নিয়ে আসবে না। তাই বংশমর্যাদা রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। নিজেদের নারীদের সম্ভ্রম হিফাজত করো।'[২৪৭]

খালিদ রা. মুসলিমবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। সেখানে এমন একটা টিলায় ওঠেন, যেটা থেকে পুরো ইয়ামামা শহর পর্যবেক্ষণ করা যেত। সেখানেই তাঁর বাহিনীকে থামিয়ে দেন। এর পরপরই মুসলিম ও কাফিরদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। প্রথম আক্রমণে মুসলিমবাহিনী পরাজিত হয়। বনু হানিফার যোদ্ধারা খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। তারা উম্মু তামিমকে হত্যা করতে উদ্যত হলে মুজ্জাআ তাঁকে বাঁচিয়ে নেয়। সে তাদের বলে, 'তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও স্বাধীন নারী।'

তারা যদিও খালিদের তাঁবুতে ঢুকে পড়েছিল; কিন্তু এ সময় তাদের বড় ক্ষতি হয়ে যায়। তাদের নেতা রাজ্জাল ইবনু উনফুয়াকে হত্যা করে ফেলা হয়। তাকে হত্যা করেন জায়েদ ইবনুল খাত্তাব রা.। সাহাবিরা একজন অপরজনকে উত্তেজিত করার পাশাপাশি পিছিয়ে যাওয়ার ওপর তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। সাবিত ইবনু কায়েস ইবনু শাম্মাস বলেন, 'তোমরা তোমাদের সঙ্গীদের কতই-না মন্দকাজে অভ্যস্ত করে নিয়েছ।' চতুর্দিক থেকে একই আওয়াজ আসছিল—'খালিদ, আমাদের কাছে আসুন।' ইতিমধ্যে মুহাজির ও আনসারদের একটা দল এসে পৌঁছায়। তাঁদের এই আগমন মুসলিমবাহিনীর জন্য আত্মরক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

বনু হানিফা তখন প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে লড়ছিল। সাহাবিরা একজন অপরজনকে অসিয়ত করে বলছিলেন, 'হে সুরায়ে বাকারাওয়ালারা, আজ জাদু ভেঙে গেছে।' সাবিত ইবনু কায়েস তাঁর শরীরে সুগন্ধি মেখে কাফন জড়িয়ে নেন। এরপর নিজের পা মাটিতে পুঁতে আনসারদের পতাকা হাতে সেখানে দৃঢ়তার সঙ্গে অবস্থান করেন। শেষপর্যন্ত তিনি সেখানেই শাহাদাতবরণ করেন। মুহাজিররা আবু হুজায়ফার গোলাম সালিমকে বলেন, 'আপনি কি এই আশঙ্কা করছেন যে, আপনার দিক থেকে শত্রুরা হামলে পড়তে পারে?' সালিম রা. বলেন, 'এমন হলে আমি নিজেকে কুরআনের একজন অযোগ্য ধারক মনে করব।' জায়েদ ইবনুল খাত্তাব রা. বলছিলেন, 'লোকজন, তোমরা দাঁতে দাঁত চেপে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। তীব্রবেগে সামনে অগ্রসর হও।' এরপর বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি তাদের পরাজিত করা অথবা আল্লাহর দরবারে পৌঁছা অবধি কোনো কথা বলব না।' অবশেষে তিনিও সেখানে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দেন।

আবু হুজায়ফা বলছিলেন, 'কুরআন ধারণকারীরা, তোমরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে

---

[২৪৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৮।

কুরআনকে সাজিয়ে তুলো।' এরপর তিনি শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের পিছু হটান এবং নিজেও আহত হন।

এদিকে খালিদ ক্ষুধার্ত বাঘের মতো হামলা চালিয়ে শত্রুসারি তছনছ করে এগোতে থাকেন। তিনি সরাসরি মুসায়লিমার দিকে এগোচ্ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি নিজেই মুসায়লিমার মোকাবিলা করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন। খালিদ উভয় বাহিনীর মধ্যখানে দাঁড়িয়ে সিংহের মতো গর্জন ছেড়ে বলেন, 'আমি ওয়ালিদের পুত্র খালিদ, আমি আমর ও জায়েদের সন্তান।' এরপর তিনি মুসলিমদের যুদ্ধ-সংকেত 'ইয়া মুহাম্মাদাহ' শব্দ উচ্চারণ করেন।[২৪৮]

শত্রুবাহিনীর যে-ই তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল, তাকেই জাহান্নামে পাঠাচ্ছিলেন। খালিদ মুহাজির ও আনসারদের বেদুইনদের থেকে পৃথক রেখেছিলেন। প্রত্যেক গোত্রের হাতে ছিল তাদের নিজস্ব পতাকা। বিপদ কোন দিক থেকে এগিয়ে আসছে, বোঝার জন্য তারা পতাকাগুলোর পাশে জমে লড়াই করছিলেন।

সাহাবিরা এই যুদ্ধে অচিন্তনীয় দৃঢ়তা ও ধৈর্যের প্রমাণ দেন। তাঁরা বার বার শত্রুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষপর্যন্ত আল্লাহ মুসলিমদের বিজয়দানে ধন্য করেন। কাফিররা তখন পালিয়ে যেতে থাকে। মুসলিমরা তাদের পিছু ধাওয়া করে ইচ্ছামতো হত্যা করেন। তাদের ঘাড়ে মুহুর্মুহু তরবারি চলছিল। একপর্যায়ে তারা হাদিকাতুল মাউতে (মৃত্যু-বাগানে) আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। মুহকাম ইবনু তুফায়েল তাদের ওই বাগানে প্রবেশ করার ইঙ্গিত করে। অভিশপ্ত মুসায়লিমাও সেখানে আশ্রয় নেয়। আবদুর রাহমান ইবনু আবি বকর রা. দেখতে পান, মুহকাম সেখানে তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছে। তিনি তির ছুড়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন। তার মৃত্যুর পর তার গোত্রের লোকেরা বনু হানিফার বাগানে আশ্রয় নেয়। পরে সাহাবিরা চারদিক থেকে বাগানটা অবরোধ করেন।[২৪৯]

দশ. বারা ইবনু মালিকের ভাষণ

বারা ইবনু মালিক রা. বলেন, 'হে মুজাহিদ ভাইয়েরা, আমাকে বাগানের ভেতর ছুড়ে দাও।' সাহাবিরা তাঁকে ঢালে উঠিয়ে বর্শার সাহায্যে দেয়ালের ওপারে পৌঁছে দেন। তিনি বীরত্বের সঙ্গে লড়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দরজা খুলে দেন। ফলে মুসলিমবাহিনী তীব্রবেগে বাগানে ঢুকে পড়ে। তাঁরা ভেতরে পৌঁছেই বাগানের সব দরজা খুলে দেন।

---

[২৪৮] এটি ছিল একটি সামরিক নিদর্শন, যা এই যুদ্ধে গ্রহণ করা হয়েছিল। এটি ফরিয়াদ কিংবা সাহায্যপ্রার্থনা হিসেবে ছিল না। —*সংকলক*।

[২৪৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৯।

মুরতাদরা তখন মুসলিমদের ঘেরাওয়ে পড়ে ভাবে, এবার আর বাঁচতে পারবে না। সত্য এসে পড়েছে, বাতিল বিলীন হয়ে গেছে।[২৫০]

এগারো. মুসায়লিমাতুল কাজ্জাবকে হত্যা

মুসলিমরা মুরতাদদের হত্যা করতে করতে একেবারে মুসায়লিমার নিকটবর্তী হয়ে যান। তার বাহিনীর শোচনীয় অবস্থা দেখে সে রাগে পাগলের মতো হয়ে একটা দেয়ালের ভাঙা অংশের মধ্যখানে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজছিল। শয়তান যখন তার ওপর সওয়ার হতো, তখন মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে থাকত। এ অবস্থায় উহুদযুদ্ধে হামজা রা.-কে শহিদকারী জুবায়ের ইবনু মুতয়িমের হাবশি গোলাম ওয়াহশি রা. মুসায়লিমাকে দেখতে পেয়ে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে যান। একপর্যায়ে তাঁর সেই বিখ্যাত বর্শা ছুড়ে মারেন। বর্শাটা মুসায়লিমার বুকের একদিকে লেগে অপরদিকে বেরিয়ে যায়। এরপর দ্রুত আবু দুজানা সিমাক ইবনু খারশা তার দিকে অগ্রসর হন। তিনি তরবারি দিয়ে আঘাত করলে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পাশের এক মহল থেকে এক মহিলা মুসায়লিমাকে হত্যার এই দৃশ্য দেখে চিৎকার দিয়ে বলে ওঠে 'সৌন্দর্যের প্রতীক আমিরকে এক কৃষ্ণকায় গোলাম হত্যা করে ফেলেছে!'

যুদ্ধের ময়দান ও বাগান সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার মুরতাদ নিহত হয়। এক বর্ণনামতে, এ সংখ্যা ছিল ২১ হাজার। আর শাহাদাতপিয়াসি মুসলিমের সংখ্যা ছিল ৬০০। অন্য এক বর্ণনায় শহিদের সংখ্যা ৫০০ ছিল বলে উল্লেখ হয়েছে (আল্লাহই ভালো জানেন)। শহিদদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সাহাবিরাও ছিলেন।

এরপর খালিদ রা. নিহতদের পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বের হন। মুজ্জাআ ইবনু মুরারা তাঁর পেছনে পেছনে শেকলবন্দি হয়ে চলছিল। তিনি তার মাধ্যমে নিহতদের মধ্যে মুসায়লিমার বাপারে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। রাজ্জাল ইবনু উনফুয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খালিদ জিজ্ঞেস করেন, 'এ লোকটা কি মুসায়লিমা?' সে বলে, 'না, এ হচ্ছে রাজ্জাল ইবনু উনফুয়া। সে তার থেকে অনেক ভালো।' এরপর হলদেরাঙা চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে জিজ্ঞেস করেন, 'এ-ই নিশ্চয় তোমাদের নেতা? আল্লাহ এর আনুগত্যের কারণে তোমাদের ধ্বংস করেছেন।' এরপর খালিদ রা. অশ্বারোহী বাহিনীকে ইয়ামামার আশেপাশে ছড়িয়ে দেন, যেন তারা সেখানকার দুর্গসমূহ এবং সেগুলোর আশপাশ থেকে মালসামানা ও বন্দিদের নিয়ে আসেন।[২৫১]

---

[২৫০] *হুরুবুর রিদ্দাহ*, শাওকি আবু খালিল : ৯২।

[২৫১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৩০।

অষ্টম অধ্যায়

খালিদের বিয়ে ও ইরাকের অভিযানসমূহ

এক. মুজ্জাআর প্রতারণা ও খালিদের বিয়ে

১. মুজ্জাআর প্রতারণা

হাদিকাতুল মাউতে (মৃত্যু-বাগান) বিজয় অর্জনের পর খালিদ রা. ইয়ামামার সর্বত্র অশ্বারোহী বাহিনী ছড়িয়ে দেন। তাদের নির্দেশ দেন, প্রতিটা দুর্গের সম্পদ ও বন্দিদের যেন একত্রিত করে নিয়ে আসা হয়। এরপর সেখানকার দুর্গসমূহে হামলার পরিকল্পনা করেন। দুর্গসমূহে তখন কেবল নারী-বৃদ্ধ আর শিশুরাই ছিল; কিন্তু মুজ্জাআ খালিদকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, এসব দুর্গ সশস্ত্র যোদ্ধায় পরিপূর্ণ। সে তাঁকে বলে, 'আপনি আমার সঙ্গে একটা সন্ধিতে আসতে পারেন।' মুসলিমরা অব্যাহত যুদ্ধে ক্লান্ত ছিলেন বিধায় খালিদ রা. সন্ধির ব্যাপারে রাজি হয়ে যান। মুজ্জাআ বলে, 'আমাকে একটু সুযোগ দিন, আমি তাদের সঙ্গে সন্ধির বিষয়ে মতবিনিময় করে নিই।' খালিদ তাকে সেই সুযোগ দিলে সে ভেতরে গিয়ে নারীদের বলে, 'তোমরা যুদ্ধের পোশাক পরে দুর্গপ্রাচীরে দাঁড়িয়ে যাবে।' খালিদ কেল্লার দিকে তাকালে দেখতে পান, সেখানে অসংখ্য মাথা দেখা যাচ্ছে। এর ফলে মুজ্জাআর কথায় তিনি বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন।

এরপর ইসলামের দিকে তাদের আহ্বান করলে তারা ইসলামগ্রহণ করে। খালিদ তখন তাদের কিছুসংখ্যক বন্দিকে ছেড়ে বাকিদের খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দেন। এদের থেকেই এক বাঁদিকে আলি রা. কিনে নেন এবং ওই বাঁদির গর্ভেই তাঁর পুত্র মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়া রাহ. জন্মান।

ইয়ামামার যুদ্ধ ১১ হিজরিতে হয়। ওয়াকিদিসহ কয়েকজন বর্ণনাকারীর মতে, যুদ্ধটা শুরু হয় ১১ হিজরিতে আর সমাপ্ত হয় ১২ হিজরিতে।[২৫২]

---

[২৫২] *তারতিব ওয়া তাহজিব, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খিলাফাতু আবি বাকরিন* : ১১৫।

২. মুজ্জাআ-কন্যার সঙ্গো খালিদের বিয়ে এবং আবু বকরের সঙ্গো পত্রযোগাযোগ

সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর খালিদ রা. মুজ্জাআর কাছে তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুজ্জাআ বলে, 'আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করলে আমি-আপনি উভয়েই খলিফার ক্রোধের মুখে পড়ব।' খালিদ এটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলেন, 'তুমি তোমার মেয়েকে আমার সঙ্গো বিয়ে দিয়ে দাও।' এরপর মেয়েকে তাঁর হাতে তুলে দেয়।[২৫৩]

এদিকে আবু বকর রা. সালমা ইবনু ওয়াকশকে খালিদের প্রতি এই নির্দেশ দিয়ে পাঠান—'বনু হানিফার প্রাপ্তবয়স্ক সকল পুরুষকে যেন হত্যা করা হয়।' কিন্তু তত দিনে ওদের সঙ্গো খালিদ সন্ধি করে নিয়েছিলেন বিধায় তিনি সন্ধির মর্যাদা ভঙ্গা হতে দেননি।[২৫৪]

আবু বকর রা. ইয়ামামার খবর জানতে সবসময় খালিদের প্রেরিত সংবাদবাহকের অপেক্ষায় থাকতেন। একদিন বিকালে মুহাজির ও আনসারদের একটা বাহিনী নিয়ে হাররার দিকে বেরোলে সেখানে খালিদের সংবাদবাহক আবু খায়সামা নাজারির সঙ্গো সাক্ষাৎ হয়। আবু বকর তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'পেছনের খবর কী?' তিনি বলেন, 'খলিফাতুল মুসলিমিন, খবর ভালো। আমরা ইয়ামামায় বিজয় অর্জন করেছি; আর এই নিন খালিদের চিঠি।'

আবু বকর তৎক্ষণাৎ শুকরিয়ার সালাত আদায় করে বলেন, 'আমাকে যুদ্ধের অবস্থার বিবরণ শোনাও। বলো, সেখানে কী ঘটেছিল?' আবু খায়সামা তখন খালিদ কীভাবে সেনাবিন্যাস করেছিলেন, কীভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, কোন কোন সাহাবি শাহাদাতবরণ করেছেন, সবকিছু তুলে ধরেন। এরপর বলেন, 'আমরা প্রথমে বেদুইনদের পক্ষ থেকে পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম। তারা আমাদের এমন জিনিসে অভ্যস্ত করে তুলেছিল, যা আমাদের ভালোভাবে জানা ছিল না।'

৩. খালিদের প্রতি খলিফা আবু বকরের চিঠি

এরপর খালিদের বিয়ের সংবাদ আবু বকরের কানে গেলে তিনি তাঁকে লেখেন,

> *খালিদ, তুমি বিয়ের জন্য এতটা উতলা হয়ে উঠলে; অথচ তোমার আঙিনায় এখনো ১ হাজার ২০০ শহিদের রক্ত শুকিয়ে যায়নি। তার ওপর মুজ্জাআ তোমাকে প্রতারিত করে সন্ধি করিয়ে নিল! আল্লাহ তো তোমাকে তাদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছিলেন!*

---

২৫৩ *আস-সিদ্দিক আওয়ালুল খুলাফা* : ১১০।

২৫৪ *আল-কামিল* : ২/৩৮।

মুজ্জাআর সঙ্গে সন্ধি এবং তার মেয়েকে বিয়ের কারণে আবু বকর তাঁকে তিরস্কার করে চিঠি লেখেন। জবাবি চিঠিতে খালিদ তাঁর অবস্থানের সাফাই গেয়ে আবু বারজা আসলামিকে তাঁর দরবারে পাঠান। চিঠিটা ছিল ভাষার স্পষ্টতা এবং কথার দৃঢ়তায় অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি লিখেছিলেন,

আল্লাহর শপথ, আমি ততক্ষণ বিয়ে করিনি, যতক্ষণ-না আনন্দ পূর্ণতায় উপনীত হয়েছে। আমি এমন একজনের মেয়েকে বিয়ে করেছি, যার কাছে মদিনা থেকে প্রস্তাব পাঠালেও অস্বীকার করত না। ক্ষমা করবেন, আমি আমার অবস্থান থেকেই বার্তা পাঠানোকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। এই সম্পর্কটা আপনার কাছে দীনি বা দুনিয়াবি দিক থেকে অপছন্দনীয় হয়ে থাকলে বলুন, আমি আপনার আদেশ পূরণের চেষ্টা করব।

আর শহিদদের সমবেদনার প্রশ্ন? কারও চিন্তা ও ব্যথা যদি কোনো জীবিতকে বাঁচিয়ে রাখার কিংবা মৃতকে ফিরিয়ে আনার মাধ্যম হতো, তাহলে অবশ্যই আমার ব্যথা আর চিন্তাই জীবিতকে বাঁচিয়ে রাখত, মৃতকে ফিরিয়ে আনত। আমি এমনভাবে হামলা করেছিলাম যে, জীবন থেকে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম। শত্রুদের প্রতিরোধ এতটাই শক্ত ছিল যে, মৃত্যুর নিশ্চয়তার ব্যাপারে আমার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। এ ছাড়া মুজ্জাআর প্রতারণার কথা? এখানেও আমি সিদ্ধান্তগ্রহণে ভুল করিনি; কিন্তু আমি তো আর গাইবের খবর জানি না। আল্লাহ যা কিছু করেছেন, মুসলিমদের কল্যাণের জন্যই করেছেন। মুসলিমদের ভূমির উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন এবং পরকালের কল্যাণ তো মুত্তাকিদের জন্যই।[২৫৫]

চিঠি পেয়ে আবু বকর অনেকটা নরম হয়ে যান। এ ছাড়া আবু বারজাসহ কুরাইশের একদল লোকও খলিফার কাছে খালিদের পক্ষ নেন। আবু বারজা বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের খলিফা, খালিদের ওপর ভীরুতা কিংবা খিয়ানতের দায় চাপানো যাবে না। তিনি শাহাদাতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়েই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ওজর গ্রহণ করা যেতেই পারে। তিনি কঠিন পরিস্থিতিতেও দৃঢ়পদ ছিলেন এবং শেষপর্যন্ত বিজয় ছিনিয়ে আনেন। বনু হানিফার সঙ্গে সন্ধিটি কোনো চাপের বশবর্তী হয়ে করেননি; সন্তুষ্ট চিত্তেই করেছেন। তিনি যে কল্যাণচিন্তায় সন্ধি করেছেন, তাতে সিদ্ধান্তটা অদূরদর্শী বলা যাবে না। তাদের দুর্গে অসংখ্য মহিলাকে পুরুষের যুদ্ধ-পোশাক পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল।'

---

২৫৫ *হুরুবুর রিদ্দাহ,* শাওকি আবু খলিল : ৯৭; *আল-ইকতিফা* : ২/১৪।

আবু বকর বলেন, 'তুমি সত্য বলেছ। খালিদের ওজরের ব্যাপারে তাঁর পাঠানো চিঠির চেয়ে তোমার কথাই যথোপযুক্ত।'[২৫৬]

৪. খলিফার কাছে পাঠানো খালিদের চিঠির গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক

খালিদের চিঠির গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক তুলে ধরছি, যেগুলো দ্বারা তিনি তাঁর কাজের সাফাই গেয়েছিলেন :

- বিজয় ও সাহায্য সুনিশ্চিত হওয়া এবং স্থিতিশীলতা ফিরে আসার পরই তিনি মুজ্জাআর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন।
- তিনি এমন একজনের সঙ্গে আত্মীয়তা গড়েছেন, যে ছিল তার গোত্রের অভিজাত নেতা।
- সম্পর্ক গড়তে তাঁকে একটুও কষ্ট করতে হয়নি।
- এ সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দীনি ও দুনিয়াবি কোনো অকল্যাণ ছিল না।
- চিন্তাভারাক্রান্ত অবস্থার কারণে বিয়েশাদি থেকে বিরত থাকা কোনো প্রশংসনীয় কাজ হতে পারে না। চিন্তা ও ব্যথা যেমন জীবিতকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না, তেমনি তা মৃতকেও ফিরিয়ে আনতে পারে না।
- মুজ্জাআর সঙ্গে সন্ধির ক্ষেত্রে মুসলিমদের স্বার্থের ব্যাপারটাকে তিনি অগ্রাধিকার দিতে কোনো ত্রুটি করেননি। যদিও মুজ্জাআ তাঁকে সঠিক সংবাদ দেয়নি। তিনি তো মানুষ ছিলেন। অদৃশ্যের খবর জানতেন না। শেষপর্যন্ত পরিণাম মুসলিমদের পক্ষেই থাকে। তাঁরা বনু হানিফার ভূখণ্ডের অধিকারী হন। বাকিরা ইসলামে ফিরে আসে। মুজ্জাআর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা স্বভাবজাত একটা বিষয়। এ কারণে তাঁর সমালোচনা করা যায় না।

  আর আক্কাদের মতো এ কথাও বলা যাবে না যে, 'মুজ্জাআর গোত্রীয় আত্মমর্যাদাবোধ খালিদকে প্রভাবিত করেছিল, এ কারণে তিনি তার মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন, দীনি সম্পর্ক যেন ঐতিহ্য ও বংশগত সম্পর্কের মাধ্যমে দৃঢ় হয়।'[২৫৭] খালিদ রা. কখনো দীনি সম্পর্কের ওপর অন্য সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দিতেন না; অথবা দীনি সম্পর্কের সঙ্গে অন্য কোনো সম্পর্ক একত্রিত করতেন না।[২৫৮]

---

[২৫৬] *হুরুবুর রিদ্দাহ* : ৯৮।

[২৫৭] *আবকারিয়াতু খালিদ (আ-আবকারিয়াতুল ইসলামিয়াহ)* : ৯২২।

[২৫৮] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৩৫।

- খালিদের পক্ষে ওজর বর্ণনার ক্ষেত্রে ড. হুসাইন হায়কালের পন্থাও কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তার বর্ণনাধারা ইসলামি বিধানের বিপরীত। হায়কালের ভাষ্যমতে, 'বিজয়োৎসবে (যা উদ্‌যাপন করা খালিদের জন্য জরুরি ছিল) মুজ্জাআ-কন্যার গুরুত্ব কোথায়? এটা তো এই মহান প্রতিভাধর দিগ্‌বিজয়ীর পায়ে নিজেকে কুরবান করার চেয়ে আলাদা কোনো মর্যাদা রাখে না—যে মহান সত্তা এই আশা বুকে লালন করে ইয়ামামার ভূখণ্ডকে রক্তের দ্বারা তৃপ্ত করে দিয়েছিলেন যে, এখানকার সকল অকল্যাণ ও অপবিত্রতা দূর হয়ে যাবে।'[২৫৯]

  এখানে হুসাইন হায়কাল মহান সাহাবি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে প্রতিমাপূজারি গ্রিক যোদ্ধা আকিলিস (Achilles), হেক্টর (Hector) আর অ্যাগামেমননের (Agamemnon) মতো তুলে ধরছেন, যারা কেবল খ্যাতি অর্জন ও নেতৃত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করত। হায়কালের কথায় মনে হয়, খালিদ যেন আরবের এমন এক দেবতা ছিলেন, যার পায়ে মানুষের রক্ত অর্ঘ্য দেওয়া হয়; অথবা নীলনদের সেই দেবতা, যার সম্পর্কে বলা হয়—যতক্ষণ-না তাকে কোনো সুন্দর কুমারীকে অর্ঘ্য হিসেবে দেওয়া হতো, ততক্ষণ নীলে জোয়ার আসত না।

আল্লাহ ক্ষমা করুন, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. ছিলেন এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনি একজন খাঁটি মুমিন ছিলেন। কেবল আল্লাহর বাণী উঁচু করার লক্ষ্য নিয়েই জিহাদ করতেন। কোনো সৃষ্টির কাছে এর প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা পাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

একইভাবে জেনারেল আকরামের ধারণাও ভুল। তিনি ইরতিদাদি যুদ্ধ চলাকালে খালিদের বিয়ে-সংক্রান্ত কাহিনির ওপর উত্থাপিত অভিযোগ এবং দোষারোপের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'তাঁর শারীরিক সক্ষমতা এবং অপার যোগ্যতার কারণে আরব উপদ্বীপের সুন্দর মেয়েদের পক্ষ থেকে তাঁকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে।'[২৬০] জেনারেল আকরামের এই বক্তব্য থেকে অনুমিত হয়, খালিদ যেন আনন্দ-মাহফিলের একজন নায়ক অথবা সুন্দর নারীদের জন্য পাগলপারা ছিলেন; অথচ আল্লাহর পথে লড়াই ছাড়া খালিদের কাছে অধিক প্রিয় কিছু ছিল না; কিন্তু এ সকল লেখক-গবেষক কত সহজে এবং নির্লজ্জভাবে একটা সত্য ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা করেছে, যা স্থান-কাল-পাত্র, সাক্ষ্য এবং পরিষ্কার ঘটনার সম্পূর্ণ বিরোধী।[২৬১]

খালিদ শুধু দীনের হিফাজতের লক্ষ্যেই জিহাদ করতেন। কেবল আল্লাহর কাছেই এর বিনিময়ের আশা করতেন। যুদ্ধে নিজে যোগ দিতেন। তাঁর সম্পর্কে তো এটা প্রসিদ্ধ যে,

---

[২৫৯] *আস-সিদ্দিক আবু বাকার* : ১৫৭।

[২৬০] *সাইফুল্লাহ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.*, অনুবাদ আল আমিদুর রুকন সাবহি আল জাবি : ২০।

[২৬১] *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৩৬।

তাঁর মধ্যে ছিল বিড়ালের ধৈর্য এবং সিংহের অমিততেজা সাহস।[২৬২] কোনোদিন তিনি বাহিনী থেকে পেছনে থাকেননি। শত্রুরা সর্বদা তাঁকে সম্মুখসারিতেই দেখতে পেত। বুজাখাযুদ্ধেও তিনি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। ঘোড়া নিয়ে কেবল এগিয়েই যাচ্ছিলেন। লোকজন বলছিল, 'আল্লাহ, আল্লাহ, আপনি তো আমাদের আমির। আপনার জন্য এতটা এগিয়ে যাওয়া উচিত নয়।' তিনি জবাবে বলছিলেন, 'আল্লাহর শপথ, আপনাদের কথা আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু যেখানে মুসলিমদের পরাজয়ের শঙ্কা, সেখানে আমার পক্ষে নিজেকে ধরে রাখার সাধ্য কোথায়?'[২৬৩]

ইয়ামামার যুদ্ধ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, তখন বনু হানিফার সারিতে লাশের স্তূপ জমা হওয়ার পরও তারা অমিত বিক্রম দেখিয়ে চলছিল, কঠিন সেই পরিস্থিতিতে তিনি রণাঙ্গনে নেমে আসেন। সেনাসারির মধ্যখানে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানান। মুসলিমদের যুদ্ধের সংকেত-শব্দ 'ইয়া মুহাম্মাদাহ' বলে চিৎকার দেন। যে শত্রুই তাঁর দিকে এগিয়ে আসত, তাকেই হত্যা করে ফেলতেন।[২৬৪]

খালিদ রা. সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় ও সাহায্যের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। তাঁর মধ্যে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল। আসুন, আমরা খালিদের ভাষ্যেই ইয়ামামার মৃত্যুবাগানে মুসায়লিমার এক সেনার সঙ্গে হওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিবরণ শুনি,

> যুদ্ধের একপর্যায়ে বনু হানিফার একব্যক্তি আমার গলা জাপটে ধরে। আমরা উভয়ই অশ্বারোহী ছিলাম এবং একসঙ্গে মাটিতে পড়ে যাই। মাটিতে পড়ার পরও একে অন্যকে গলা জড়ানো অবস্থায় থাকি। আমি তখন বর্শা দিয়ে তার ওপর আঘাত করি। সে-ও তার বর্শা দিয়ে আমার ওপর আঘাত হানে। এভাবে আমার গায়ে সাতটি জখম লাগে। এরপর আমি তাকে কঠিন একটা আঘাত করি। ফলে সে আমার হাতে নেতিয়ে পড়ে। জখমের ব্যথায় আমি নড়তে পারছিলাম না। শরীর থেকে প্রচুর রক্ত বয়ে যায়; কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, মৃত্যুর দুয়ারে সে আমার আগে পৌঁছে যায়।

খালিদ রা. বনু হানিফার শক্তি ও বীরত্বের স্বীকৃতি দিতে গিয়ে বলেন,

> আমি বড় বড় ২০টা রণাঙ্গনে অংশ নিয়েছি; কিন্তু ইয়ামামাযুদ্ধের দিন বনু হানিফার যোদ্ধাদের থেকে অধিকতর তলোয়ারবাজ, তরবারির আঘাতের ওপর অধিকতর দৃঢ় এবং ধৈর্যশীল কাউকে পাইনি। জখমের তীব্রতায় আমি নড়াচড়ার

---

[২৬২] *তারিখুল ইয়াকুবি* : ২/১০৮।

[২৬৩] *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ১৪৪।

[২৬৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩২৯।

শক্তি হারিয়ে ফেলি; কিন্তু এরপরও শত্রুব্যূহে ঢুকে পড়ি। একপর্যায়ে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে মৃত্যুকে নিশ্চিত মনে করতে থাকি।[২৬৫]

দুই. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে হত্যাচেষ্টা

জাহিলিয়াতের ভ্রান্তি, দুর্বলতা ও অসারতা পরিষ্কার হওয়ার পরও জাহিলদের জন্য তা সহজে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ, তাদের পুরো জীবনই তো এই ভ্রান্তিতে কেটে গেছে। এ জন্য যখনই জাহিলিয়াত-জীবনের বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে, তখনই তার সকল আবর্জনা উগরে দিতে চেয়েছে। তারা সত্যের বিপরীতে ততক্ষণ পর্যন্ত হাত থেকে তরবারি ফেলে রাখেনি, যতক্ষণ-না শক্তিবলে তাদের দমিয়ে রাখা হয়েছে।[২৬৬] বাতিল কখনো সত্যের মোকাবিলায় নীরব হয়নি; বরং যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার মাঠে নেমে এসেছে।

এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে, সালমা ইবনু উমায়ের হানিফির আচরণ। লোকটা সন্ধির পরও খালিদকে হত্যা করতে উদ্ধত হয়। যদিও বনু হানিফার লোকজন মুসলিমদের সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিল, এরপরও সে চুক্তি লঙ্ঘন করে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। তাকে প্রথমবার যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সে তার গোত্রের লোকদের কাছে অঙ্গীকার করে—দ্বিতীয়বার আর এমন জঘন্যতায় লিপ্ত হবে না; কিন্তু রাতে বাঁধনমুক্ত হতেই কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে খালিদকে হত্যার অভিপ্রায়ে তাঁর তাঁবুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে দেখামাত্রই চিৎকার দিয়ে উঠলে বনু হানিফার লোকজন তার পিছু ধাওয়া করে একটা বাগানে গিয়ে ধরে। সে তখন তাদের ওপর তরবারি চালাতে শুরু করে; কিন্তু বনু হানিফার লোকজন দূর থেকে পাথর ছুড়ে তাকে কাবু করে ফেলে। এরপর তার কণ্ঠনালিতে তরবারি ঠেসে ধরায় তার জীবনধমনি কেটে যায়। পরে সে একটা কূপে পড়ে মারা যায়।[২৬৭]

এ হচ্ছে বাতিলের প্রতিরক্ষায় সত্যের বিপরীতে বিদ্বেষের একটা চিত্র।[২৬৮]

তিন. ইরাক অভিযানে খালিদ ও আবু বকরের পরিকল্পনা

ইরতিদাদি ফিতনার কারণে আরব উপদ্বীপে যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল, আবু বকরের সুদূরপ্রসারী চিন্তাক্ষমতার গুণে তা উৎপাটিত হয় এবং তাঁর দক্ষ নেতৃত্বের

---

২৬৫ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ১৮০।

২৬৬ *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৯২।

২৬৭ *তারিখুত তাবারি* : ৪/১১৭-১১৮।

২৬৮ *হারকাতুর রিদ্দাহ*, ড. আলি আতুম : ২৯২-২৯৫।

কারণে মুসলিমরা ধারাবাহিক বিজয় অর্জন করতে থাকেন। ফিতনা দমনের লক্ষ্যে সংঘটিত হওয়া এসব যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামি শাসনব্যবস্থা স্থিতিশীল এবং অরাজকতা দূর হয়। এরপর তিনি সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেন, যে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন খোদ রাসুল ﷺ।

আবু বকর রা. ইরাক বিজয়ের জন্য দুটি বাহিনী গঠন করেন। প্রথম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে এবং দ্বিতীয় বাহিনীর ইয়াজ ইবনু গানাম রা.-কে। আর ইরাকে খালিদের সহযোগী হিসেবে মুসান্না ইবনুল হারিসাকে নিযুক্ত করেন।

- প্রথম বাহিনীর সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. তখন ইয়ামামায় অবস্থান করছিলেন। আবু বকর রা. তাঁকে লিখে পাঠান—তিনি যেন দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ইরাকের ওপর চড়াও হন। চিঠিতে তাঁকে নির্দেশ দেন, 'তুমি ইরাকের ঢালু এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে আল-আবলা[২৬৯] থেকে অভিযান শুরু করবে। সেখানকার লোকজনকে প্রথমে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাদের আল্লাহর পথে ডাকবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তো ভালো, অন্যথায় জিজয়া-কর প্রদান করতে বলবে। এতে রাজি না হলে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে।'

  এ ছাড়া তিনি তাঁকে এই নির্দেশও দেন, কাউকে তোমার সঙ্গে যেতে বাধ্য করবে না। যারা ইতিপূর্বে ইরতিদাদের শিকার হয়েছিল, তারা যদিও ইসলামগ্রহণ করে, তবু তাদের সহায়তা নেবে না। যে এলাকার পাশ দিয়ে পথ চলবে, সেখানকার মুসলিমদের সেনাদলে যোগ করে নেবে।

  এরপর আবু বকর রা. খালিদ ইবনু ওয়ালিদের জন্য বাহিনী গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করেন।[২৭০]

- অপর বাহিনী ছিল ইয়াজ ইবনু গানামের নেতৃত্বাধীন। তিনি তখন নিবাজ[২৭১] ও হিজাজের মধ্যখানে অবস্থান করছিলেন। আবু বকর রা. তাঁকে লেখেন, 'তুমি উত্তর-পূর্বাঞ্চল হয়ে ইরাকে প্রবেশের চেষ্টা করো। আর মাসিখ[২৭২] থেকে অভিযান শুরু করো। এরপর ইরাকের উঁচুভূমি হয়ে খালিদের সঙ্গে যোগ দাও।' তিনি তাঁকে এ কথাও লিখে পাঠান, 'যারা তাদের বাড়িঘরে ফিরতে চায়, তাদের

---

২৬৯ 'আবলা' বসরার প্রাচীনতম একটি শহর। আরব উপসাগরে শাতিল আরবের নিকটবর্তী। এখানে ছিল কিসরার একটি সেনাক্যাম্প।

২৭০ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৪৭।

২৭১ এটি মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী একটি বস্তি।

২৭২ শাম-সীমান্তে ইরাকের নিকটবর্তী একটি জায়গা।

অনুমতি দেবে। জোরপূর্বক কাউকে সঙ্গী বানাবে না। কেউ যার ইচ্ছা করলে যুদ্ধে যাবে; অথবা তার বাড়ি ফিরে যাবে।'[২৭৩]

আবু বকর রা. অপর এক চিঠিতে খালিদ ও ইয়াজকে লেখেন, 'এরপর উভয়ে মিলে হিরার দিকে এগিয়ে যাবে। যে সেখানে আগে পৌঁছবে, সে তার সাথির আমির বিবেচিত হবে।' তিনি আরও লেখেন, 'তোমরা যখন হিরায় একত্রিত হবে এবং পারসিকদের সেনাঘাঁটিগুলো ধ্বংস করে দেবে, তখন তোমাদের একজন হিরার মুসলিমদের এবং নিজ সাথিদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেখানেই থেকে যাবে; আর অপরজন আল্লাহর শত্রু পারসিকদের মূল কেন্দ্র মাদায়েনের ওপর আক্রমণ করবে।'[২৭৪]

- মুসান্না ইবনুল হারিসা আবু বকরের কাছে গিয়ে তাঁকে পারস্যবাসীর বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিতে থাকেন। তাঁকে বলেন, 'আপনি আমাকে আমার জাতির প্রতি পাঠিয়ে দিন।' আবু বকর তা-ই করেন। মুসান্না ইরাকে ফিরেই যুদ্ধ শুরু করেন। এরপর তিনি তাঁর ভাই মাসউদ ইবনুল হারিসাকে আবু বকরের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠান। আবু বকর তখন মাসউদের মাধ্যমেই মুসান্নাকে লেখেন, 'আমি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে ইতিমধ্যেই ইরাকের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাবে। তাঁর সঙ্গ দেবে, সাহায্য করবে। তাঁর কোনো নির্দেশ অমান্য করবে না, সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবে না। কেননা, সে এমন ব্যক্তি, যাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর সাহাবিরা কাফিরদের প্রতি কঠোর; কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তাঁদের রুকু ও সিজদাবনত দেখতে পাবেন।" [সুরা ফাতহ : ২৯] যতক্ষণ সে তোমার সঙ্গে থাকবে, ততক্ষণ সে-ই তোমার আমির বিবেচিত হবে। যখন সে তোমার কাছ থেকে চলে যাবে, তখন তুমি তোমার আগের অবস্থানে থাকবে।'[২৭৫]

মাজউর ইবনু আদি নামে মুসান্নার এক স্বগোত্রীয় তাঁর থেকে পৃথক হয়ে আবু বকরের সঙ্গে আলাদাভাবে পত্রযোগাযোগ গড়ে তোলে। সে লিখে পাঠায়,

> *আমি বনু আজালের সদস্য। আমি কখনো ঘোড়ার পিঠ থেকে পৃথক হই না। একেবারে ভোরেই শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার সঙ্গে আছে আমার বংশের লোকজন, যাদের একজনই শতজনের চেয়ে ভারী।*

---

[২৭৩] *আল-ফান্নুল আসকারিয়িল ইসলামি* : ড. ইয়াসিন সুয়াইদ : ৮৩; *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬২।

[২৭৪] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৩।

[২৭৫] *আল-ওয়াসায়িকুস সিয়াসিয়া, হামিদুল্লাহ* : ৩৭১।

আমি এই দেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। আমি রণাঙ্গানের এক বাহাদুর। আমার রয়েছে এই ভূখণ্ডের ভৌগোলিক প্রচুর জ্ঞান। আপনি আমাকে ইরাকযুদ্ধের অধিনায়ক নিযুক্ত করুন। ইনশাআল্লাহ, আমি তা জয় করে ফেলব।[২৭৬]

এদিকে মুসান্না ইবনুল হারিসা শায়বানিও মাজউর সম্পর্কে আবু বকরের কাছে চিঠি পাঠান। তিনি লেখেন,

আমি আল্লাহর রাসুলের খলিফাকে জানাতে চাই, আমার গোত্রের শাখা আজালের মাজউর ইবনু আদি অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে আমার বিরোধিতায় নেমেছে। তাই এ ব্যাপারে আপনাকে অবহিত করে রাখা প্রয়োজন মনে করছি, যাতে আপনি যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

আবু বকর রা. মাজউর ইবনু আদির চিঠির জবাবে লেখেন,

আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। তুমি যা বলতে চেয়েছ, তা বুঝতে পেরেছি। তুমি তেমনই, যেমনটা চিঠিতে বলেছ। তোমার গোত্রও একটা উত্তম গোত্র। তোমার ব্যাপারে আমার নির্দেশ হচ্ছে, তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে চলে যাও। তাঁর সঙ্গেই অবস্থান করো। যতদিন ইরাকে থাকবে, ততদিন তাঁর সঙ্গেই থাকবে। যখন সে ইরাক থেকে রওনা হয়ে যাবে, তুমিও তাঁর সঙ্গে চলে আসবে।

আর মুসান্না ইবনুল হারিসাকে লেখেন,

তোমার চিঠির সঙ্গে আমার কাছে আজালির পক্ষ থেকেও চিঠি এসে পৌঁছেছে। চিঠিতে সে অনেক কিছুর আবদার করেছে। আমি তাকে এর জবাবে বলে দিয়েছি, যতক্ষণ-না তার ব্যাপারে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত দিচ্ছি, ততক্ষণ সে যেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সহযোগী হয়ে থাকে। আর এই চিঠির মাধ্যমে তোমার প্রতি আমার নির্দেশ হচ্ছে, খালিদ যতক্ষণ ইরাক থেকে অন্যত্র চলে না যায়, ততক্ষণ তুমি সেখানেই থাকবে। সে ইরাক ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তুমি পুনরায় তোমার পদ সামলে নেবে। জানি, তুমি এর চেয়েও অধিকতর যোগ্যতা ও মর্যাদার অধিকারী।[২৭৭]

উল্লিখিত বিবরণ থেকে আমরা বেশকিছু শিক্ষা ও উপদেশ নিতে পারি। যেমন :

---

[২৭৬] *মাজমুআতুল ওয়াসায়িকিস সিয়াসিয়া* : ৩৭২।

[২৭৭] প্রাগুক্ত : ৩৭২-৩৭৩।

চার. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে ইরাকের দিকে প্রেরণ

এ অভিযান ১২ হিজরিতে হয়েছিল। অপর এক বর্ণনায় ১২ হিজরির মুহাররামের কথা বলা হয়েছে।[২৭৮]

১. আবু বকরের রণকৌশল

আবু বকর রা. তাঁর উভয় সেনাপতি খালিদ ও ইয়াজ রা.-কে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, এটা তাঁর উন্নত সামরিক প্রজ্ঞা এবং যুদ্ধাভিজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। তিনি তাঁদের কৌশলপূর্ণ দক্ষতা ও সামরিক শিক্ষা দেন। ভৌগোলিক সুবিধা বিবেচনা করে দুই সেনাপতিকে দু-দিক থেকে ইরাকে প্রবেশের নির্দেশ দেন। তাঁর এ নির্দেশনা থেকে মনে হচ্ছিল, তিনি যেন হিজাজের সামরিক অপারেশনকক্ষে বসে নেতৃত্ব পরিচালনা করছিলেন। তাঁর সামনে যেন রয়েছে ইরাকের ভৌগোলিক মানচিত্র, যে মানচিত্রে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত রয়েছে রাস্তাঘাটসহ উঁচু-নিচু ভূমি। তিনি খালিদকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তিনি যেন ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে প্রবেশ করেন। এরপর ঢালুভূমি 'আবলা'য় গিয়ে পৌঁছান। আর ইয়াজকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, তিনি যেন ইরাকে উঁচুভূমির পূর্ব-উত্তর থেকে প্রবেশ করে মাসিখে যান। পাশাপাশি উভয়ের প্রতি সমন্বিত নির্দেশ ছিল, ইরাকের মধ্যাঞ্চলে গিয়ে তাঁরা যেন একত্রিত হন। সঙ্গে এই নির্দেশনা দিতেও ভুল করেননি যে, জোরপূর্বক কাউকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে যেন বাধ্য করা না হয়। তাঁর কাছে সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিষয়টা ছিল ঐচ্ছিক বিষয়।[২৭৯]

২. সামরিক গুরুত্ব বিবেচনায় 'হিরা'কে নির্বাচন

সামরিক কৌশল ও অবস্থানগত গুরুত্ব বিবেচনায় আবু বকর রা. হিরা দখলের অভিপ্রায় লালন করতেন। হিরার অবস্থান কুফা থেকে দক্ষিণে তিন মাইল দূরে এবং নাজাফ থেকে দক্ষিণ-পূর্বে অশ্বারোহীদের জন্য এক ঘণ্টার দূরত্বে অবস্থিত। এই মানচিত্রের ওপর যে-কেউ তাকালে প্রথম দৃষ্টিতেই হিরার অবস্থানগত গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে। হিরা যোগাযোগমাধ্যমের এমন এক কেন্দ্রস্থল ছিল, যেখানে এসে মিলিত হয়েছে সব পথ। এখান থেকে পূর্বে ফুরাত নদী হয়ে যেমন মাদায়েন যাওয়া যায়, তেমনি উত্তরে 'হায়ত' এবং 'আনবারে'ও পৌঁছা যায়। এ ছাড়া এখান থেকে একটা রাস্তা পশ্চিম দিকে একেবারে শাম পর্যন্ত পৌঁছেছে। একইভাবে অপর

---

২৭৮ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৪৭।

২৭৯ *আল-ফান্নুল আসকারিয়িল ইসলামি* : ৮৩-৮৪।

রাস্তা বসরার আবলায় গিয়ে মিলিত হয়েছে। এর বাইরে সাওয়াদের 'কিসকার' এবং দিজলার তীরবর্তী 'নুমানিয়া'র সঙ্গেও হিরার ভালো যোগাযোগব্যবস্থা ছিল। এসব বিবেচনায় হিরা দখলের গুরুত্ব সহজে অনুমেয়।

আবু বকর রা. উভয় সেনাপতির জন্য এই ভূখণ্ডকে টার্গেট বানানোর নির্দেশ দিতে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। হিরা ছিল ইরাকের কলিজাসদৃশ। সর্বোপরি এটা ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনের একেবারে নিকটবর্তী। পারস্যবাসীও হিরার গুরুত্ব সম্পর্কে ছিল সম্যক অবগত। তাই তারা এর দখল ধরে রাখতে প্রতিনিয়ত সেনাদল পাঠাচ্ছিল। তারা জানত, হিরা যাদের দখলে থাকবে, তাদের জন্য ফুরাতের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে যাবে। এ ছাড়া শামে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে হিরা মুজাহিদদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।[২৮০]

হিরা বিজয়ের লক্ষ্যে সেখান পর্যন্ত পৌঁছতে আবু বকরের পরিকল্পনা ছিল আধুনিক যুদ্ধ-পরিকল্পনার মতো। অর্থাৎ, চারদিক থেকে বিভিন্ন বাহিনীর মাধ্যমে অবরুদ্ধ করে নেওয়ার বাস্তব উদাহরণ। এ থেকে প্রমাণিত হয়, যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাক ও জাজিরাতুল আরবের বিভিন্ন অঞ্চলকে মুসলিম অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা আচমকা কোনো ঘটনা ছিল না।[২৮১] গবেষক ও তথ্যসন্ধানীরা দেখতে পাবে, আবু বকরের পরিকল্পনা ছিল উন্নত বিবেচনাবোধ ও দূরদর্শিতাসমৃদ্ধ। তাঁর বিস্ময়কর সেনাবিন্যাস, সেনাপতি ও বাহিনীকে সঠিক পথপ্রদর্শন, তাদের কর্তব্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ, তাদের সাহায্য প্রদান, তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও যুদ্ধের ময়দানে ভারসাম্য রক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদানসহ অন্যান্য বিষয়ে ছিল অনন্য প্রজ্ঞা ও অগাধ দক্ষতা। তিনি সবকিছু সেনাপতিদের ওপর চাপিয়ে দিতেন না। সামরিক কাজকর্মে তাঁদের স্বাধীনতা দিতেন। প্রতিপক্ষের শক্তি বিবেচনায় সময়-সুযোগমতো যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দিতে মোটেও কার্পণ্য করতেন না।[২৮২]

৩. মুসান্না ইবনুল হারিসার বিনয় ও নম্রতা

ইরাকযুদ্ধে মুসান্না ইবনুল হারিসার অবস্থান ছিল অত্যন্ত আলোকময়। তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে ইরাকে যুদ্ধরত ছিলেন। আবু বকর রা. বিষয়টা জানতে পেরে তাঁকে সেখানকার সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এটা হচ্ছে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ইরাকে পৌঁছার আগের

---

২৮০ *মাআরিকু খালিদিবনিল ওয়ালিদ জিদ্দাল ফুরুসি*, আবদুল জাব্বার আস সামরায়ি : ৩৫।

২৮১ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক*, নাজার আল হাদিসি ও খালিদ আল জুনাবি : ৪৫।

২৮২ *মাশাহিরুল খুলাফা ওয়াল উমারা আস-সিদ্দিক*, বিসাম আল আসালি : ১২৭।

কথা; কিন্তু তিনি যখন পারস্য সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ এই কাজের জন্য একমাত্র খালিদ ইবনুল ওয়ালিদই যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচিত হচ্ছিলেন। এ জন্য খালিদকে সেনাপতি নিযুক্ত করে মুসান্না রা.-কে লিখে পাঠান—'তুমি খালিদের সঙ্গে যোগ দেবে। তাঁর আনুগত্য করবে।' নির্দেশ পেয়েই মুসান্না কোনো দ্বিধা ছাড়াই দ্রুত খালিদের বাহিনীতে যোগ দেন। মুসান্নার এ অবস্থান সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। তাঁর বাহিনীর সেনাধিক্য এবং খালিদের আগে থেকে ইরাকযুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানের ব্যাপারটা তাঁকে প্রতারিত করতে পারেনি। নেতৃত্বের প্রশ্নে খালিদ থেকে তিনি যোগ্যতর ছিলেন, এমন অহমিকারও শিকার হননি।[২৮৩]

৪. জিহাদ বিষয়ে আবু বকরের সাবধানতা

আবু বকর রা. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও ইয়াজ ইবনু গানাম রা.-কে জোর দিয়ে এই নির্দেশ দেন—'আমার পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যারা মুরতাদবিরোধী যুদ্ধে অংশ নিয়েছে এবং নবিজির ইনতিকালের পর ইসলামে অটল থেকেছে, সেনাদলে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেবে। আর যারা কোনো একসময় ইরতিদাদের শিকার হয়েছিল এবং বর্তমানে ইসলামে অটল রয়েছে, ইরাকযুদ্ধে তাদের অংশ নেওয়ার সুযোগ দেবে না।' এ কারণে ইরাকযুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে এমন কেউ যোগদানের সুযোগ পায়নি।[২৮৪]

পরে যখন তারা ইসলামের ব্যাপারে একনিষ্ঠ হয়ে যায়, তখন পরবর্তী অভিযানসমূহে তারাও শরিক হয়। শীঘ্রই এ সংক্রান্ত বর্ণনা আসছে। আবু বকরের এ সিদ্ধান্ত ছিল যুদ্ধের ব্যাপারে সাবধানতার অনুপম স্বাক্ষর, যাতে দুর্বল বিশ্বাসীরা যুদ্ধে অংশ নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসীদের দুর্বল করে তোলা ও তাদের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা ছড়ানোর মাধ্যম হয়ে উঠতে না পারে। আবু বকর এ শিক্ষা খোদ রাসুল ﷺ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। নবিজির শিক্ষা ছিল, সেনাবাহিনীকে সব ধরনের ত্রুটি থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তাদের সবার লক্ষ্য হতে হবে এক ও অভিন্ন এবং সেটা হতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি। এভাবে ভিন্ন মত ও ভিন্ন লক্ষ্যের কারণে যে মতবিরোধ তৈরি হয়, তা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

আবু বকর রা. উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি অবলম্বনে আগ্রহী ছিলেন। এ ছাড়া সে সময় মুসলিমবাহিনীর জন্য সেনার প্রয়োজন বেশি থাকলেও এই পদক্ষেপ তাঁর অসীম ধৈর্য ও আল্লাহর ওপর ভরসার স্পষ্ট দলিল। কারণ, তাঁর কাছে মূল বিষয় ছিল নিষ্ঠা; সংখ্যাধিক্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় ছিল না।[২৮৫]

---

[২৮৩] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৩০।

[২৮৪] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৩।

[২৮৫] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৩১।

৫. মানুষের সঙ্গে নম্রতা এবং ইরাকের কৃষকদের ব্যাপারে উপদেশ

আবু বকর রা. খালিদ রা.-কে বলেছিলেন, 'পারসিকসহ সেখানে যেসব জাতিগোষ্ঠী বসবাস করে, তাদের আপন করে নাও।'[২৮৬] তাঁর এ কথার মাধ্যমে জিহাদের মূল লক্ষ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। মূলত, জিহাদ হচ্ছে একটি দাওয়াতি কাজ। এর লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। যেহেতু কাফির সরকারের মাধ্যমে মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছানো সম্ভব নয়, এ জন্য সেই সরকারকে হটিয়ে দেওয়া জরুরি; যাতে মানুষের কাছে ইসলামের আহ্বান তুলে ধরতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

সাহাবিদের যুদ্ধগুলোতে এই উদ্দেশ্য ছিল একেবারে স্পষ্ট। প্রথমে তাঁরা মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন। ইসলাম কবুল করে নিলে সর্বক্ষেত্রে তারা মুসলিমদের মতো সার্বিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। মুসলিমদের মতোই তাদের ওপর ইসলামের বিধিবিধান আরোপ হতো। পক্ষান্তরে ইসলামি শাসনব্যবস্থা মেনে নিয়েও যদি কুফরে অটল থাকত, তাহলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জিজয়া আদায় করতে হতো। জিজয়া আদায়ের ফলে তাদের জানমালের নিরাপত্তা মুসলিমদের দায়িত্বে চলে আসত। যদি তা-ও গ্রহণ না করত, তাহলে আল্লাহর বাণী উঁচু না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া হতো।[২৮৭]

উভয় সেনাপতির প্রতি আবু বকরের নির্দেশ ছিল, তাঁরা যেন ইরাকের কৃষক ও সাওয়াদবাসীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করেন। এ থেকেই বোঝা যায়, তিনি মানুষের হিদায়াত এবং ঘরবাড়ি ও সম্পদের নিরাপত্তার ব্যাপারে কতটা দরদি ও আগ্রহী ছিলেন। আপনারা নিশ্চয় জেনে থাকবেন যে, কোনো শহর ও জনপদই সরকার-ব্যবস্থাপনার অবর্তমানে টিকে থাকতে পারে না। একইভাবে কৃষি হচ্ছে সম্পদের উৎস। মানুষের জীবনের সঙ্গে কৃষির রয়েছে গভীর সম্পৃক্ততা।[২৮৮]

৬. 'সে বাহিনী পরাজিত হতে পারে না, যে বাহিনীতে ওর মতো লোক রয়েছে'

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইরাক যাওয়ার পথে আবু বকরের কাছে সাহায্য চাইলে তিনি কা'কা ইবনু আমর তামিমিকে তাঁর সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি বিক্ষিপ্ত একটা বাহিনীর নেতার সাহায্যে মাত্র একজনকে পাঠালেন?' উত্তরে তিনি বলেন, 'সে বাহিনী পরাজিত হতে পারে না, যে বাহিনীতে ওর (কা'কা ইবনু

---

[২৮৬] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৫৯।

[২৮৭] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৩০।

[২৮৮] *তারিখুদ দাওয়া ইলাল ইসলাম* : ৩৪২।

আমর) মতো লোক রয়েছে।'[২৮৯] এ ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টির উদাহরণ। তাঁর এ নির্বাচনের যথার্থতা ইরাকের পরবর্তী যুদ্ধসমূহে প্রকাশ পেয়েছিল। আবু বকর রা. মানুষ এবং তাদের মধ্যকার শক্তি ও নানাবিধ যোগ্যতা অনুধাবনের ক্ষেত্রে অন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন।[২৯০]

পাঁচ. ইরাকে খালিদের যুদ্ধ

খালিদ রা. মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধাভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ মাত্র ২ হাজার সেনার ছোট্ট এক বাহিনী নিয়ে ইরাকে পৌঁছান। সেখানে পৌঁছে রাবিআ গোত্র থেকে ৮ হাজার সেনা সংগ্রহ করেন। এরপর ইরাকে অবস্থানরত তিনজন আমিরের কাছে চিঠি লেখেন, যাঁদের কাছে যুদ্ধ করার মতো যথেষ্ট সেনা ছিল। তাঁরা ছিলেন মাজউর ইবনু আদি আজালি, সুলমা ইবনুল কাইন তামিমি এবং হারমালা ইবনু মুরাইত তামিমি। তাঁরা খালিদের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ নিজ সেনাসহ তাঁর বাহিনীতে যোগ দেন। তাঁদের ও মুসান্নার সেনাসংখ্যা মিলে এ বাহিনীর সংখ্যা ৮ হাজারে পৌঁছায়। এভাবে মুসলিমবাহিনীর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮ হাজার।[২৯১] এরপর তাঁরা এই সিদ্ধান্তে যান যে, সবাই 'আবলা' প্রান্তরে সমবেত হবেন।[২৯২]

ইরাকের দিকে রওনা হওয়ার আগে খালিদ হুরমুজকে সতর্ক করে বার্তা পাঠান,

> *হমদ ও সালাতের পর,*
>
> *ইসলামগ্রহণ করে নাও, নিরাপদ থাকবে। অথবা নিজের ও জাতির নিরাপত্তাপ্রত্যাশায় সন্ধি করে জিজয়া প্রদানে সম্মত হয়ে যাও। অন্যথায় পরিণতির জন্য নিজেকে ছাড়া কাউকে দায়ী করো না। আমি এমন লোকদের নিয়ে এগিয়ে আসছি, যাদের কাছে মৃত্যু এতটাই লোভনীয়, যেমন লোভনীয় তোমাদের কাছে তোমাদের জীবন।*[২৯৩]

এই সতর্ক-সংকেত ছিল মূলত মনস্তাত্ত্বিক একটা যুদ্ধ, যাতে হুরমুজ ও তার বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। শত্রুর কাছাকাছি পৌঁছেই খালিদ রা. সেনাবাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করেন। দলপ্রধানদের নির্দেশ দেন, 'প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে যাও।' তিনি সবাইকে একপথে রাখেননি, যাতে

---

[২৮৯] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৩।

[২৯০] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১২৯।

[২৯১] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৩।

[২৯২] *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক*, খালিদ আল জুনাবি, নাজার আল হাদিসি : ৪৬।

[২৯৩] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৪।

যুদ্ধের প্রাথমিক মূলনীতি তথা 'নিজ সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা' বিঘ্নিত না হয়। প্রথম বাহিনীর নেতা ছিলেন মুসান্না ইবনুল হারিসা, দ্বিতীয় বাহিনীর আদি ইবনু হাতিম তাই। তাঁদের পরে ছিলেন খোদ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। তিনি হাজিরে[২৯৪] উভয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার অঙ্গীকার করেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, সেখানে গিয়েই শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন।[২৯৫]

ছয়. জাতুস সালাসিলযুদ্ধ ও হুরমুজকে হত্যা

এদিকে হুরমুজ খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের রওনা এবং মুসলিমদের হাজিরে জমায়েত হওয়ার পরিকল্পনা-সংবাদ জেনে যায়। বিষয়গুলো জানার পর সে তাদের আগেই সেখানে পৌঁছে যায় এবং তার অগ্রবাহিনীতে কাবাজ ও আনুশজান নামের দুই সেনাপতিকে নিযুক্ত করে। খালিদ শত্রুবাহিনী হাজির পৌঁছার সংবাদ জানতে পেরে হাজিরের পরিবর্তে কাজিমার দিকে মোড় ঘুরিয়ে নেন; কিন্তু হুরমুজ সেখানেও তাঁর আগে পৌঁছে যায়। সেখানে পৌঁছেই সে পানির দখল নিয়ে নেয় এবং তার বাহিনীকে সুবিধাজনক জায়গায় মোতায়েন করে রাখে। খালিদ সেখানে পৌঁছলে তাঁকে এমন জায়গায় শিবির স্থাপন করতে হয়, যেখানে পানি ছিল না। তিনি তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন, 'নিজেদের মালসামানা নামিয়ে নাও। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই পানির ওপর দখল প্রতিষ্ঠা করতে হবে তোমাদের। আল্লাহর শপথ, পানি তারাই পাবে, যারা বেশি ধৈর্যধারণকারী এবং আল্লাহর কাছে সম্মানিত বিবেচিত।'[২৯৬]

এরপর মুসলিমবাহিনী বাহন থেকে তাদের মালসামানা নামিয়ে রাখে। অশ্বারোহীরা নিজ নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকেন আর পদাতিকরা শত্রুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝটিকা হামলা চালান। আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহে মুসলিমবাহিনীর ওপর দয়া করেন। এর মধ্যে আকাশ বাদলে ছেয়ে যায় এবং একসময় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। মুসলিমবাহিনী তৃপ্ত হয়ে পানি পান করে। তাঁদের শক্তি ফিরে আসে। আল্লাহ কর্তৃক তাঁর প্রিয় বান্দাদের সঙ্গে এমন দয়ার আচরণের অসংখ্য নজির বিদ্যমান।

মুসলিমরা হুরমুজের মোকাবিলা করেন। হুরমুজের জঘন্য আচরণ ছিল প্রবাদপ্রতিম। সে খালিদের জন্য চক্রান্তের একটা ফাঁদ পাতে। তার প্রতিরক্ষাবাহিনীকে বলে, 'আমি খালিদকে দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছি। সে মাঠে বেরিয়ে এলে তোমরা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলবে।' এই পরিকল্পনা সাজিয়ে হুরমুজ সেনাদল থেকে

---

[২৯৪] 'হাজির' বসরা থেকে চার মাইল দূরের একটি পানির ঝরনা। *আল-মুজাম,* ইয়াকুত : ২/২৭৭।

[২৯৫] *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক,* খালিদ আল জুনাবি : ৪৬।

[২৯৬] *আল-কামিল,* ইবনু আসির : ২/৫১; *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৫।

বেরিয়ে এসে খালিদকে দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বান জানায়। খালিদ বেরিয়ে এসেই তাকে কাবু করে ফেলেন। ইতিমধ্যে হুরমুজের প্রতিরক্ষাদল আচমকা হামলে পড়ে তাঁকে তাদের ঘেরাওয়ে নিয়ে নেয়; কিন্তু এমতাবস্থায়ও খালিদ হুরমুজকে হত্যা করে ফেলেন।

এদিকে কা'কা রা. পুরো দৃশ্যপটের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। যখনই হুরমুজের বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে পান, তখনই অশ্বারোহী একটা বাহিনী নিয়ে তার প্রতিরক্ষাবাহিনীর ওপর ক্ষুব্ধ আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর প্রচণ্ড হামলা ওদের চিরদিনের মতো শুইয়ে রাখে।[২৯৭] এরপর পুরো মুসলিমবাহিনী কা'কার পেছনে পেছনে ঝড়ের বেগে শত্রুদের ওপর চড়াও হয়। পারস্যবাহিনী তখন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। এ ছিল প্রথম সেই যুদ্ধ, যেখানে কা'কা সম্পর্কে আবু বকরের অন্তর্দৃষ্টি সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল। এই কা'কা সম্পর্কেই তিনি বলেছিলেন, 'সে বাহিনী পরাজিত হতে পারে না, যে বাহিনীতে ওর মতো লোক রয়েছে।'[২৯৮]

এ যুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. তাঁর বীরত্ব ও দুঃসাহসের মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি নিজ হাতে পারস্য-অধিপতির ভবলীলা সাঙ্গ করেন। যে বাহিনী তাঁকে হত্যা করতে এসেছিল, তারা তাদের অধিপতিকে বাঁচাবে দূরে থাক, নিজেরাও বাঁচতে পারেনি। খালিদ তাদের বিরুদ্ধে লড়াইরত থাকতেই কা'কা সেখানে পৌঁছে যান এবং মুহূর্তেই তাদের মৃত্যুমুখে পৌঁছে দেন। পারসিকরা মাঠ থেকে পালিয়ে না যাওয়ার সংকল্পে একে অপরকে শিকলে জড়িয়ে নিয়েছিল; কিন্তু বাহাদুর সিংহগুলোর সামনে কোনো সংকল্পই হালে পানি পায়নি। তারা নিজেদের শিকলে বেঁধে নিয়েছিল বলেই যুদ্ধটি 'জাতুস সালাসিল' নামে প্রসিদ্ধি পায়।[২৯৯]

এ যুদ্ধে মুসলিমবাহিনী ১ হাজার উট-বোঝাই পরিমাণ গনিমত পায়। এরপর খালিদ রা. হিরার আশপাশের কেল্লাগুলো জয় করতে ছোট ছোট দল পাঠান। এভাবে মুসলিমবাহিনী গনিমত হিসেবে বিপুল সম্পদ অর্জন করে। খালিদ রা. যুদ্ধ থেকে দূরে থাকা কৃষকদের সঙ্গে কোনো প্রকার দুর্ব্যবহার করেননি; বরং সিদ্দিকে আকবরের নির্দেশমতো তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেন। তাদেরকে তাদের ভূখণ্ডে জমির মালিকানাসহ থাকতে দেন, যাতে তাদের কোনো কষ্টের মুখোমুখি হতে না হয়। যারা ইসলামগ্রহণ করেছিল, তাদের জন্য জাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেন; আর যারা নিজেদের ধর্মে অটল ছিল, তাদের ওপর জিজয়া-কর আরোপ করেন। তবে সে জিজয়া ছিল পরিমাণে এতটাই অল্প, যা তাদের স্বজাতির ভূপতি কর্তৃক আদায়কৃত খাজনা থেকেও কম ছিল।

---

[২৯৭] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৫।

[২৯৮] প্রাগুক্ত : ৪/১৬৩।

[২৯৯] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৩৩; *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৫।

যারা পারস্যের জমিদার ছিল, তাদের জমি ছিনিয়ে নেওয়া হয়নি। তবে সেসব জমিতে কর্মরত মজুরদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ ব্যবহারের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে মানুষের মধ্যে এই বোধ জাগে যে, এই বিজয়ের কারণে সাম্য ও মানবিক ভ্রাতৃত্বের এক বন্ধ অর্গল তাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। খালিদ রা. গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ খলিফা আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে বাকিটা মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আবু বকরের কাছে যা পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে হুরমুজের একটা টুপিও ছিল। তবে আবু বকর খালিদের উত্তম কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ টুপিটা তাঁকে উপহার হিসেবে ফেরত পাঠিয়ে দেন।[৩০০]

হুরমুজের সেই টুপির মূল্য ছিল ১ লাখ মুদ্রা। এটা ছিল মূল্যবান পাথরখচিত টুপি। পারসিকদের টুপিগুলো হতো তাদের বংশীয় মর্যাদার প্রতীক। যে বংশ মর্যাদার উচ্চাসনে থাকত, তাদের টুপির মূল্য হতো ১ লাখ। হুরমুজ ছিল সেই শ্রেণির একজন, যে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে শীর্ষস্থানে অবস্থান করত।[৩০১]

সাত. মাজার (সানি) যুদ্ধ

হুরমুজ খালিদের চিঠিটা কিসরার দরবারে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিসরা হুরমুজের সাহায্যে 'কারিনে'র নেতৃত্বে একটা বাহিনী পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু হুরমুজ মুসলিমবাহিনীকে সাধারণ একটা বাহিনী মনে করে কারিন আসার আগেই আক্রমণ চালিয়ে বসে। ফলে বিপর্যয় ও ধ্বংসই হয় তার ললাটলিখন। তার পরাজিত বাহিনী পালিয়ে কারিনের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। তারা একত্রিত হয়ে একে অপরকে উসকানি দিতে থাকে। একপর্যায়ে সবাই মিলে মাজারে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়। এদিকে খালিদ রা. মুসান্না ইবনুল হারিসা ও তাঁর ভাই মুআন্নাকে তাদের পেছনে লাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা উভয়ে বেশ কয়েকটা দুর্গ করায়ত্ত করে নিয়েছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পারসিক বাহিনীর আগমন-সংবাদ জানার পরপরই খালিদকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। খালিদও বিষয়টা আবু বকরকে জানান। তারা যাতে আচমকা হামলা করতে না পারে, এ জন্য যুদ্ধপ্রস্তুতিও শুরু করেন।

মাজার নামক স্থানে শত্রুবাহিনীর সঙ্গে মুসলিমদের সংঘাত বাঁধে। জাতুস সালাসিলে পরাজয়ের কারণে তারা এমনিতেই ছিল উত্তপ্ত। তাদের নেতা কারিন ময়দানে নেমে খালিদকে দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বান জানায়। খালিদ ময়দানে বেরিয়ে আসেন; কিন্তু তাঁর আগেই মাকিল ইবনু আমাশ ইবনু নাব্বাশ কারিনকে হত্যা করে ফেলেন। কারিন তার

---

[৩০০] *আস-সিদ্দিক আওয়ালুল খুলাফা* : ১৩১।

[৩০১] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৬৬।

ডান বাহুতে কাবাজ; আর বাম বাহুতে আনুশজানকে অধিনায়ক নিযুক্ত করে রেখেছিল। এরা জাতুস সালাসিলযুদ্ধেও অগ্রবাহিনীর নেতৃত্বে ছিল। সেই যুদ্ধে পরাজয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল তাদের। তাদের মোকাবিলায় দুই মুসলিম বাহাদুর দাঁড়িয়ে যান। কাবাজকে হত্যা করেন আদি ইবনু হাতিম তাই; আর আনুশজানকে আসিম ইবনু আমর তামিমি।

উভয় নেতা নিহত হওয়ার পরপরই শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। পরপর তিন নেতার মৃত্যুতে পারসিক বাহিনী এমনিতেই নেতৃত্বহারা হয়ে পড়েছিল। ফলে মূল যুদ্ধ শুরু হলে তারা নিজেদের সামনে কেবল অন্ধকারই দেখতে পাচ্ছিল। এই যুদ্ধে তাদের ৩০ হাজার সেনা মারা যায়। বাকিরা কোনোমতে নৌকায় চড়ে পালাতে সক্ষম হয়। পানিতে মুসলিমরা তাদের ধাওয়া করতে পারেননি। খালিদ রা. মাজারে অবস্থান করে পারস্যবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া গনিমত মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তা ছাড়া যুদ্ধে যারা গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল, গণিমতের এক-পঞ্চমাংশ থেকে তাদের বিশেষ সম্মাননাপুরস্কারও দান করেন। আর বাকি খুমুস (গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ) মদিনায় পাঠিয়ে দেন।[৩০২]

আট. ওয়ালজার যুদ্ধ

১. যুদ্ধপরিকল্পনা ও আক্রমণ

মাজারে পারস্যবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ শুনে কিসরা 'আন্দারজাগার'-এর নেতৃত্বে এক সুবিশাল বাহিনী এবং তার পেছনে পেছনে বাহমান জাদবিয়ার নেতৃত্বে আরেকটা বড় বাহিনীও পাঠায়। আন্দারজাগার মাদায়েন থেকে বেরিয়ে প্রথমে কাসকারে আসে, এরপর সেখান থেকে ওয়ালজায় পৌঁছায়। এদিকে বাহমান জাদবিয়া সাওয়াদের মধ্যাঞ্চল থেকে বেরিয়ে পড়ে। জাদবিয়ার উদ্দেশ্য ছিল, সে মুসলিমবাহিনীকে তার ও আন্দারজাগারের বাহিনীর মধ্যখানে ঘেরাও করে ফেলবে। সে রাস্তা থেকে প্রচুর স্বেচ্ছাসেবক এবং ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সমর্থ হয়। এভাবে পারসিকরা ওয়ালজায় একত্রিত হয়। আন্দারজাগার তার বাহিনীর বিশালতার অহমিকায় আক্রান্ত হয়ে খালিদের মোকাবিলার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে খালিদ রা. যখন পারসিকদের ওয়ালজায় এসে সমবেত হওয়ার সংবাদ পান, তখন তিনি বসরার পাশে সানি অঞ্চলে ছিলেন। তিনি তখন তিন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়াটাই উপযুক্ত মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এভাবে আকস্মিক হামলার মাধ্যমে তাদের দিশেহারা করে তুলতে পারবেন।

---

[৩০২] প্রাগুক্ত : ৪/১৬৮; *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৩৪।

সুতরাং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পেছনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে সুওয়াইদ ইবনু মুকাররিনকে নিযুক্ত করেন। তাঁকে খণ্ডবাহিনী নিয়ে হাফিরে অবস্থানের নির্দেশ দেন। এর পর নিজের বাহিনীকে নিয়ে ওয়ালজার দিকে এগিয়ে যান। সেখানে পৌঁছে পুরো অঞ্চলের অবস্থানগত বিষয়ের ওপর একটা পর্যালোচনা চালান। তিনি জানতে পারেন, যুদ্ধের জায়গাটা সমতল এবং যুদ্ধের জন্য উপযোগীও বটে। সেখানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা সম্ভব। তাই ইতিপূর্বে তিন দিক থেকে আক্রমণ চালানোর যে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন, তা বাস্তবায়ন করেন। দুটি খণ্ডবাহিনীর একটিকে পারস্যবাহিনীর একপ্রান্ত এবং আরেকটিকে পেছন দিক থেকে হামলার জন্য পাঠিয়ে দেন। একসময় যুদ্ধ শুরু হয়ে উভয় পক্ষে তুমুল লড়াই চলতে থাকে। খালিদ সামনের দিক থেকে পারস্যবাহিনীকে চেপে ধরেন। আর উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষারত খণ্ডবাহিনীও যথাসময়ে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে চোখে অন্ধকার দেখা পারস্যবাহিনী অল্পক্ষণেই পরাজিত হয়ে পালাতে থাকে। আন্দারজাগার তখন অল্পসংখ্যক সেনাসহ পালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু পথে তারা পিপাসার তীব্রতায় মারা পড়ে।[৩০৩]

২. যুদ্ধ সমাপ্তির পর খালিদের ভাষণ

যুদ্ধ সমাপ্তির পর খালিদ রা. তাঁর বাহিনীর উদ্দেশে তেজোদীপ্ত এক ভাষণ দেন। ভাষণে আরবের পরিবর্তে আজমের দিকে তাদের আগ্রহী করে তোলার চেষ্টা চালান। তিনি বলছিলেন,

> আমরা কি এখানে রকমারি খাদ্যদ্রব্যের বিপুল সমাহার দেখতে পাচ্ছি না? আল্লাহর শপথ, যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ এবং ইসলামের দিকে আহ্বান আমাদের ওপর ফরজ না-ও হতো, তবু বুদ্ধিমানের কাজ এটাই ছিল—আমরা এ ভূখণ্ড অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালাই; আর ক্ষুধা-পিপাসা তাদের জন্য রেখে দিই, যারা আমাদের সঙ্গে বেরোতে রাজি নয়।

খালিদ রা. গনিমতের পাঁচ ভাগের চার অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে এক অংশ মদিনায় আবু বকরের কাছে পাঠিয়ে দেন। এরপর বিদ্রোহী লড়াইকারীদের পরিবার-পরিজনদের বন্দি করে কৃষকদের ওপর জিজয়া-কর আবশ্যক করেন।[৩০৪]

খালিদের ভাষণ থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, আরবরা ছিল অন্ধকারে। তারা পরকালের ব্যাপারে ছিল অজ্ঞ। আর পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে পার্থিব সমৃদ্ধি অর্জনেও অন্যান্য

---

৩০৩ *আল-কামিল*, ইবনু আসির : ২/৫২; *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, খালিদ আল জুনাবি : ৪৮।

৩০৪ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৩৫০।

জাতি থেকে পিছিয়ে ছিল। খালিদ রা. মূলত এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন—'আমরা পরকালপ্রত্যাশী। আমরা একটা মহান উদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়িয়েছি। এর দিকে মানুষকে আহ্বান জানাচ্ছি। এই লক্ষ্যেই জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছি। যদি মেনেও নিই, এ মহান উদ্দেশ্য আমাদের মৌলিক উদ্দেশ্য নয়, তথাপি বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে, অন্তত পার্থিব জীবনমান সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এখানে যুদ্ধ করি।' খালিদের এ কথার উদ্দেশ্য কখনোই মহান উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পদ অর্জনকে মিলিয়ে ফেলা ছিল না; বরং তিনি একে কল্পনাগত অবস্থা হিসেবে বর্ণনা করছিলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, যখন বিবেকের চাহিদায় আমরা জাগতিক জীবনের সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এখানে যুদ্ধ করতে পারি, তাহলে পরকালের কল্যাণের জন্য কেন করব না?

এ ধরনের কথায় সাধারণত সাহস বৃদ্ধি পায়। সংকল্প দৃঢ় হয়। চেতনার স্ফুরণ ঘটে। শক্তি উছলে ওঠে। এ কারণেই মুমিনরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য নিজেদের পুরো শক্তিসামর্থ্য ও জিনিসপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়।[৩০৫]

৩. ওয়ালজাযুদ্ধে খালিদের বীরত্ব

এক বর্ণনামতে, খালিদ রা. এই যুদ্ধে এমন ব্যক্তির মোকাবিলায় দ্বৈতযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, যাকে হাজার মানুষের সমান শক্তিধর মনে করা হতো; কিন্তু তিনি তাকে হত্যা করতে সমর্থ হন। তাকে হত্যার পর তার গায়ে হেলান দিয়ে নিজের জন্য খাদ্য চেয়ে পাঠান।[৩০৬] কাজটা মূলত পারসিকদের অপমানিত করতে করেছিলেন। এর দ্বারা তাদের অহংকার ও দম্ভ চূর্ণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।[৩০৭]

নয়. উল্লাইসযুদ্ধ ও আমগিশায়া

এ যুদ্ধে কতিপয় আরব খ্রিষ্টান মুসলিমদের বিরুদ্ধে পারসিকদের সহায়তা করে। এদের নেতা ছিল আবদুল আসওয়াদ আজালি; আর পারসিকদের নেতা ছিল জাবান। তাকে বাহমান জাদবিয়া এই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, সে যেন আগে আক্রমণে না যায়। খালিদ রা. আরব খ্রিষ্টান ও হিরার পার্শ্ববর্তী অমুসলিম আরবদের সেনাসমাবেশের সংবাদ পেয়েই তাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। তিনি তাদের ওপর হামলার মনস্থ করেছিলেন; কিন্তু তারা যে পারস্যবাসীর সহযোগী হয়ে গেছে, বিষয়টা জানতে পারেননি।

---

[৩০৫] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৩৯।

[৩০৬] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৩৫০।

[৩০৭] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৩৮।

১. 'যতক্ষণ-না ওদের রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা নিবৃত্ত হব না'

মুসলিমবাহিনী সেখানে পৌঁছার পর জাবান তার বাহিনীকে তাঁদের ওপর চড়াও হওয়ার নির্দেশ দেয়; কিন্তু তারা খালিদকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। খালিদ রা. তাদের খাবারের সুযোগ না দিলে তুমুল যুদ্ধ বেঁধে যায়। শত্রুরা উদ্দীপ্ত হয়ে লড়াই করার কারণ ছিল—তারা আশা করছিল, বাহমান জাদবিয়া বিশাল বাহিনী নিয়ে তাদের সহায়তায় আসছে। মুসলিমরাও দৃঢ়পায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। খালিদ তখন শপথ করে বলেন, 'আল্লাহ, আপনি যদি ওদের বাহুগুলো আমাদের কবজায় দিয়ে দেন, তাহলে যতক্ষণ-না ওদের রক্তের নদী প্রবাহিত হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা নিবৃত্ত হব না।'

লড়াইয়ে আল্লাহ মুসলিমদের বিজয় দান করেন। তাদের বাহুগুলো মুসলিমদের কবজায় চলে আসে। খালিদ রা. ঘোষণা দেন, 'ওদের বন্দি করো, বন্দি করো। শুধু তাকেই হত্যা করো, যে বাধা সৃষ্টি করে।' অশ্বারোহীরা দলে দলে লোকদের হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিল। তিনি কয়েকজনকে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করে রেখেছিলেন, যাতে তারা ওদের গর্দানগুলো উড়িয়ে নদীতে ফেলে দেয়। এক দিন ও এক রাত এমন করেই কেটে যায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। একপর্যায়ে ধাওয়া করতে করতে তারা নাহরাইন পর্যন্ত পৌঁছে যান। আর একই দূরত্বে অবস্থিত উল্লাইসের চারদিকে তাদের হত্যা করা হতে থাকেন।

২. খালিদের শপথ পূরণ

এমতাবস্থায় কা'কা রা. খালিদের কাছে এসে বলেন, 'আপনি যদি পৃথিবীর সমুদয় মানুষকে এখানে এনে হত্যা করেন, তবু এখানে রক্তের ধারা প্রবাহিত হবে না, যতক্ষণ-না নদীকে প্রবাহিত হওয়া থেকে এবং ভূমিকে রক্ত চুষে নেওয়া থেকে বিরত রাখতে পারছেন। ওদের রক্ত জমাটবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আপনি শপথ পূরণ করতে চাইলে ওদের রক্তের ওপর পানি ছড়িয়ে দিন।' কা'কার পরামর্শে খালিদ তা-ই করেন। শপথ পূর্ণ করার নিমিত্তে নদীতে তিনি যে বাঁধ দিয়ে দিয়েছিলেন, বিজয়ের পর তা পুনরায় খুলে দেন। ফলে নদী দিয়ে তাজা রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। এ কারণেই ওই নদীর নাম হয় নাহরুদ-দাম বা 'রক্তনদী'।

শত্রুবাহিনী পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর মুসলিমবাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা থেকে নিবৃত্ত হয়। এরপর তাদের শিবিরে প্রবেশ করে। খালিদ রা. তখন খাবারের পাশে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'আমি তোমাদের ইচ্ছামতো এই খাবার খাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি।' এরপর বলেন, 'রাসুল ﷺ যখন পাকানো খাবারের কাছে যেতেন, তখন তা

লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন।' তখন মুসলিমরা বিকালের খাবারের জন্য বসে পড়েন। যারা ইতিপূর্বে পাতলা রুটির কথা জানতেন না, জিজ্ঞেস করেন—'এই পাতলা সাদা বস্তুগুলো কী?' যারা জানতেন তারা একটু কৌতুক করে বলেন, 'আপনারা কি রাকিকুল আইশের (সমৃদ্ধি) কথা জানেন না?' তারা বলেন, 'হ্যাঁ।' তারা বলেন, 'এটা সেই বস্তু।' এ জন্যই এই রুটির নাম পড়ে যায় 'রুকাক' মানে পাতলা রুটি। আরবরা ইতিপূর্বে একে কুরি বলত।[৩০৮]

খালিদ রা. উল্লাইস থেকে অবসর হওয়ার পর আমগিশায়া যান। সেখানকার লোকজন জায়গাটা খালি করে সুওয়াইদ এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল। তিনি সেখানে পৌঁছে শহরটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলিমরা সেখানে এত বেশি গনিমত লাভ করেন, যা ইতিপূর্বে কোথাও তাঁরা অর্জন করেননি। প্রত্যেক অশ্বারোহী এখানে দেড় হাজার করে দিরহাম পান। এটা ছিল সেই সম্পদ ছাড়া, যা উত্তম কাজের পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়েছিল। মদিনায় খলিফার দরবারে এখানকার গনিমতের এক-পঞ্চমাংশসহ বিজয়ের সংবাদ পৌঁছলে খালিদসহ মুসলিমদের অসাধারণ বীরত্বের ওপর আনন্দ প্রকাশ করে খলিফা বলে ওঠেন, 'হে কুরাইশ, তোমাদের সিংহ শত্রুর সিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! সে তার ওপর বিজয়ী হয়ে তার শরীরের মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে! নারীরা কি খালিদের মতো সন্তান জন্মাতে অক্ষম হয়ে গেছে?'

খালিদ রা. বিজয়ের সংবাদটি বনু আজালের একজনের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন ঝানু বাহাদুর এবং রাস্তাঘাট সম্পর্কে সম্যক অবহিত। উল্লাইসের বিজয়, গনিমতের সম্পদের পরিমাণ, বন্দিদের সংখ্যা, খুমুসের অংশ, উত্তম কর্মসম্পাদনকারীদের পুরস্কার, সবকিছু সম্পর্কে তিনি তাঁকে অবহিত করেন। সংবাদবাহক খলিফার দরবারে গেলে তিনি তাঁর বাহাদুরি ও সংবাদপ্রদানের যথাযথ পদ্ধতি অনুধাবন করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোমার নাম কী?' তিনি বলেন, 'জান্দাল।' আবু বকর বলেন, 'বেশ উত্তম।'

ইসামের সত্তা ইসামকে সরদার বানিয়ে দিয়েছে
এবং তাকে পার্শ্বপরিবর্তন ও সামনে এগোতে অভ্যস্ত বানিয়েছে।

আবু বকর রা. খুশি হয়ে জান্দালকে কয়েদিদের থেকে একটা দাসী উপহার দেন। ওই দাসীর গর্ভে তাঁর এক সন্তান হয়েছিল।

৩. 'হে কুরাইশ, তোমাদের সিংহ শত্রুর সিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে!'

---

[৩০৮] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৭৩।

খালিদ রা. সম্পর্কে আবু বকর সিদ্দিকের উক্তি—'হে কুরাইশ, তোমাদের সিংহ শত্রুর সিংহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে! সে তার ওপর বিজয়ী হয়ে তার শরীরের মাংস ছিঁড়ে নিচ্ছে! নারীরা কি খালিদের মতো সন্তান জন্মাতে অক্ষম হয়ে গেছে?' এটা মূলত খালিদের আভিজাত্য ও বিশাল খিদমতের স্বীকৃতি।[৩০৯] এ ছাড়া এটা বিপন্ন মুহূর্তে উত্তম কৃতিত্ব প্রদর্শন, অসীম সাহস এবং মর্যাদাদানের প্রচেষ্টা। এর মাধ্যমে দুর্বলচিত্তদের অনুরূপ দুঃসাহসী ভূমিকা রাখার প্রতি উদ্দীপ্ত করাও উদ্দেশ্য ছিল, যাতে তাঁরা উদ্দীপ্ত হয়ে একজন অপরজন থেকে এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করে।[৩১০]

আবু বকর রা. মানুষ চেনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মুখ দিয়ে খালিদের প্রশংসায় এমন কথা বের হওয়া ছিল তাঁর জন্য বড় এক সম্মান ও স্বীকৃতি। ইসলামে এই সম্মান কেবল তিনিই অর্জন করতে পেরেছিলেন। খলিফায়ে আজম আবু বকর রা. দক্ষতা, বীরত্ব ও দুঃসাহসে কাউকে খালিদের সমকক্ষ মনে করতেন না। বাহাদুরি ও যোগ্যতায় তাঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় কেউ ছিলেন বলে বিশ্বাস করতেন না। খালিদের প্রতি আবু বকরের এই মনোভাব রাখাই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল।[৩১১]

দশ. হিরা বিজয়

১. হিরা অভিমুখে খালিদের যাত্রা

হিরার শাসক আমগিশায়া র সংবাদ পেলে তার বিশ্বাস জন্মায় যে, এবার অবশ্যই খালিদ হিরার দিকে ছুটে আসবেন। তাই সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। তার ছেলের নেতৃত্বে একটা অগ্রবর্তী বাহিনী পাঠিয়ে পেছনে পেছনে নিজেও এগিয়ে আসতে থাকে। হিরা-অধিপতি তার ছেলেকে বলে দিয়েছিল, 'তুমি প্রথমেই ফুরাতের স্রোতোধারা বন্ধ করে দেবে। এতে মুসলিমদের হাতে থাকা নৌকাগুলো অকেজো হয়ে পড়বে।' ছেলে পিতার নির্দেশ বাস্তবায়ন করলে মুসলিমরা আচমকা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়েন। তাঁরা এ অবস্থায় বিচলিত হয়ে স্থানীয় কৃষকদের কাছে বাঁধ খুলে দেওয়ার কথা বলেন, যাতে তারা ও মুসলিমরা উভয়ই নদীর স্রোতোধারা থেকে উপকৃত হতে পারেন।

এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে খালিদ রা. কতিপয় অশ্বারোহীকে নিয়ে হিরার শাসকের ছেলের বাহিনী অভিমুখে ছুটে যাচ্ছিলেন। পথে ওদের কতিপয় অশ্বারোহীর সাক্ষাৎ পেলে তাদের মৃত্যুর ঘুম পাড়িয়ে রেখে যান। হিরা-অধিপতির কাছে সংবাদটা পৌঁছার আগেই তিনি

---

৩০৯ প্রাগুক্ত : ৪/১৭৪-১৭৫।

৩১০ *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৪৪।

৩১১ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ২১৬।

আরও এগিয়ে যান। ফুরাতের তীরে হিরার শাসক-তনয়ের বিরুদ্ধে তাঁর তুমুল লড়াই হয়। তাদের পরাজিত করে ফুরাতের বাঁধ খুলে দেন। এতে নদীতে পানিপ্রবাহ শুরু হয়। খালিদ রা. তখন তাঁর সেনাদলকে ডেকে হিরা অভিমুখে এগিয়ে যেতে থাকেন। হিরার শাসক একইসঙ্গে তার পুত্র ও সম্রাট আরদাশিরের মৃত্যুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত হলে ভয়ে ফুরাত পাড়ি দিয়ে পালাতে থাকে। সে আর আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। সংবাদটা জানতে পেরে খালিদ সেখানেই তাঁর বাহিনীকে থামিয়ে দেন। হিরার লোকজন তখন দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

২. হিরা অবরোধে খালিদের পরিকল্পনা

খালিদ রা. নিম্নোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী পুরো হিরা শহর অবরোধ করে রাখেন :

- জিরার ইবনুল আজওয়ারকে 'কাসরে আবইয়াজ' অবরোধের জন্য নিযুক্ত করেন। সেখানে ইয়াস ইবনু কাবিসা আশ্রয় নিয়েছিল।
- জিরার ইবনুল খাত্তাবকে 'কাসরে আদাসিয়িন' অবরোধের দায়িত্ব দেন। সেখানে আদি ইবনু আদি আল আব্বাদি আশ্রয় নিয়েছিল।
- জিরার ইবনু মুকাররিনকে 'কাসরে বনি মাজিন' অবরোধে নিযুক্ত করেন। সেখানে ইবনু কামাল আশ্রিত ছিল।
- মুসান্না ইবনুল হারিসাকে নিযুক্ত করেন 'কাসরে ইবনু বাকিলা' অবরোধের জন্য। সেখানে আমর ইবনু আবদিল মাসিহ অবরুদ্ধ ছিল।

খালিদ রা. তাঁর আমিরদের নামে ফরমান জারি করেন, তাঁরা যেন প্রথমে লোকজনকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে। যদি তারা ইসলামগ্রহণ করে, তাহলে যেন তাদের নিরাপত্তা দেওয়া হয়; অস্বীকার করলে মাত্র এক দিনের সুযোগ দেওয়া হয়। আমিরদের আরও নির্দেশ দেন, 'সাবধান, শত্রুকে অহেতুক অবকাশ দেবে না। তাদের বিরুদ্ধে টানা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। মুজাহিদবাহিনীকে ওদের বিরুদ্ধে লড়তে বাধা দেবে না।'

৩. অবরুদ্ধ হিরাবাসীর সন্ধিপ্রস্তাব

কিন্তু সেখানকার অবরুদ্ধ শত্রুরা আত্মসমর্পণ না করে মোকাবিলায় নেমে আসে। তারা মুসলিমবাহিনীর দিকে পাথর ছুড়তে থাকে। মুসলিমরা পাথরের জবাবে তির ছুঁড়তে থাকেন। এরপর প্রচণ্ড হামলা চালিয়ে মহল ও দুর্গগুলো দখল করেন। পাদরিরা তখন চিৎকার দিয়ে বলছিল, 'হে মহলবাসী, তোমরা ছাড়া যেন অন্য কেউ আমাদের হত্যা করতে না পারে।' মহলবাসী চিৎকার দিয়ে বলে, 'হে আরববাসী, আমরা তো

তোমাদের তিনটা শর্তের একটা মেনে নিয়েছি। অতএব, তোমরা হত্যাযজ্ঞ থামাতে পারো।' এ কথা বলে তারা বেরিয়ে আসে। খালিদ রা. প্রত্যেক মহলবাসীর সঙ্গে পৃথকভাবে বসেন। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য তিরস্কার করেন। তারা জিজয়া-কর দেওয়ার শর্তে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে। এরপর বার্ষিক ১ লাখ ৯০ হাজার দিরহাম জিজয়া সাব্যস্ত করা হয়। খালিদ রা. বিজয়ের সুসংবাদসহ তাদের পক্ষ থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে দেওয়া উপহারসামগ্রী আবু বকরের দরবারে পাঠিয়ে দেন।

আবু বকর রা. সেগুলো গ্রহণ করে তা জিজয়ার মধ্যে যুক্ত করেন। আর ইসলামি শরিয়ত তাদের সঙ্গে যা করতে নিষেধ করেছে, তিনি জিজয়াকে কেবল সে নিষেধাজ্ঞার রক্ষাকবচ সাব্যস্ত করেছেন।[৩১২] পারসিক বাহিনীর অভ্যাস ছিল, তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার পরও সম্পদ আত্মসাতের জন্য নানা ধরনের বাহানা খুঁজত। আবু বকর রা. মুসলিমবাহিনীকে ওদের অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।[৩১৩]

৪. অঙ্গীকারনামা

খালিদ রা. হিরাবাসীর জন্য যে অঙ্গীকারনামা লিখিয়েছিলেন, তা নিম্নরূপ :

> *বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।*
>
> *এই অঙ্গীকারনামা খালিদ ও আদি, আমর ইবনু আদি, আমর ইবনু আবদিল মাসিহ, ইয়াস ইবনু কাবিসা ও হিরি ইবনু আকালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।*
>
> *এরা হিরাবাসীর সরদার। হিরাবাসী এই সন্ধিতে রাজি। তাদের এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, তারা নিজেদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে প্রতিবছর ১ লাখ ৯০ হাজার দিরহাম খিলাফতের কোষাগারে জমা দেবে। জাগতিক সম্পদ যাদের হাতে থাকবে, তারা পাদরি হোক কিংবা যাজক, এই সন্ধির আওতায় আসবে। তবে যাদের কাছে কোনো সম্পদ নেই, যারা দুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে না, তারা এর বাইরে এবং তারা নিরাপদ থাকবে। যদি তাদের নিরাপত্তার কোনো প্রয়োজন না থাকে, তাহলে তাদেরও কোনো প্রকার জিজয়া দিতে হবে না; কিন্তু কথা বা কাজের মাধ্যমে কোনো প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তারা এই প্রতিশ্রুতির আওতায় পড়বে না।*

অঙ্গীকারনামাটি ১২ হিজরির রবিউল আউয়ালে লেখা হয়েছিল।

এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, খালিদ রা. হিরাবাসীকে তিনটা বিষয়ের যেকোনো একটা

---

[৩১২] অর্থাৎ, জিজয়া দেওয়ার ফলে তাদের ওপর কোনো প্রকার জুলুম ও অন্যায় করা হবে না।

[৩১৩] *তারিখুদ দাওয়া ইলাল ইসলাম* : ৩৪৮।

গ্রহণের অধিকার দিয়েছিলেন :

১. ইসলামগ্রহণ করে নাও, এতে তোমরা সেই অধিকার ভোগ করবে, যে অধিকার ভোগ করে থাকি আমরা। তোমাদের ওপর তখন সেই দায়িত্ব আরোপিত হবে, যে দায়িত্ব আরোপিত হয় আমাদের ওপর। চাইলে তোমরা এখানে থাকতে পারো অথবা অন্য কোথাও চলে যেতে পারবে।

২. অথবা নিজেদের দীনে অটল থেকে জিজয়া প্রদানে রাজি হয়ে যাও।

৩. প্রথম দুটির কোনো একটাতে রাজি না হলে মোকাবিলা বা যুদ্ধের পথ রয়েছে। এর মাধ্যমেই মীমাংসা হবে।

আল্লাহর শপথ, আমি এমন লোকদের নিয়ে এখানে এসেছি, যাদের কাছে মৃত্যু এতটাই কাম্য, যতটা কাম্য তোমাদের কাছে তোমাদের জীবন।

কিন্তু তারা ইসলামগ্রহণ না করে জিজয়া আদায়ে সম্মত হলে খালিদ তাদের বলেন, 'তোমাদের ধ্বংস হোক। কুফর তো একটা ভ্রান্তির ময়দান। আরবদের মধ্যে কুফর ধারণকারীরাই সবচেয়ে বেশি নির্বোধ।'[৩১৪]

৫. রাসুলের সুন্নাত প্রতিষ্ঠায় সাহাবিদের অদম্য আগ্রহ

খালিদের এই বক্তব্য থেকে ইমানের যে ঝলক প্রত্যক্ষ করা যায়, এই গুণগুলো ইরাকবিজয়ী প্রত্যেক সেনার মধ্যে ছিল। এ বাহিনী মহান একটা লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছিল। তাঁরা মানুষকে ইসলামে দীক্ষিত করে সত্যের পথে নিয়ে আসার প্রবল আকাঙ্ক্ষা লালন করতেন। রাষ্ট্র সম্প্রসারণ, আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, পার্থিব সমৃদ্ধি উপভোগ করা মোটেই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। এসব বিজয়াভিযানের মহান সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের ভাষ্য ছিল—যুদ্ধে মুসলিমদের ধারাবাহিক বিজয়ের মূল নিয়ামক হচ্ছে শাহাদাতের প্রতি অদম্য আগ্রহ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন আর পরকালীন নিয়ামতে সমৃদ্ধ হওয়ার সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা।

সাহাবিরা রাসুলের সুন্নাত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অদম্য আগ্রহী ছিলেন, খালিদের বক্তব্যই এর স্পষ্ট প্রমাণ। তাঁদের অন্তর ছিল মানুষকে হিদায়াতের দ্বারা সমৃদ্ধ করার বাসনায় পূর্ণ। তাই কুফরে অটল থেকে জিজয়া প্রদানে তারা সম্মত হলে খালিদ রা. সন্তুষ্ট হতে না পেরে তাদের তিরস্কার করেন; অথচ জিজয়া আদায়ের মাধ্যমে মুসলিমদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসবে, এটা তিনি জানতেন। কিন্তু খালিদ তো ছিলেন এমন

---

[৩১৪] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৭৮।

এক জাতির অন্যতম কর্ণধার, যাঁদের দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোনো মূল্য ছিল না, যাঁরা দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিতেন। রাসুল ﷺ তাঁদের জন্য উন্নত মূলনীতি[৩১৫] নির্ধারণপূর্বক বলেছিলেন,

> আল্লাহ যদি তোমাদের মাধ্যমে তাঁর একজন বান্দাকেও হিদায়াত দেন, তাহলে এটা তোমাদের জন্য লাল উট থেকেও উত্তম।[৩১৬]

আবু বকর রা. হিরাবাসীর হাদিয়া গ্রহণ করেছিলেন। এ হাদিয়া তারা সন্তুষ্ট চিত্তেই প্রদান করেছিল। এরপর এই ভয় করেন যে, কী জানি এটা জিম্মিদের ওপর জুলুম হয়ে যায় কি না, এ জন্য এগুলো তিনি জিজয়ার মধ্যে যুক্ত করেন। তাঁর এই পদক্ষেপের মধ্যে ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অতুলনীয় এক শিক্ষা। আলি তানতাবি ইসলামি বিজয়াভিযান এবং ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে কবির এই পঙ্‌ক্তিগুলো তুলে ধরেছেন,

আমরা সাম্রাজ্য পেলে ন্যায়বিচার বানিয়েছি আমাদের নীতি;
কিন্তু তোমাদের কাছে ক্ষমতা গেলে তোমরা বইয়েছ রক্তনদী।
তোমরা আমাদের হাতে এলে আমরা সুবিচার করেছি,
তোমাদের বন্দিদের অনুগ্রহ করেছি, ক্ষমা করে দিয়েছি;
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এই ব্যবধানই যথেষ্ট।
প্রত্যেক ভদ্রজনের পাত্র থেকে তা-ই টপকায়, যা তাতে থাকে।[৩১৭]

৬. হিরা : ইসলামি সেনাবাহিনীর কেন্দ্র

হিরা বিজয় ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি সামরিক কৃতিত্ব। এর ফলে পারস্যের ব্যাপারে মুসলিমদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় ডালপালা মেলতে থাকে। ইরাক ও পারস্যের জন্য এই শহরের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই শহরটাকে মুসলিম সেনাপ্রধান তাঁর কেন্দ্র তথা রাজধানী বানিয়ে নেন। এখান থেকেই অভিযানে বেরোনো, যোগাযোগ স্থাপন, সাহায্য পাঠানো, বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা প্রদান, বন্দিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ রাজনৈতিক বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করতেন। এখান থেকেই খালিদ রা. খারাজ ও জিজয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে কর্মকর্তা পাঠাতেন। এখান থেকেই সীমান্তের নিরাপত্তার লক্ষ্যে আমির নির্ধারণ করে পাঠাতেন। এরপর নিজে এখানে কিছুদিন অবস্থান করে নাগরিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ

---

৩১৫ *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৪৮।

৩১৬ *সহিহ বুখারি,* মাগাজি : ৪২১০।

৩১৭ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক,* আলি তানতাবি : ৩৩।

দেন। জায়গিরদার ও সরদারদের কাছে সংবাদ পৌঁছলে তারা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতে এগিয়ে আসে।[৩১৮] তখন ইরাকের আশপাশে এমন কোনো সম্প্রদায় ছিল না, যারা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধি করেনি।

৭. পারস্যের সর্বসাধারণের উদ্দেশে খালিদের পত্রাবলি

যখন ইরাকের আবহাওয়া ঠিক হয়ে আসে, দিজলা ও হিরার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড থেকে পারসিক শাসনের বিলুপ্তি ঘটে, পেছন থেকে হামলার আর কোনো সন্দেহ থাকেনি, তখন খালিদ রা. সরাসরি ইরানের ওপর হামলার সংকল্প করেন। কিসরা আরদাশির মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের অবস্থা এমনিতেই নাজুক ছিল। তদুপরি তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ নিয়ে শুরু হয়েছিল চরম অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই সুযোগ কাজে লাগাতে তিনি সেখানকার বিশেষ লোকদের উদ্দেশে এই মর্মে চিঠি পাঠান,

> *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পক্ষ থেকে পারস্যের বাদশাহদের নামে।*
>
> *হামদ ও সালাতের পর,*
>
> *যাবতীয় প্রশংসা শুধু আল্লাহর, যিনি তোমাদের শাসনশৃঙ্খলা ভেঙে দিয়েছেন। তোমাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে তোমাদের শক্তিকে হ্রাস পাইয়ে দিয়েছেন। তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছেন। তোমাদের বিজয় ও সম্মানকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। অতএব, তোমাদের কাছে আমার এই চিঠি পৌঁছামাত্র ইসলামগ্রহণ করে নেবে, তাহলে তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে। অথবা জিজয়া-কর প্রদানে রাজি হয়ে যাবে। অন্যথায় আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসব, যারা মৃত্যুকে এতটাই ভালোবাসে, তোমরা জীবনকে যতটা ভালোবাসো। তারা পরকালের ব্যাপারে এতটা আগ্রহী, যতটা আগ্রহী তোমরা দুনিয়ার প্রতি।*

আর তাদের সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর চিঠির ভাষ্য ছিল,

> *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পক্ষ থেকে পারস্যের আমিরদের নামে।*
>
> *সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাদের শাসনক্ষমতা ধ্বংস করে দিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে মতবিরোধের জন্ম দিয়েছেন। তোমাদের শক্তি*

---

[৩১৮] *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ২২২।

দুর্বল করে দিয়েছেন। সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছেন। তোমাদের বিজয় ও সম্মান মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। যখন আমার এই চিঠি তোমাদের হস্তগত হবে, তখন যদি তোমরা ইসলামগ্রহণ করে নাও, তবে নিরাপদ হয়ে যাবে। অথবা জিজয়া-কর প্রদানে রাজি হয়ে যাবে। অন্যথায় আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের কাছে চলে আসব, যারা মৃত্যুকে এতটাই ভালোবাসে, জীবনকে তোমরা যতটা ভালোবাসো। তারা পরকালের ব্যাপারে এতটা আগ্রহী, যতটা আগ্রহী তোমরা দুনিয়ার প্রতি।[৩১৯]

হিরা বিজয়ের পরে শহরটাকে ইসলামি সাম্রাজ্যের অধীন করার মাধ্যমে আবু বকরের অর্ধেক আশা পূর্ণতা পেয়েছিল। আর এটা ছিল সরাসরি ইরানের ওপর হামলার পূর্বাভাস। এ ক্ষেত্রে খালিদ রা. তাঁর দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় আদায় করেন। তিনি অল্পদিনেই হিরায় পৌঁছে যান। ইরাকের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ১২ হিজরির মুহাররাম থেকে কাজিমার যুদ্ধের মাধ্যমে। আর একই বছর তিনি হিরা বিজয় সমাপ্ত করেন।[৩২০]

৮. হিরা বিজয়কালে খালিদ থেকে প্রকাশিত কারামত

ইমাম তাবারি রাহ. তাঁর নিজের সনদে বর্ণনা করেন; ইবনু বুকায়লার (আমর ইবনু আবদিল মাসিহ) সঙ্গে এক খাদিম ছিল। তার কোমরে একটা থলে ঝোলানো ছিল। খালিদ রা. থলেটা তার হাত থেকে নিয়ে তাতে যা ছিল, তা নিজ হাতুলিতে রেখে আমরকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমর, এগুলো কী?' সে বলে, 'আল্লাহর শপথ, এটা তাৎক্ষণিক ক্রিয়া করে এমন তীব্র বিষ।' জিজ্ঞেস করেন, 'এভাবে এ বিষ লুকিয়ে রাখার কারণ কী?' আমর বলে, 'আমার ভয় ছিল, যদি আপনাদের আমার ধারণার বাইরে পাই; আর আমার কারণে আমার গোত্র ও বস্তিবাসীকে কোনো খারাপ অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়, তখন বেঁচে থাকার চেয়ে আমার কাছে মরে যাওয়াটাই হবে প্রিয়।' খালিদ বলেন, 'কোনো প্রাণ ততক্ষণ পর্যন্ত মরতে পারে না, যতক্ষণ-না তার নির্ধারিত মৃত্যুকাল আসে।' এরপর তিনি বিষ তাঁর হাতে রেখেই বলেন, 'শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি উত্তম নামের অধিকারী, যিনি আসমান ও জমিনের রব, যাঁর নামের সঙ্গে কোনো রোগ ক্ষতি পৌঁছাতে পারে না। তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।'

লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে বিরত রাখতে চাচ্ছিল; কিন্তু ততক্ষণে তিনি বিষ গিলে ফেলেছেন। এ অবস্থা দেখে আমর বলে ওঠে, 'আল্লাহর শপথ হে আরববাসী,

---

৩১৯ *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৮৬।

৩২০ *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৫০।

তোমাদের একটা লোকও যদি থাকে, তাহলে তোমরা নিজেদের ইচ্ছামতো সবকিছুর মালিক বনে যাবে!' এরপর হিরাবাসীকে বলে, 'আজকের মতো উজ্জ্বল দিন আমি কখনো দেখিনি।'[৩২১]

হাফিজ ইবনু কাসির রাহ. বর্ণনাটি উল্লেখ করছেন; অথচ একে দুর্বল আখ্যা দেননি।[৩২২] হাফিজ ইবনু হাজার রাহ.-ও বর্ণনাটি উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'এটি আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন।' এ ছাড়া ইবনু সাআদ রাহ. বর্ণনাটি অন্য সূত্রে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু কেউ-ই একে দুর্বল আখ্যা দেননি।[৩২৩] আল্লামা ইবনু তাইমিয়া রাহ.-ও কারামাতের আলোচনার বর্ণনাটি আলোচনা করেছেন।[৩২৪]

কিন্তু সমকালের কতিপয় লেখক এ কারামত অস্বীকার করে থাকেন। তারা একে কয়েকজন বর্ণনাকারীর মনগড়া বর্ণনা আখ্যা দেন; অথচ বর্ণনাটি সনদের দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাবারি, ইবনু সাআদ, ইবনু কাসির ও ইবনু তাইমিয়ার মতো লোকজন তাতে কোনো প্রশ্ন তোলেননি। তবে কেউ কেউ সনদটিকে দুর্বল আখ্যা দিলেও মূল কাহিনি নিয়ে কোনো কথা বলেননি। অবশ্যই তাঁরা সমকালের লেখকদের থেকে বেশি জ্ঞানী ও অধিক ন্যায়পরায়ণ ছিলেন।

খালিদ রা. যখন বিষ পান করছিলেন, তখন তিনি ইমান ও বিশ্বাসের শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, আল্লাহই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। একেক বস্তুতে একেক বিশেষত্ব মূলত তাঁরই দান। তিনি চাইলে যেকোনো সময় বস্তু থেকে সেই বিশেষত্ব উঠিয়ে নিতে পারেন। যেভাবে ইবরাহিম আ.-কে আগুনে ছুড়ে ফেলা হলে আল্লাহ আগুনের বৈশিষ্ট্য দূর করে আগুনকে শীতল ও আরামদায়ক বানিয়ে দিয়েছিলেন। এমন ঘটনা তো নবিগণ ছাড়া অনেক অলির সঙ্গেও ঘটেছে। যেমন : আবু মুসলিম খাওলানিকে যখন মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব আগুনে ছুড়ে দেয়, তখন তিনি আগুনে থাকাবস্থায় সালাতে দাঁড়িয়ে যান। আগুন তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

এখানে স্মর্তব্য যে, খালিদ রা. যখন বিষপান করেছিলেন, তখন তাঁর অন্তরে তিল পরিমাণ লৌকিকতা, খ্যাতির চাহিদা কিংবা সম্মান অর্জন অথবা প্রবৃত্তিপরায়ণতা ছিল না। তিনি জানতেন, এমন কিছু থাকলে তিনি আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন না। তাঁর কাছে বিষের প্রভাব দূর করার মতো কোনো শক্তিও ছিল না। এ ছিল এক বিরল অভিজ্ঞতা। তাই বলে বর্তমানে যদি কোনো মুসলমান এই লক্ষ্য নিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার কাছ থেকে

---

[৩২১] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৮০।

[৩২২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/২৫১।

[৩২৩] *আল-ইসাবা*, ইবনু হাজার : ২/৩১৮, বর্ণনা : ২২০৬।

[৩২৪] *মাজমুউল ফাতাওয়া*, ইবনু তাইমিয়া : ১১/১৫৪।

এমন অভিজ্ঞতার বাস্তবায়ন ঘটানোর আবেদন করা যাবে না। কেননা, বর্তমানে কারও পক্ষে খালিদের বিশ্বাসের দৃঢ়তার পর্যায়ে উপনীত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।[৩২৫]

হিরা বিজয় এবং খালিদ-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য হলো, খালিদ রা. হিরা জয়ের পর একই সালামে আট রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন।[৩২৬]

এগারো. আনবার (জাতুল উয়ুন) বিজয়

হিরা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরে এলে খালিদ রা. কা'কা ইবনু আমর তামিমিকে সেখানে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন; আর নিজে খলিফার নির্দেশে ইয়াজ ইবনু গানামের সাহায্যে ছুটে যান। খালিদ আনবার পৌঁছে দেখতে পান, শত্রুবাহিনী দুর্গের চারপাশে পরিখা খনন করে দুর্গের ভেতরে অবস্থান করছে।[৩২৭] মুসলিমরা দুর্গটি অবরোধ করেন। খালিদ তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন, 'তোমরা শত্রুদের চোখগুলো টার্গেট করবে।' যুদ্ধ শুরু হলে মুসলিম তিরন্দাজরা তির ছুড়ে হাজার হাজার চোখ অন্ধ করে ফেলেন। এ কারণে এ যুদ্ধকে 'জাতুল উয়ুন' নামে নামকরণ করা হয়।[৩২৮]

খালিদ অভাবিত বুদ্ধিমত্তায় সেনাদল নিয়ে পরিখার বাধা উতরে যান। তিনি নির্দেশ দেন, 'যেখানে পরিখা কিছুটা সংকীর্ণ, সেখানে দুর্বল উটগুলো জবাই করে পরিখার ভেতর ফেলে দেবে।' এভাবে পরিখা উটের লাশে ভরে ওঠে। আর সেনারা সেই লাশের সেতু ব্যবহার করে পরিখা পার হয়ে যান। এ অবস্থা দেখে শত্রুরা দুর্গের পাশ ছেড়ে ভেতর দিকে সরে যায়।[৩২৯] পরিশেষে তাদের অধিনায়ক শেরজাদ খালিদের সঙ্গে চুক্তিতে আসতে বাধ্য হয়। ফলে এই শর্তে সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় যে, শেরজাদ তার কতিপয় সেনা নিয়ে আনবার থেকে চলে যাবে, তবে সঙ্গে করে কোনো মালসামানা নিতে পারবে না।[৩৩০]

সাহাবিরা আনবারে পৌঁছে সেখানে বসবাসকারী বনু ইয়াদের কাছ থেকে আরবি ভাষার লিখনপদ্ধতি শিখে নেন। বনু ইয়াদ অনেক আগে বুখতে নাসারের অনুমোদন নিয়ে এখানে চলে এসেছিল। খালিদকে বনু ইয়াদের কতিপয় কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনানো হয়। এসব ছিল তাদের গোত্রের প্রশংসাগাথা—

---

[৩২৫] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৫৩-১৫৪।

[৩২৬] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/৩৫৩।

[৩২৭] *তারিখুদ দাওয়া ইলাল ইসলাম* : ৩৫০।

[৩২৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৪/৩৫৩।

[৩২৯] *তারিখুদ দাওয়া ইলাল ইসলাম* : ৩৫০।

[৩৩০] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৯১।

আমার জাতি বনু ইয়াদ যদি কাছে থাকত, অথবা হিজাজে
বসবাস করত, তাহলে তাদের উটগুলো দুর্বল হয়ে যেত।
যখন তারা সেখান থেকে বেরিয়ে ইরাকে চলে আসে, তখন
ইরাকের ভূমিকে তারা উর্বর পায় এবং লেখাপড়া শিখে নেয়।

বারো. আইনুত তামার

খালিদ আনবারে জিবরিকান ইবনু বদরকে স্থলাভিষিক্ত করে আইনুত তামারের দিকে বেরিয়ে পড়েন। সেখানে গিয়ে দেখতে পান আক্কা ইবনু আবি আক্কা, নামির, তাগলিব, ইয়াদ গোত্রসহ তাদের সহযোগীরা এক বিশাল বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে পারস্যবাহিনী নিয়ে যোগ দিয়েছে সেনাপতি মিহরান। আক্কা মিহরানের কাছে আবেদন করেছিল, তাকে যেন খালিদের বিরুদ্ধে মোকাবিলায় ছেড়ে দেওয়া হয়। সে তাকে বলেছিল, 'আরবরাই আরবদের বিরুদ্ধে কৌশল সম্পর্কে বেশি অবহিত। অতএব, আপনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করার সুযোগ দিন।' মিহরান বলে, 'ঠিক আছে, তুমি তাঁর মোকাবিলায় চলে যাও, সাহায্যের প্রয়োজন পড়লে আমরা আছি।'

পারসিকরা তাদের অধিনায়কের এই সিদ্ধান্তে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে, তখন সে তাদের বলে, 'ওকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। যদি সে খালিদের ওপর বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে, তাহলে সেটা তো তোমাদেরই বিজয়; আর সে পরাজিত হলে তো আমরা নিজ শক্তিতেই খালিদের মোকাবিলা করব। এমতাবস্থায় নিশ্চয় সে থাকবে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল; আর আমরা থাকব তাজাদম।' এ কথা শুনে তারা তার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা স্বীকার করে। এদিকে খালিদ রা. আক্কার মোকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন। উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে খালিদ তাঁর ডান ও বামের বাহিনীকে বলেন, 'তোমরা নিজ নিজ অবস্থানে অটল থাকবে; আমি আক্রমণ চালাচ্ছি।' এ ছাড়া তিনি তাঁর প্রতিরক্ষাবাহিনীকে নির্দেশ দেন, 'তোমরা আমার পেছনে থাকবে।'

এরপর তিনি আক্কার ওপর হামলা করেন। আক্কা তখনো তার সারিবিন্যাসে ব্যস্ত ছিল। মুসলিম যোদ্ধারা আক্কাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলে তার বাহিনী যুদ্ধ ছাড়াই পালিয়ে যায়। তখন তাদের বড় একটা অংশকে গ্রেপ্তার করা হয়। অপরদিকে মিহরান যখন জানতে পারে, আক্কা যুদ্ধ ছাড়াই গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তার বাহিনী পালিয়ে ছত্রখান হয়ে গেছে, তখন সে-ও দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যায়। পরাজিত আরবরা যখন দেখতে পায় দুর্গ শূন্য এবং সেখানে পারস্যবাহিনীর উপস্থিতি নেই, তখন তারা দুর্গে প্রবেশ করে সেখানে আশ্রয় নেয়। খালিদ সেখানে গিয়ে দুর্গ অবরোধ করে ফেলেন; কিন্তু একসময় তারা খালিদের নির্দেশে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়। খালিদ আক্কাসহ তার সঙ্গে গ্রেপ্তার হওয়া

এবং তাঁর নির্দেশে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসা লোকজন সবাইকে হত্যার নির্দেশ দেন।

এভাবে মুসলিমবাহিনী দুর্গের সবকিছু গনিমত হিসেবে নিয়ে নেয়। দুর্গের অভ্যন্তরে একটা গির্জায় দরজা বন্ধ করে ৪০ জন বালক ইনজিল অধ্যয়ন করছিল, তিনি দরজা ভেঙে তাদের বন্দি করে আমিরদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। এদের মধ্যে উসমান ইবনু আফফানের দাস হুমরানও ছিলেন। তাকে তিনি গনিমতের খুমুস থেকে পেয়েছিলেন। আরেকজন ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সিরিনের পিতা সিরিন। তিনি আনাস ইবনু মালিকের ভাগে পড়েছিলেন। এরপর খালিদ গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দেন।

এরপর আবু বকর রা. ওয়ালিদ ইবনু উকবাকে ইয়াজ ইবনু গানামের সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। ইয়াজ তখন দাওমাতুল জান্দাল অবরোধরত। ওয়ালিদ দেখতে পান, ইয়াজ ইরাকের প্রান্তিক একটা অঞ্চলে শত্রুদের অবরোধ করে আছেন। এদিকে শত্রুবাহিনীও তাঁর চলে আসার সব পথ বন্ধ করে রাখায় তিনিও অবরুদ্ধ অবস্থায় আছেন। চরম বিপদের মুহূর্তে সাহায্য পেয়ে ইয়াজ ইবনু গানাম রা. ওয়ালিদ ইবনু উকবাকে বলেছিলেন, 'অনেক ছোট সিদ্ধান্তও অনেক সময় বড় বাহিনীর চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেবেন?' উকবা বলেন, 'আপনি খালিদকে আরও কিছু সেনাসহায়তা পাঠাতে বলুন।' ইয়াজ চিঠি পাঠালে খালিদ চিঠিটা আইনুত তামারের যুদ্ধের পরক্ষণেই হাতে পেয়েছিলেন। জবাবে তিনি লিখে পাঠান, 'আমরা আপনার দিকে চলে আসার ইচ্ছা করেছি।' এ ছাড়া তিনি এই পঙ্‌ক্তিও লিখে পাঠান,

অপেক্ষা করুন, আপনার কাছে কতিপয় অশ্বারোহী বাঘ চলে আসছে,
তাদের তরবারিগুলো চকচক করছে এবং তারা দলে দলে আসছে।

তেরো. দাওমাতুল জান্দাল ও খালিদ সম্পর্কে তাঁর শত্রুর সাক্ষ্য

খালিদ রা. আইনুত তামারে উয়াইম ইবনু কাহিল আসলামিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দাওমাতুল জান্দাল অভিমুখে বেরিয়ে পড়েন। দাওমাতুল জান্দালবাসী তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের সহযোগী গোত্র বাহরা, কালব, গাসসান ও তানুখিদের সাহায্য চায়।[৩৩১] তখন দাওমাতুল জান্দাল দুই নেতার কর্তৃত্বে ছিল। একজন ছিল আকিদার ইবনু আবদিল মালিক, অপরজন জুদি ইবনু রাবিআ। তাদের মধ্যে তখন মতবিরোধ দেখা দেয়। আকিদার বলছিল, 'আমি খালিদকে তোমার চেয়ে বেশি জানি। তাঁর থেকে পয়মন্ত কেউ নেই। আমাদের মধ্যে যুদ্ধে তার ওপর বিজয়ী হওয়ার মতো কেউ নেই।

---

৩৩১ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৫৪।

সংখ্যায় বেশি হোক কিংবা কম, খালিদের চেহারা দর্শনেই তাঁর প্রতিপক্ষ বাহিনী পরাজয়বরণ করে নেয়। অতএব, তুমি আমার সিদ্ধান্ত মেনে নাও এবং খালিদের সঙ্গে সন্ধির চেষ্টা করো।' কিন্তু লোকজন আকিদারের কথা মানতে রাজি হয়নি। আকিদার বলে, 'তাহলে আমিও খালিদের বিপরীতে তোমাদের সঙ্গ দিতে রাজি নই। তোমরা তোমাদের বিষয়টা ভালো জানো।'[৩৩২]

এ হচ্ছে খালিদ সম্পর্কে তাঁর শত্রুর সাক্ষ্য। আর সত্য সাক্ষ্য তো তা-ই, যা শত্রু স্বীকার করে থাকে। তাবুকযুদ্ধে রাসুল ﷺ যখন খালিদকে আকিদারের দিকে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি তাকে বন্দি করে নিয়ে এসেছিলেন। নবিজি দয়াপরবশ হয়ে সেদিন তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তবে তার থেকে 'মুসলমানের মোকাবিলায় আসবে না' মর্মে একটা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন; কিন্তু সে অঙ্গীকারের কোনো মর্যাদা রাখেনি। ফলে খালিদের আগমন-সংবাদ পেয়ে সে গোত্রকে ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। খালিদ দাওমাতুল জান্দালের পথে থাকতেই খবরটা পেয়ে গেলে তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে আসিম ইবনু আমরকে পাঠান। আসিম তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলে খালিদ আগের প্রতিশ্রুতিভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যার নির্দেশ দেন। এভাবেই আল্লাহ তাকে তার গাদ্দারির জন্য ধ্বংস করেন। তার কোনো তদবির তাকদিরকে প্রতিহত করতে পারেনি।[৩৩৩]

খালিদ রা. দাওমাতুল জান্দালে পৌঁছেই সেখানকার অধিবাসীসহ তাদের সহযোগী গোত্র বাহরা, কালব ও তান্নুখিদের অবরোধ করেন। তখন একদিকে ছিল তাঁর বাহিনী, অপরদিকে ছিল ইয়াজ ইবনু গানামের বাহিনী।[৩৩৪] জুদি ইবনু রাবিআ তার বাহিনী নিয়ে খালিদের দিকে এগিয়ে আসে। অপরদিকে ইবনু হাদরিজান ও ইবনু আবহাম ইয়াজ ইবনু গানামের দিকে এগিয়ে যায়। খালিদ জুদির বাহিনীকে পরাস্ত করে ফেলেন। তবে ইয়াজ ইবনু গানাম রা.-কে তাঁর প্রতিপক্ষ বাহিনীর ওপর বিজয় অর্জনে বেশ বেগ পেতে হয়। পরাজিতরা পালিয়ে দুর্গে আশ্রয় নিতে চেয়েছিল; কিন্তু তাদের পৌঁছার আগেই দুর্গ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। সেখানে তখন তিলধারণের জায়গাও ছিল না। ভেতরের লোকজন তাই দরজা বন্ধ করে দেয়। তারা নিজেদের বাহিনীর লোকজনকে অসহায় অবস্থায় ময়দানে রেখে এসেছিল। খালিদ রা. দুর্গের দরজা উপড়ে ফেলে ভেতরে ঢুকে পড়েন। এরপর সেখানে থাকা বহুসংখ্যক শত্রুকে হত্যা করেন।[৩৩৫]

দাওমাতুল জান্দাল বিজয়ের ফলে মুসলিমবাহিনী বিশ্বের উদীয়মান শক্তি বিবেচিত

---

[৩৩২] *প্রাগুক্ত* : ৬/৩৫৫; *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৯৫।

[৩৩৩] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৬৩।

[৩৩৪] *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ২৩১।

[৩৩৫] *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৯৬; *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক*, খালিদ আল জুনাবি : ৫৪।

হতে থাকে। দাওমাতুল জান্দালের অবস্থান এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে তিন দিকে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। দক্ষিণে আরব উপদ্বীপের দিকে, উত্তর-পূর্বে ইরাকের দিকে এবং উত্তর-পশ্চিমে শামের দিকে। স্বাভাবিকভাবেই এলাকাটা ছিল আবু বকর এবং ইরাকের ময়দানে যুদ্ধরত ও শাম-সীমান্তে অবস্থানকারী তাঁর বাহিনীর অন্যতম লক্ষ্য। এ কারণেই ইয়াজ ইবনু গানাম এখান থেকে অন্য কোথাও সরে যাননি। তিনি সেখানে অবস্থান করেই খালিদের অপেক্ষা করছিলেন। যদি দাওমাতুল জান্দাল বিজিত না হতো, তাহলে ইরাকজয়ী মুসলিমদের জন্য বড়ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থেকে যেত।[৩৩৬]

এভাবেই খালিদ রা. দাওমাতুল জান্দালযুদ্ধে ইয়াজকে সহায়তা দিতে সমর্থ হন। যেখানে খালিদ কর্তৃক দক্ষিণ-ইরাকের যুদ্ধসমূহে তাঁর দ্রুত আক্রমণসামর্থ্য স্বল্প সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শত্রুর অন্তরে ভীতি জাগাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল, সেখানে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অবরুদ্ধপ্রায় অবস্থায় ইয়াজের ধৈর্যসহ বসে থাকা এ কথারই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মুসলিমবাহিনী ধৈর্য, দৃঢ়তা, পরকালের কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা এবং আল্লাহর সাহায্য লাভ ও সম্পূর্ণভাবে তাঁর ওপর ভরসা করার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। আর এই গুণাবলি তাঁদের মধ্যে পুরোমাত্রায় ছিল।

ইয়াজ ছিলেন শীর্ষস্থানীয় মুহাজির ও কুরাইশ নেতাদের অন্যতম ব্যক্তি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও দানশীল। খলিফাসহ গভর্নররাও তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। ছিলেন ইয়ারমুকযুদ্ধের সেনাপতিদের একজন। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহের সোনাবাহিনীর সম্মুখসারির নেতৃত্বে ছিলেন। এরপর তিনি শাম ও ইরাকের মধ্যবর্তী জাজিরা অঞ্চলটা পুরোপুরিভাবে জয় করে নিয়েছিলেন। আবু উবায়দা রা. তাঁর ইনতিকালের সময় ইয়াজকে শামে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। উমর রা.-ও তাঁকে ওই পদে বহাল রাখেন। এর পর যখন যে বিজয়াভিযানের প্রয়োজন পড়ত, তাঁকে সেদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো।[৩৩৭]

চৌদ্দ. হুসায়িদের যুদ্ধ

খালিদ রা. আকরা ইবনু হাবিসকে আনবার ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে নিজে দাওমাতুল জান্দালে অবস্থান করেন। সেখানে অবস্থানের ফলে পারস্যবাসী তাঁর ব্যাপারে ভুল ধারণায় পড়ে যায়। তাদের অন্তরে তখন লালসার জন্ম নেয়। এ ছাড়া এই অঞ্চলের আরবরাও পারস্যবাসীর সঙ্গে পত্রযোগাযোগের মাধ্যমে চক্রান্তে লিপ্ত হয়। খালিদের

---

[৩৩৬] *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক*, নাজার আল হাদিসি ও খালিদ আল জুনাবি : ৫৪।

[৩৩৭] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৬৪।

ওপর তারা ভীষণ খেপা ছিল। তারা আক্কার মৃত্যুর দুঃখ ভুলতে পারছিল না। তাই বুজমাহার বুজবাকে সঙ্গে নিয়ে বাগদাদ থেকে আনবারের দিকে এগিয়ে আসে। এরপর হুসায়িদ ও খানাফিসে জড়ো হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সংবাদটা আনবারের নেতৃত্বে থাকা জিবরিকান ইবনু বদরের কাছে দ্রুত পৌঁছে যায়। তিনি তৎক্ষণাৎ খালিদ মনোনীত হিরার গভর্নর কা'কা ইবনু আমরের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন। কা'কাও আবাদ ইবনু ফাদাকি সাদিকে (আবু লায়লা) জিবরিকানের সাহায্যে হুসায়িদে দ্রুত পাঠিয়ে দেন। একইভাবে তিনি উরওয়া ইবনু জাদ আল বারকিকে তাঁর সাহায্যে পাঠিয়ে দেন। তবে উরওয়াকে নির্দেশ দেন, 'তুমি খানাফিসে চলে যাবে।' দাওমাতুল জান্দালে থাকা খালিদের কাছে যখন এ সংবাদ পৌঁছায় যে, কতিপয় আরব গোত্র বিদ্রোহে মেতে উঠছে এবং তারা বুজবার সঙ্গ দিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে, তখন তিনি হিরায় কা'কার স্থলে ইয়াজ ইবনু গানামকে গভর্নর নিযুক্ত করে কা'কাকে হুসায়িদের গভর্নর করে পাঠান।

এদিকে বুজবা কা'কার এগিয়ে আসার সংবাদ পেয়ে বুজমাহারের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। আবেদনে সাড়া দিয়ে বুজমাহার নিজে তার সঙ্গে এসে যোগ দেয়। এরপর মুসলিমবাহিনী পারস্যবাহিনীর সঙ্গে এক ভয়াবহ যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর প্রচুর সদস্য নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে বুজমাহার ও বুজবা ছিল। মুসলিমরা বিপুল গনিমত লাভ করেন।[৩৩৮] কা'কা ইবনু আমর এ যুদ্ধ সম্পর্কে বলছিলেন,

কেউ কি আছে, যে আসমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেবে,
তোমার স্বামী অনারব নেতা বুজমাহার ও বুজবার কেচ্ছা শেষ করে দিয়েছে।
আমরা ভোরেই হুসায়িদ প্রান্তরে ওদের ওপর হামলে পড়েছিলাম
আর হিন্দি তীক্ষ্ণধার তরবারির মাধ্যমে ওদের মাথা ওড়াচ্ছিলাম।[৩৩৯]

পনেরো. মুসায়াখের যুদ্ধ

হুসায়িদের সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর খালিদ রা. তাঁর বাহিনীকে হাওরানের নিকট মুসায়াখে নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দেন। যথাসময়ে পুরো বাহিনী উপস্থিত হলে রাতের ভেতরে কতিপয় গোত্রের ওপর অতর্কিত আক্রমণ চালান। তাদের প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত করেন।[৩৪০] এরপর খালিদ রা. দিয়ারু বকরের অন্তর্গত রাক্কা ও

---

৩৩৮ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৫৫।

৩৩৯ *আল-কামিল ফিত তারিখ* : ২/৫৯।

৩৪০ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, খালিদ আল জুনাবি ও নাজার আল হাদিসি: ৫৫।

জুমাইলের পার্শ্ববর্তী সানি নামক স্থানে কতিপয় গোত্র একত্রিত হয়ে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ চালানোর তৎপরতা চালাচ্ছে মর্মে সংবাদ পেলে আচমকা বিভিন্ন দিক থেকে সানি অঞ্চলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুবাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে বিক্ষিপ্ত করে দেন। একইভাবে জুমাইলে সমবেত শত্রুদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরও বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেন।[৩৪১]

আদি ইবনু হাতিমের বর্ণনা; এ যুদ্ধে আমরা হারকুস ইবনু নুমান নামিরি নামের একব্যক্তির কাছে উপস্থিত হই। তার সঙ্গে ছিল তার ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রী। তাদের সামনে রাখা ছিল মদের পেয়ালা। আমরা তার কাছে গেলে সে তাদের বলে, 'জনমের মতো পান করে নাও। মনে হচ্ছে, এরপর আর পান করার কোনো সুযোগ পাবে না।' তারা সবাই মদ পান করতে থাকলে হারকুস বলতে থাকে,

সাবধান, মাজাভাঙা বিপদ নেমে আসার আগেই পান সেরে নাও।
এই ভীষণ বিপদ থেকে জাতির মুক্তির আশা সুদূর পরাহত।
মৃত্যুর আগে বিপদ আমাদের ভাগ্যবিধিতে পরিণত হয়ে গেছে;
এমন বিপদ, যা কোনো অবস্থায়ই টলমান নয়।[৩৪২]

এ অবস্থায়ই এক অশ্বারোহী এগিয়ে এসে তার ঘাড়ে আঘাত হানলে মস্তকটা উড়ে মদের পেয়ালায় গিয়ে পড়ে। আমরা তার স্ত্রী-সন্তানদের পাকড়াও করে নিই। এরপর তার সন্তানদের হত্যা করা হয়।[৩৪৩]

এ যুদ্ধে এমন দুজন মানুষকে হত্যা করা হয়, যারা ইসলামগ্রহণ করে নিয়েছিল এবং আবু বকর রা. কর্তৃক নিরাপত্তাপ্রাপ্তও ছিল; কিন্তু মুসলিমদের তা জানা ছিল না। যখন আবু বকরের কাছে তাদের হত্যার সংবাদ পৌঁছায়, তখন তিনি তাদের দিয়াত (রক্তপণ) আদায় করেন এবং তাঁদের সন্তানদের ব্যাপারে কিছু উপদেশ দেন। তিনি তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যারা ইসলামগ্রহণের পর দারুল হারবে বসবাস করে, তাদের পরিণতি এমন হয়েই থাকে। অর্থাৎ, মুশরিকদের সঙ্গে সন্নিহিত হয়ে বসবাস করাটা তাদেরই অন্যায়।'[৩৪৪]

ষোলো. ফিরাজের যুদ্ধ

খালিদ রা. ইরাকে ইসলামের বিজয়পতাকা উড়িয়ে আরব গোত্রগুলোকে অনুগত

---

৩৪১ *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৯৯-২০০।

৩৪২ প্রাগুক্ত : ৪/১৯৯; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৯/৫৩৩।

৩৪৩ *তারিখুত তাবারি* : ৪/১৯৯।

৩৪৪ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬/৩৫৬।

করার পর ফিরাজের দিকে যাওয়ার সংকল্প করেন। এলাকাটা ছিল শাম, ইরাক ও জাজিরার সীমান্তবর্তী। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পিঠ নিরাপদ রাখা, যাতে সাওয়াদ থেকে ইরান অভিমুখে এগিয়ে গেলে পেছন থেকে কেউ হামলে পড়ার আশঙ্কা না থাকে; কিন্তু মুসলিমরা ফিরাজে সেনাসমাবেশ ঘটালে রোমানরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা পার্শ্ববর্তী পারসিক যুবকদের সাহায্য চায়। যেহেতু মুসলিমরা পারস্যবাসীর প্রভাব-প্রতিপত্তি ধুলোয় মিশিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের অপমানিত করে ছেড়েছিলেন, এ জন্য তারা মুসলিমদের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি দেখে জ্বলে ভস্ম হচ্ছিল। তাই তারা রোমানদের সাহায্যের আবেদন লুফে নেয়। আজন্ম শত্রুদের সহায়তায় প্রস্তুত হয়ে ওঠে। একইভাবে রোমানরা আরব গোত্র তাগলিব, নিমার ও ইয়াদের কাছেও সাহায্য চাইলে তারাও রোমানদের ডাকে সাড়া দেয়। কারণ, তারা তখনো তাদের গোত্রের লোকজনসহ নেতাদের হত্যার শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

এভাবে এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিপরীতে রোম, পারস্য ও আরবদের ত্রিশক্তির সম্মিলন ঘটে। সম্মিলিত এই বাহিনী ফুরাতের তীরে এসে পৌঁছলে মুসলিমদের উদ্দেশে বলে, 'হয়তো তোমরা নদী পার হয়ে এসো, অথবা আমাদের আসতে বলো।' খালিদ রা. বলেন, 'তোমরাই চলে এসো।' তারা বলে, 'তোমরা এখান থেকে একটু পেছনে সরে যাও, আমরা আসছি।' খালিদ বলেন, 'এমনটা হবে না। তোমরা নদী পার হয়ে নিচু ভূমিতে চলে এসো।' ঘটনাটা ১২ হিজরির ১৫ জুলকাদায় ঘটে।

রোমান ও পারস্যবাহিনী একে অন্যকে বলছিল, 'নিজ দেশকে বাঁচাও। এই ব্যক্তি দীনের জন্য লড়ছে আর সে খুবই মেধাবী। আল্লাহর শপথ, এই ব্যক্তিই বিজয়ী হবে এবং আমরা তার বিপরীতে লজ্জিত ও অপমানিত হব।' এরপরও তারা এ থেকে শিক্ষা নেয়নি। তারা নদী পার হয়। পুরো বাহিনী চলে আসার পর রোমানরা বলতে থাকে, 'সবাই পৃথক হয়ে যাও, যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ; আর বিপদ কোন দিক থেকে এগিয়ে আসছে।' সুতরাং তা-ই করা হয়। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। আল্লাহ রোমানদের ভাগ্যে পরাজয় নির্ধারণ করেন।

খালিদ রা. বলেন, 'ওদের ওপর হামলে পড়ো এবং একটুও অবকাশ দিয়ো না।' অশ্বারোহীরা বর্শার জোরে ওদের এক একটা দলকে মুসলিমদের বাগে এনে হত্যা করে ফেলতেন। এই যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর ১ লাখ সেনা নিহত হয়। খালিদ রা. ফিরাজে ১০ দিন অবস্থান করেন। এরপর মুসলিমবাহিনীকে হিরায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন।[৩৪৫]

এভাবেই মুসলিমরা প্রথমবারের মতো দুই পরাশক্তিসহ আরবদের যৌথ হামলার

---

[৩৪৫] *তারিখুত তাবারি* : ৪/২০১।

মোকাবিলা করেন; কিন্তু তারপরও তাঁরাই বিজয়ী হন। যদিও যুদ্ধটা অন্য বড় বড় যুদ্ধের মতো তেমন খ্যাতি ও প্রচার পায়নি, তথাপি নিঃসন্দেহে যুদ্ধটা ছিল ইতিহাসের মোড়নির্ধারক একটা যুদ্ধ। এ যুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুদের—চাই তারা রোমান হোক কিংবা ইরানি অথবা আরব—ভেতরগত শক্তি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। ইরাকে খালিদ রা. যে যুদ্ধ-শেকল গঠন করেছিলেন, এটা ছিল সেই শেকলের শেষ কড়া।[৩৪৬]

এ যুদ্ধের পর ইরানিদের গৌরব ও জাঁকজমক একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এরপর মুসলিমদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার মতো তাদের এমন কোনো যুদ্ধ-ক্ষমতা আর বাকি থাকেনি।[৩৪৭] এই যুদ্ধ সম্পর্কে কা'কার বক্তব্য ছিল,

ফিরাজে আমরা রোমান ও পারস্যের যৌথবাহিনীর মোকাবিলা করেছি,
যারা ইসলামের অগ্রতৎপরতায় অস্থির হয়ে পড়েছিল।
আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের বাহিনীকে ধ্বংস করে দিই,
আমরা বনু রিজামের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছি।
মুসলিমবাহিনী অটল পাথরের মতো অবস্থান নেয়,
আমরা শত্রুদের মাঠে-চরা বকরির মতো পেয়েছিলাম।[৩৪৮]

---

৩৪৬ *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৭৩।

৩৪৭ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ৩৬।

৩৪৮ *মাআরিকু খালিদিবনিল ওয়ালিদ জিদ্দাল ফুরুসি*, আবদুল জাব্বার সামরায়ি : ১২৩।

নবম অধ্যায়

খালিদের হজপালন ও শামের দিকে বিস্ময়কর যাত্রা

এক. খালিদের হজ ও শামের দিকে রওনার নির্দেশ

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. ফিরাজে ১০ দিন অবস্থান করে ১২ হিজরির ২৫ জুলকাদায় সেনাবাহিনীকে হিরা অভিমুখে রওনার নির্দেশ দেন। অগ্রবর্তী বাহিনীতে ছিলেন আসিম ইবনু আমর। পেছনে ছিলেন শাজারা ইবনুল আ'আজ। বাহ্যত তিনি দেখাতে চাচ্ছিলেন—তিনি পশ্চাদ্‌বাহিনীর সঙ্গে আছেন; কিন্তু অত্যন্ত গোপনে অল্প কজন সাথি নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে মসজিদে হারামের দিকে রওনা হয়ে যান। মক্কায় যেতে অপরিচিত একটা পথ ধরে চলছিলেন, ফলে তাঁকে চরম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়। তিনি দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন এবং একসময় মক্কায় গিয়ে ওই বছরের হজ পেয়ে যান। হজ সম্পাদন করে তাঁর বাহিনী হিরায় পৌঁছার আগেই নিজে সেখানে চলে যান। আবু বকর রা. ব্যাপারটা জানতে পারেননি। পরে হাজিদের মুখে ঘটনাটা জানতে পেরে সেনাদলকে এভাবে ছেড়ে যাওয়ায় তাঁকে তিরস্কার করে লেখেন,[৩৪৯]

> *চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি ইয়ারমুকের মুসলিমবাহিনীর কাছে চলে যাও। সেখানকার মুসলিমবাহিনী কঠিন বিপদে আছে। সাবধান, যা করেছ দ্বিতীয়বার আর তা করবে না। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, শত্রুবাহিনী আক্রমণ করে বসেনি। আর ওরা যে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছে, তুমি ছাড়া অন্য কেউ তা সহজে সমাধা করতে পারবে বলে মনে করি না।*
>
> *আবু সুলায়মান, তোমার নিষ্ঠা ও সৌভাগ্য মুবারক হোক। নিজ দায়িত্ব আদায় করে যাও। আল্লাহ তোমার জন্য তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করবেন। সাবধান, তোমাকে যেন আত্মতুষ্টি পেয়ে না বসে। নতুবা ক্ষতি ও লজ্জার শিকারে পরিণত হবে। সাবধান, নিজের কোনো অনুগ্রহের কারণে কাউকে কখনো খোঁটা দেবে না। কারণ, বাস্তবে আল্লাহই অনুগ্রহ করে থাকেন।*

---

[৩৪৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩৫৭।*

তিনিই মূল প্রতিদানদাতা।[৩৫০]

আবু বকরের এই চিঠি থেকে অনুমান করা যায়, তিনি সফল নেতাদের প্রতি কী পরিমাণ নজর রাখতেন। তাঁদের কেমন পরামর্শ, উপদেশ ও উৎসাহ দিয়ে ধন্য করতেন, যার ফলে তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহে বিজয় ও সম্মান কুড়িয়ে নিতেন :

- আবু বকর রা. তাঁকে ইরাক ছেড়ে শামে চলে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল, এতে আল্লাহ সেখানকার মুসলিমদের বিজয়ী করবেন।
- তাঁকে উপদেশ হিসেবে বলছিলেন, খলিফাকে না জানিয়ে তাঁর হজ করা ঠিক হয়নি। ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়।
- তাঁকে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করার ও দৃঢ় থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। নিয়তকে খাঁটি রেখে চেষ্টায় লেগে থাকার গুরুত্বারোপ করেছিলেন।
- আত্মতুষ্টি ও আত্মম্ভরিতা থেকে দূরে থাকার উপদেশ দেন। কারণ, এতে আমল ধ্বংস হয়ে যায় এবং তা আমলকারীর মুখে ছুড়ে দেওয়া হয়। মানুষকে অনুগ্রহ করে খোঁটা দেওয়া থেকে নিষেধ করেন। কারণ, প্রকৃত অনুগ্রহকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর দেওয়া তাওফিকেই অনুগ্রহ করা সম্ভব হয়ে থাকে।[৩৫১]

ইরাকের যুদ্ধসমূহে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছিল শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধে মুসলিমবাহিনীর দক্ষতা। শক্তি সংহত করার অসামান্য যোগ্যতা। আধ্যাত্মিক শক্তি ব্যবহারের নবুওয়াতি নীতি। নিজ বাহিনীর সৎসাহস বাড়িয়ে তোলার উন্নত চিন্তাচেতনা। তথ্যসংগ্রহ, পরিকল্পনা তৈরি, শক্তির পূর্ণ ব্যবহারসহ সূক্ষ্মদর্শিতা আর বিরল সাবধানতার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সব মূলনীতি।

খালিদ রা. ইরাকের যুদ্ধসমূহে তাঁর সুযোগ্য সহচর মুসান্না ইবনুল হারিসার হাতে ইরাকের যুদ্ধভার অর্পণ করে সেখান থেকে অর্জিত বিপুল অভিজ্ঞতা নিয়ে রোমানশক্তির মোকাবিলার উদ্দেশ্যে শামের দিকে বেরিয়ে পড়েন। ইতিহাসের পাঠকদের সামনে নিশ্চয় এই বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে থাকবে যে, ইরাকের যুদ্ধসমূহের জন্য খালিদ যেসব পরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন, তার মূলে ছিল আল্লাহর ওপর নির্ভরতা। এরপর ছিল সূক্ষ্ম তথ্যসংগ্রহ তথা উন্নত গোয়েন্দা-তৎপরতা। এর মাধ্যমে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তাঁর যোগাযোগব্যবস্থা ও গোয়েন্দা-কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত গতিশীল। আর এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছিল মুসান্না ইবনুল হারিসা শায়বানির মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন নেতৃত্বের মাধ্যমে। তাঁর মধ্যে একদিকে যেমন ছিল অসামান্য সামরিক যোগ্যতা, শৃঙ্খলপরায়ণতা

---

[৩৫০] *তারিখুত তাবারি* : ৪/২০২।

[৩৫১] *তারিখুদ দাওয়া ইলাল ইসলাম* : ২৯৫।

ও বিরল নেতৃত্বগুণ; তেমনি ছিল ওই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে বেশ জানাশোনা।

তিনি ছিলেন বনু বকরের শাখা বনু শায়বানের সদস্য। তারা ইরাক-সীমান্তের ফুরাতের তীরে বসবাস করত। তাদের এলাকার পরিসর হাইত পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বার্তা আদানপ্রদান ও গোয়েন্দা-তৎপরতার উপযোগী। তাই ইরানিদের যে বাহিনীই সক্রিয় হয়ে উঠত, মুসান্না তার খবর দ্রুত পেয়ে যেতেন। এমনকি কিসরার দরবারে ছোটবড় যা-ই ঘটত, উপযুক্ত সময়ে তা তাঁর অজানা থাকত না।[৩৫২]

দুই. খালিদের নামে আবু বকরের চিঠি

খালিদের নামে আবু বকরের চিঠি ছিল নিম্নরূপ :

> *ইরাক ছেড়ে চলে এসো। সেখানকার নেতৃত্ব ওই ব্যক্তির কাছে ছেড়ে এসো, যে তুমি যাওয়ার আগে সেখানকার আমির ছিল। এরপর যারা ইয়ামামা থেকে তোমার সঙ্গে ইরাকে গিয়েছিল, যারা রাস্তায় তোমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল এবং যারা হিজাজ থেকে তোমার কাছে গিয়েছিল, তোমার সে-সকল সাথিকে বরাবর দু-ভাগে ভাগ করে এক ভাগ সেখানে রেখে এক ভাগ সঙ্গে নিয়ে শামে ইবনুল জাররাহের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হও। সেখানে গেলে তুমিই হবে বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।*
>
> *ওয়াসসালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ।*

খালিদ শামে রওনা হওয়ার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সেনাবাহিনীকে দু-ভাগে ভাগ করেন। অর্ধেক ইরাকে মুসান্নার কাছে রেখে বাকি অর্ধেক নিজের সঙ্গে নিয়ে যান। তবে সেনাদলে যে-সকল সাহাবি অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের তিনি নিজের দলে রাখেন। মুসান্না এ ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, 'যতক্ষণ আবু বকরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা না হচ্ছে, ততক্ষণ আমি এ বণ্টনব্যবস্থায় রাজি হব না। আপনি অর্ধেক সাহাবিকে নিয়ে অর্ধেক আমার কাছে রেখে যান। আল্লাহর শপথ, তাঁদের মাধ্যমেই তো আমি আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়ের আশা করতে পারি। আপনি আমাকে তাঁদের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করবেন না।'

খালিদ রা. রওনা হওয়ার আগেই তাঁর কাছে আবু বকরের চিঠি এসে পৌঁছায়। ওই চিঠিতে তিনি কাদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন এবং কাদের রেখে যাবেন, সে সম্পর্কে নির্দেশনা ছিল। তিনি লিখেছিলেন,

---

৩৫২ *মাআরিকু খালিদিবনিল ওয়ালিদ জিদ্দাল ফুরুসি* : ১৩৪।

খালিদ, যেভাবে তুমি তোমার সঙ্গে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারীদের নিয়ে যাবে, একইভাবে মুসান্নার জন্যও তাঁদের একটা অংশকে রেখে যাবে। এরপর আল্লাহ যখন শামে তোমাকে বিজয় ও সাহায্যে ধন্য করবেন, তখন তুমি তাঁদের ইরাকে পাঠিয়ে দেবে। নিজেও সেখানে ফিরে এসে কাজে জড়িয়ে পড়বে।

এরপরও খালিদ রা. মুসান্নাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি সাহাবিদের পরিবর্তে বীরত্ব ও ধৈর্যে বিখ্যাত বড় বড় বাহাদুর মুসান্নাকে দিতে থাকেন। অবশেষে মুসান্নাও রাজি হয়ে যান।[৩৫৩]

তিন. শামের দিকে রওনা

খালিদ রা. তাঁর বাহিনীকে একত্রিত করে দুর্গম তৃণহীন মরুভূমি হয়ে শামের দিকে রওনা দেন। তিনি রাস্তাঘাট সম্পর্কে অভিজ্ঞদের জিজ্ঞেস করেছিলেন—'কোন পথ ধরে এগিয়ে গেলে আমরা রোমানদের অবস্থানস্থলের পেছন দিকে থাকব? আমরা যদি আগেই তাদের মুখোমুখি হয়ে পড়ি, তাহলে আমাদের উপস্থিতি মুসলিমদের কোনো কাজে আসবে না।' লোকেরা বলে, 'এ ব্যাপারে আমাদের কেবল একটা রাস্তাই জানা আছে; কিন্তু সে রাস্তাটা ভয়ংকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। সেনাদল ওই পথের ধকল সহ্য করতে পারবে না। একাকী সফর করলেও মুসাফিরের জন্য এই পথে প্রাণ যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। ঘোড়া আর মালসামানা নিয়ে যাওয়া তো প্রায় অসম্ভব। পাঁচ রাত পর্যন্ত পানির চিহ্নও পওয়া যাবে না।'

খালিদ রা. বলেন, 'পথ যতই দুর্গম আর ঝুঁকিপূর্ণ হোক, আমাদের জন্য দরকার হচ্ছে রোমানদের পেছনে দিকে উপস্থিত হওয়া।' তিনি ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তাটা বেছে নেন। তবে রওনা হওয়ার সময় পথপ্রদর্শক রাফি ইবনু উমায়ের বলেন, 'সঙ্গে করে বেশি পরিমাণ পানি নিন।' খালিদ তখন নির্দেশ দেন, 'উটগুলোর ঠোঁট কেটে দাও, যাতে ওরা ওদের পেটের ভেতর থাকা পানি খেয়ে শেষ করে ফেলতে না পারে।'[৩৫৪] এরপর সাথিদের উপদেশস্বরূপ বলেন, 'আল্লাহর সাহায্য থাকা অবস্থায় মুসলিমদের জন্য কোনোকিছুর পরোয়া করা উচিত নয়।'[৩৫৫]

পথপ্রদর্শক রাফি ইবনু উমায়ের তাঁদের নিয়ে এমন এক পথ ধরে রওনা হন, যা ছিল ভয়াবহরকম দুর্গম, যেখানে পানি ও জনবসতি নেই বললেই চলে। বিশেষ করে

---

৩৫৩ *আস-সিদ্দিক আওয়ালুল খুলাফা* : ১৬৯-১৭০।

৩৫৪ প্রাগুক্ত : ১৭১।

৩৫৫ *আল-হারবুন নাসফিয়া*, ড. আহমাদ নাওফাল : ২/১৫৫।

কারাকির থেকে সিবা[৩৫৬] পর্যন্ত অঞ্চল বেশ দুর্গম ছিল। তবে রাস্তাটা শাম যেতে অন্যান্য পথের চেয়ে সংক্ষিপ্ত ছিল। খালিদ তাঁর বাহিনীর সামনে এই দুর্গম পথ নির্বাচনের কারণ খুলে বলেন। তিনি বলছিলেন, 'এ পথ ধরে এগোলে দ্রুত ও গোপনীয়তার সঙ্গে সেখানে পৌঁছা সম্ভব হবে।'

রাফি ইবনু উমায়ের খালিদের কাছে আগে থেকেই বড় বড় ২০টা উট প্রস্তুত রাখতে আবেদন জানিয়েছিলেন। তাঁর এ দাবি পূরণ করা হলে রাফি কয়েকদিন যাবৎ উটগুলোকে একফোঁটা পানিও পান করতে দেননি। যখন উটগুলো পিপাসায় অস্থির হয়ে ওঠে, তখন খুব পরিতৃপ্ত করে পানি পান করান। উটগুলো পানিতে পেট ভরে নেয়। এরপর উটগুলো যাতে তাদের পেটের ভেতরকার পানি পান করতে না পারে, এ জন্য সেগুলোর ঠোঁট কেটে মুখে মুখোশ পরিয়ে নেন। সব শেষে খালিদকে বলেন, 'এবার রওনা হতে পারেন। ঘোড়াগুলোর ওপর মালসামানা উঠিয়ে নিন। রাস্তায় যেখানেই অবস্থান করবেন, সেখানে এই উট থেকেই একটা একটা করে জবাই করে পানি বের করা হবে।'

চার. মরুপথে খালিদবাহিনীর বিস্ময়কর যাত্রা

এরপর মুসলিমবাহিনী কারাকির থেকে ওই পথ ধরে এগোতে থাকেন। কারাকির ছিল মরুভূমির কাছাকাছি ইরাকের শেষ শহর। এখান থেকে পথটা প্রথমে শামের সুবা বস্তিতে গিয়ে পৌঁছায়। দুই বস্তির মধ্যখানে দূরত্ব ছিল পাঁচ রাতের সমান। মুসলিমবাহিনী দিনে বিশ্রাম নিত এবং রাতে পথ চলত। খালিদ অনেক যাচাই-বাছাইয়ের পর রাফি ইবনু উমায়েরের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি তারকারাজির গতিপথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ মিহরাজ মুহারিবিকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাঁরা কেবল রাত আর ভোরেই সফর করতেন। দুপুরে মুরুভূমি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে থেমে যেতেন, যাতে এক দিনে দুই মনজিল[৩৫৭] পরিমাণ পথ অতিক্রম করতে পারেন।

এদিকে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. তাঁর বাহিনীকে পায়ে না হেঁটে বাহনে চড়ে পথচলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে বাহিনীর শারীরিক সক্ষমতা ঠিক থাকে এবং শামে পৌঁছার আগেই ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। যাত্রাপথে তাঁরা যেখানেই অবস্থান করতেন, সেখানে দুয়েকটা করে উট জবাই করে এগুলোর পেটের ভেতরকার পানি ঘোড়াগুলোকে পান করাতেন; আর নিজেদের সঙ্গে করে নেওয়া পানি নিজেরা পান

---

৩৫৬ 'কারাকির'—এটি সামাওয়াহ বস্তিতে কালব ঝরনার পাশে অবস্থিত। আর 'সিবা' হচ্ছে সামাওয়াহ বস্তির বাহরা ঝরনার পাশে অবস্থিত। *আল-মুজাম*, ইয়াকুত : ৩/২৮১, ৪/৩১৭।

৩৫৭ ১ মনজিলের দূরত্ব হচ্ছে ১৬ মাইল সমান।

করতেন। পঞ্চম দিন পানি নিঃশেষ হয়ে গেলে খালিদ সঙ্গী-সাথিদের পিপাসার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে রাফিকে বলেন, 'এই সংকটের সমাধান কী?' রাফিকে তখন চোখ-ওঠা রোগে পেয়ে বসেছিল। তিনি লোকজনকে বলেন, 'আপনারা এখানে ছোট্ট হলেও একটা আওসাজগাছ খুঁজে বের করুন।' অনেক খোজাখুঁজির পর এর একটা ছোট্ট ডাল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। রাফি তাদের ওই জায়গা খননের নির্দেশ দেন। কিছুটা খনন করতেই আল্লাহর অনুগ্রহে পানির ফোয়ারা বেরিয়ে আসে। বাহিনীর লোকজন তখন পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করেন। এরপর খালিদ রা. বাহিনীকে নিয়ে নিরাপদে লক্ষ্যে পৌঁছে যান।[৩৫৮]

এই সফরে কতিপয় আরব খালিদকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'যদি ভোর হওয়া পর্যন্ত তোমরা অমুক গাছ পর্যন্ত পৌঁছতে পারো, তাহলে মুক্তি পেয়ে যাবে, অন্যথায় তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।' খালিদ রা. তাঁর বাহিনীকে নিয়ে তীব্রবেগে এগিয়ে যান এবং ভোর হওয়ার আগেই সেখানে পৌঁছে যান। তখন তিনি বলে ওঠেন, عند الصباح يحمد القوم السرى (রাতের পথিকদের সকালে প্রশংসা করা হয়।)

এ কথাটা প্রথমে খালিদ রা.-ই বলেছিলেন। এরপর এটা আরবি ভাষার বহুল ব্যবহৃত প্রবাদে পরিণত হয়ে যায়। এই সফর সম্পর্কে একজন কতই-না সুন্দর বলেছেন,

রাফি সম্পর্কে কী বলব, কীভাবে তিনি
কারাকির থেকে সিবার পথ পেয়ে গেলেন।
পাঁচ দিনের অব্যাহত যাত্রায় যখন সেনারা কেঁদে উঠেছিল
আমার ধারণা; আগে কোনো মানুষ এই মরু পাড়ি দেয়নি।[৩৫৯]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, খালিদের মতো অভিজ্ঞ কমান্ডার শঙ্কার কোনো পরোয়া করতেন না। তবে মরুভূমি পাড়ি দিতে পানির ব্যবস্থাপনার জন্য যা যা করার দরকার, সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে সফল হন।

যাত্রার পঞ্চম দিনে খালিদ রা. সিবায় গিয়ে উপনীত হন। এটা ছিল শাম এলাকার প্রথম বস্তি। তাঁরা তখন রোমানবাহিনীর পেছন দিকে ছিলেন। মাত্র পাঁচ দিনের ভেতর বিস্ময়কর সব বিপদে ঠাসা এই কঠিন মুরুভূমি পাড়ি দেওয়া ছিল সম্পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার; কিন্তু খালিদের ইমানি দৃঢ়তা ও সংকল্পের সামনে সকল বাধা পরাজিত হতে বাধ্য হয়। দুর্গম বিপৎসংকুল পথও তাঁর জন্য হয়ে ওঠে মসৃণ।[৩৬০]

---

[৩৫৮] *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, খালিদ আল জুনাবি ও নাজার আল হাদিসি : ৬৮।

[৩৫৯] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৭

[৩৬০] *মারিকাতুল ইয়ারমুক*, আল লিওয়া খালিল সায়িদ— *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক*, খালিদ আল জুনাবি : ৬৮।

পাঁচ. শামে খালিদের বাহিনী

খালিদ রা. শামের প্রথম সীমান্ত আদাকে পৌঁছে সেখানে হামলা চালান। জায়গাটা অবরোধ করে সন্ধির মাধ্যমে স্বাধীন করেন। এরপর পালমিরার দিকে এগিয়ে যান। সেখানকার লোকজন দুর্গবন্দি হয়ে পড়ে। তারা নিরাপত্তা কামনা করলে তাদের সঙ্গেও সন্ধি করেন। পালমিরা থেকে বেরিয়ে কারইয়াতাইন পৌঁছান এবং সেখানে যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করেন। কারইয়াতাইন বিজয় শেষে হাওয়ারিন অভিমুখে এগিয়ে যান। পরে সানিয়া নামক এলাকায় পৌঁছে সেখানে 'উকাব' পতাকা উত্তোলন করেন। এ পতাকাটি ছিল নবিজির তৈরি। এরই সূত্রে পরবর্তীকালে এই জায়গার নাম হয় 'সানিয়াতুল উকাব'।[৩৬১]

এর পর যখন আজরা হয়ে পথ অতিক্রম করেন, তখন এই এলাকাও পদানত করে গাসসানিদের কাছ থেকে প্রচুর গনিমত অর্জন করেন। এভাবে একের পর এক এলাকা জয় করে অবশেষে দামেশকের পূর্বদিক হয়ে বসরায় যুদ্ধরত সাহাবিদের কাছে পৌঁছে যান। বসরার শাসক তখন সন্ধি করে শহরটা মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দেয়। আলহামদুলিল্লাহ, এটাই ছিল শামের প্রথম সেই শহর, যা মুসলিমরা জয় করেছিলেন।

খালিদ রা. বিলাল ইবনু হারিস মুজানির মাধ্যমে গাসসান থেকে লাভ করা গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দেন। এরপর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, মিরসাদ এবং শুরাহবিল রা.-দের সঙ্গে মিলে রোমানবাহিনী কর্তৃক তাড়িয়ে ফেরা আমর ইবনুল আসের কাছে পৌঁছে যান। এর ফলেই সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক আজনাদায়নযুদ্ধ।[৩৬২]

ছয়. দুর্গম মরুপথ পাড়ি দেওয়া খালিদের বীরত্বের প্রমাণ

খালিদ রা. কেবল মুসলিমবাহিনীর সহায়তার উদ্দেশ্যেই অন্তহীন বিপদ মোকাবিলা করে অত্যন্ত দ্রুত এবং আচমকা শামে এসে পৌঁছান; অথচ তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই দুর্গম মরুভূমি পাড়ি দেওয়া ছিল প্রায় অলৌকিক ব্যাপার।

মাহমুদ শিত খাত্তাব বলেন, খালিদ রা. কর্তৃক অত্যন্ত দ্রুতগতি ও গোপনীয়তার সঙ্গে বিপৎসংকুল মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার নজির আমি সামরিক ইতিহাসে দ্বিতীয়টি খুঁজে পাইনি। আমি বুঝি না, হ্যানিবল ও নেপোলিয়নের আল্পস পর্বত পাড়ি দেওয়া, একইভাবে নেপোলিয়নের সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করা, আর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ

---

৩৬১ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, খালিদ আল জুনাবি ও নাজার আল হাদিসি : ৬৮।

৩৬২ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৬-৭।

সেনাবাহিনীর সিনাই পাড়ি দেওয়া খালিদ কর্তৃক শামের মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার মোকাবিলায় কী গুরুত্ব রাখতে পারে? এটা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার যে, মরুভূমির চেয়ে পাহাড়ি এলাকা পাড়ি দেওয়া অতি সহজ। কেননা, সেখানে পদে পদে জীবনের অন্যতম প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ পানির উপস্থিতি থাকে প্রচুর। আর শামের মরুভূমির সঙ্গে তো সিনাই মরুভূমির কোনো তুলনাই চলে না। সিনাইয়ের জায়গায় জায়গায় পানির প্রচুর উৎস বিদ্যমান। এ ছাড়া সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জনবসতিও অনেক।

খালিদ কর্তৃক ওই মরুভূমি পাড়ি দিয়ে শাম পৌঁছার বাস্তবতা রোমানদের কাছে এক অলৌকিক কাজ মনে হচ্ছিল। তারা কিছুতেই যেন এই ধাঁধার সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না। বিষয়টি ভাবতেই বিস্ময়ে থ হয়ে যাচ্ছিল।[৩৬৩]

এ জন্যই ইরাক ও শামের মধ্যবর্তী যেসব শহর-বস্তির পাশ দিয়ে তিনি পথ অতিক্রম করছিলেন, সেগুলো শক্ত কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই পদানত হয়। সেসব এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের থেকেই আত্মসমর্পণ করে নিচ্ছিল। এই মুহূর্তে এদিক থেকে মুসলিমদের এত বড় বিশাল একটা বাহিনী আসতে পারে, এটা তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারছিল না।[৩৬৪]

ইতিহাসের সর্বকালের সফল সেনানায়করা খালিদের সামরিক দক্ষতা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। *দ্য ন্যাশন ইন দ্য আর্মস* (*The Nation in Arms*) গ্রন্থের প্রণেতা জার্মানির প্রখ্যাত জেনারেল ফন ডার গোল্টজ (Freiherr von der Goltz) এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জার্মান-তুর্কি যৌথবাহিনীর এক সেনাকমান্ডার বলেন, 'খালিদ হচ্ছেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমার উসতাজ।'[৩৬৫]

---

৩৬৩ *কাদাতু ফাতহিল ইরাক ওয়াল জাজিরা* : ১৯৩; *আল-হারবুন নাফসিয়াহ* : ২/১৬৩।

৩৬৪ *আল-হারবুন নাফসিয়াহ*, ড. আহমাদ নাওফাল : ২/১৬২।

৩৬৫ *মাআরিকু খালিদিবনিল ওয়ালিদ জিদ্দাল ফুরুসি* : ১৬৭।

দশম অধ্যায়

শামে বিজয়াভিযান, ইয়ারমুকযুদ্ধ ও খালিদের বীরত্ব

এক. শামে বিজয়াভিযান

১. শামে আবু বকরের বিজয়াভিযান

নবিজির যুগ থেকেই শাম মুসলিমদের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল। নবিজি শামের বাদশাহ হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি পাঠিয়ে তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। আরব অঞ্চলে কায়সারের গভর্নর এবং বালকার[৩৬৬] গাসসানের শাসক হারিস ইবনু আবি শিমার গাসসানির কাছেও ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু এই পাপিষ্ঠ নবিজির চিঠি পড়ে দম্ভ-অহংকারে ফেটে পড়ে। এমনকি নবিজির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়; তবে কায়সার তাকে এমন করতে নিষেধ করে।

রাসুল ﷺ জায়েদ ইবনুল হারিসার নেতৃত্বে শামের দিকে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। মুতার প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যেখানে মুসলিম সেনাপতিদের মধ্যে জায়েদ ইবনু হারিসা, জাফর ইবনু আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রা. একের পর এক শাহাদাতবরণ করেন। তাঁদের শাহাদাতের পর মুসলিমবাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। তিনি একটা সফল সামরিক কৌশল প্রয়োগ করে ওই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি, নবিজি তাঁর এই যুদ্ধের মাধ্যমে জালিম রোমানদের সাম্রাজ্য-বিনাশের পরিকল্পনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি তাঁর সহজাত প্রতিভা প্রয়োগ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি আরবদের অন্তর থেকে রোমানভীতি দূর করে ফেলেন।

ওই বরকতময় উদ্দেশ্য পূর্ণ করার প্রতি মুসলিমদের উদ্দীপ্ত করে তোলেন। বলতে গেলে, মুতার যুদ্ধে যেন তিনি নিজেই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। রোমানদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি মোকাবিলার মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের শক্তিমত্তা পরিমাপ করে নিতে সক্ষম হন। তাদের

---

৩৬৬ 'বালকা' শাম ও ওয়াদিউল কুরার মধ্যবর্তী এলাকা, যার রাজধানী ছিল আম্মান।

যুদ্ধনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে শামবাসীও ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। এর পর আবু বকর রা.-ও নবিজির এই নীতিতে অটল থাকেন। এ জন্যই নবিজির ইনতিকালের পর তিনি উসামাবাহিনীকে পাঠানোর সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। আর জুল-কিসসায় তিনি বিভিন্ন বাহিনী গঠন করে তাদের নেতা নির্ধারণ করেন। এরপর খালিদ ইবনু সায়িদ ইবনুল আসের নেতৃত্বে একটা বাহিনী শাম-সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দেন। তাঁদের নির্দেশ দেন, তারা যেন তাইমায়[৩৬৭] মুসলিমবাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে অবস্থান করেন। তাঁর পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত যেন সেখান থেকে অন্য কোথাও সরে না যান। শুধু তাদের বিরুদ্ধে যেন লড়াই করেন, যারা তাঁদের মোকাবিলায় আসবে।

২. হিরাক্লিয়াসের বাহিনী গঠন

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে সংবাদটা পৌঁছলে সে আরব গোত্র বাহরা, সালিহ, কালব, লাখাম, জুজাম ও গাসসানের সমন্বয়ে একটা বড় বাহিনী গঠন করে। সংবাদটা পাওয়ামাত্রই খালিদ ইবনু সায়িদ সেদিকে এগিয়ে যান। তিনি সেখানে যাওয়ার পর তারা ভয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। খালিদ ইবনু সায়িদ এ সম্পর্কে আবু বকরকে অবহিত করলে তিনি তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'রোমানরা সংগঠিত হওয়ার আগেই তাদের ওপর চড়াও হবে।[৩৬৮] ফেরার পথ নিরাপদ রাখবে এবং শত্রুভূমির খুব বেশি ভেতরে ঢুকবে না।' সঙ্গে এটাও বলেন, 'অগ্রযাত্রা থামাবে না, আল্লাহর কাছে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করতে থাকবে।'

খালিদ তখন এগিয়ে গিয়ে মৃতসাগরের পথে কাস্তাল পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং মৃতসাগরের পূর্বতীরের রোমানবাহিনীকে পরাস্ত করেন। এর পর তিনি আরও এগিয়ে গেলে রোমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে রোষে ফেটে পড়ে। তারা তখন তাইমার চেয়ে অধিক সেনাসমাবেশ ঘটায়। খালিদ তাদের একত্রিত হতে দেখে বিষয়টা খলিফাকে পত্রমারফত অবগত করেন। তিনি পুরো অবস্থা তুলে ধরে সেনাসাহায্যের আবেদন করেন। আবু বকর রা. তখন ইকরিমার নেতৃত্বে বড় একটা[৩৬৯] বাহিনী পাঠিয়ে দেন। পরে ওয়ালিদ ইবনু

---

৩৬৭ 'তাইমা' শামের পার্শ্ববর্তী শাম ও ওয়াদিউল কুরার মধ্যবর্তী একটি জায়গা।

৩৬৮ *ইতমামুল ওয়াফা ফি সিরাতিল খুলাফা*, মুহাম্মাদ আল খাজারি : ৫৪।

৩৬৯ ইকরিমা রা. ইরতিদাদি যুদ্ধ সমাপ্তির পর কিন্দা ও হাজারামাউত থেকে ইয়ামেন ও মক্কার পথ ধরে ফিরে এসেছিলেন। যখন তিনি মদিনায় এসে পৌঁছান, তখন আবু বকর তাঁকে খালিদ ইবনু সায়িদের সহায়তায় শামের জিহাদে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইকরিমা যে বাহিনী নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, তাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। আবু বকর রা. এর পরিবর্তে আরেকটি বাহিনী গঠন করতে তাঁদের নির্দেশ দেন—তোমরা

উকবার নেতৃত্বে আরেকটা বাহিনী পাঠান। উভয় বাহিনী খালিদের কাঁছে পৌঁছার পর তিনি হামলার নির্দেশ দেন। তাঁরা তখন মারজ আস-সাফারের পথ ধরে এগিয়ে যান।

এদিকে মাহান তার বাহিনী নিয়ে চলে আসে। তারা মুসলিমবাহিনীর দিকে এগিয়ে আসছিল। মুসলিমবাহিনী তখন মৃতসাগরের দক্ষিণে তাবরিয়ার পূর্ব দিকে মারজ আস-সাফারে পৌঁছে যায়। রোমানরা একে মোক্ষম সুযোগ মনে করে হামলা চালিয়ে মুসলিমদের পরাজিত করে। একপর্যায়ে মাহান সায়িদ ইবনু খালিদের নেতৃত্বে একটা ছোট্ট দলকে পেয়ে যায়। সে সায়িদসহ তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করে ফেলে। খালিদ ইবনু সায়িদ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে তাঁর দলবল নিয়ে সরে আসেন। ওদিকে ইকরিমাও বাকি বাহিনী নিয়ে শাম-সীমান্ত পর্যন্ত পিছিয়ে আসতে সমর্থ হন।[৩৭০]

দুই. রোমে হামলার সিদ্ধান্ত ও সুসংবাদসমূহ

১. রোমযুদ্ধের ব্যাপারে আবু বকরের পরামর্শসভা আহ্বান

ক. শীর্ষ সাহাবিদের নিয়ে আবু বকরের পরামর্শসভা

শাম অভিমুখে সেনা পাঠানোর অভিপ্রায়ে আবু বকর রা. শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের নিয়ে পরামর্শসভা আহ্বান করেন। এ জন্য উমর, উসমান, আলি, তালহা, জুবায়ের, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-সহ বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় সাহাবিকে সমবেত করেন। পরামর্শসভার শুরুতে আবু বকর রা. তাঁদের বলেন, 'আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য। মানুষের সৎকাজ এর বিনিময় হতে পারে না। আল্লাহর অসংখ্য প্রশংসা ও শুকরিয়া যে, তিনি আপনাদের এক কালিমার ওপর জড়ো করেছেন। পরস্পরে ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ইসলামের দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। শয়তানকে আপনাদের থেকে দূরে রেখেছেন। আপনাদের ব্যাপারে শয়তানের এই আশা নেই যে, আপনারা শিরকে লিপ্ত হবেন কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ স্থির করবেন। সব আরব মিলে এক জাতি, একই মা-বাবার সন্তান। আমি ইচ্ছা করেছি, শামের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আপনাদের নির্দেশ দেবো। যে মৃত্যুবরণ করবে, সে তো শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করবে। পুণ্যবানদের জন্য আল্লাহর কাছে যা আছে, তা-ই উত্তম। যারা জীবিত থাকবে, তারা আল্লাহর দীনের প্রতিরক্ষার জন্যই জীবিত থাকবে। আল্লাহর কাছে মুজাহিদদের প্রতিদান নিশ্চিত করে নেবে। এটা হচ্ছে আমার মত। এখন আপনারা এ ব্যাপারে নিজ নিজ মত ব্যক্ত করুন।'

ইকরিমার পতাকাতলে জড়ো হয়ে শাম যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

৩৭০ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, খালিদ আল জুনাবি ও নাজার আল হাদিসি : ৫৮।

তাঁর বক্তব্য শেষ হলে কথা বলতে প্রথমে উমর রা. উঠে দাঁড়ান। তিনি আল্লাহর প্রশংসার পর নবিজির ওপর সালাত পাঠ করে বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ যাকে চান তাকে পুণ্যকাজের জন্য চয়ন করেন। আল্লাহর শপথ, আপনি প্রতিটি কল্যাণকাজে আমাদের চেয়ে এগিয়ে থাকেন। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা কেবল তাঁকেই কল্যাণ দান করেন। আল্লাহর শপথ, আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাচ্ছিলাম; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা বোধহয় ভিন্ন ছিল। আপনি এখন বিষয়টি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। আপনি সঠিক চিন্তাভাবনা করছেন। আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করুন। হিদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। অশ্বারোহীর পর অশ্বারোহী, পদাতিকের পর পদাতিক ও দলের পর দল পাঠান। আল্লাহ তাঁর দীনের সাহায্য করবেন। ইসলাম ও মুসলিমদের সম্মান দান করবেন। আল্লাহ তাঁর রাসুলের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন।'

পরে আবদুর রাহমান ইবনু আওফ রা. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসুলের খলিফা, রোমানরা অত্যন্ত শক্তিমান জাতি। আল্লাহর শপথ, আমার মতে আপনি সেখানে একসঙ্গে পুরো বাহিনী পাঠাবেন না; বরং শাম-সীমান্তে ছোট ছোট দলে বাহিনী পাঠান। তারা পর্যায়ক্রমে ওদের ওপর আক্রমণ চালাবে। এভাবেই তাদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে, তাদের ভূখণ্ড আমাদের দখলে চলে আসবে এবং তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শক্তিমত্তা তৈরি হবে। পাশাপাশি আপনি ইয়ামেনবাসী এবং রাবিয়া ও মুজারের লোকদের আপনার পাশে জড়ো করুন। এরপর হয় আপনি নিজে অথবা অন্য কোনো সেনাপতি পাঠিয়ে তাদের ওপর হামলা পরিচালনা করুন।' তাঁর কথা বলা শেষ হলে মজলিস কিছুক্ষণ নীরব থাকে। কেউ কোনো কথা বলেননি। আবু বকর রা. তখন তাঁদের বলেন, 'আল্লাহ আপনাদের ওপর রহম করুন, আপনাদের মতামত কী?'

তখন উসমান রা. দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা এবং নবিজির ওপর দুরুদ পাঠ করে বলতে থাকেন, 'আপনি দীনের একজন কল্যাণকামী। মুসলিমদের ওপর অত্যন্ত দয়ালু। আপনি যখন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং পরিণামের দিক দিয়ে এটাকে কল্যাণকর মনে করেছেন, তখন আমার মত হচ্ছে, আপনি নির্ভয়ে তা বাস্তবায়ন করুন। আমরা যেমন আপনার ধারণাকে সংকীর্ণ মনে করি না, তেমনি আপনার নিষ্ঠাকে প্রশ্নবিদ্ধ করব না।' তাঁর এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে তালহা, জুবায়ের, সাআদ, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, সায়িদ ইবনু জায়েদ রা.-সহ সকল আনসার ও মুহাজির সাহাবি একবাক্যে বলে ওঠেন, 'উসমান সঠিক বলেছেন। আপনি আপনার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করুন। আমরা আপনার কথা শুনব, মানব। আপনার সিদ্ধান্তকে কখনো প্রশ্নবিদ্ধ করব না।'

সাহাবিরা এভাবে কথাবার্তা বলছিলেন; কিন্তু আলি রা. ছিলেন সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। আবু বকর রা. তখন তাঁকে বলেন, 'আবুল হাসান, আপনি কী বলেন?' জবাবে আলি

বলেন, 'আপনি একজন বরকতময় ব্যক্তি। আপনার সিদ্ধান্ত ও পরামর্শে বরকত নিহিত। যদি আপনি নিজে তাদের বিরুদ্ধে বের হন কিংবা অন্য কাউকে পাঠান, তাহলে ইনশাআল্লাহ মুসলিমরা বিজয় ও সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।' আবু বকর বলেন, 'আল্লাহ আপনাদের সুসংবাদ শুনতে দিন। আপনি এটা কীভাবে জানলেন?' আলি বলেন, 'আমি নবিজিকে বলতে শুনেছি—"এই দীন বরাবর তার বিরুদ্ধবাদীদের ওপর বিজয়ী থাকবে; আর কিয়ামত পর্যন্ত এই দীন স্বীকারকারীরা বিজয়ী থাকবে।"'

আলির মুখে হাদিসটি শুনে তিনি বলেন, 'আপনি যা শুনিয়েছেন, তা কতই-না প্রিয়! আপনি আমাকে আনন্দিত করে তুলেছেন। আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে আপনাকেও আনন্দিত করুন।' এরপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা এবং নবিজির ওপর দুরুদ পাঠ করে বলেন, 'লোকসকল, আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আপনাদের পুরস্কৃত করেছেন; আর জিহাদের মাধ্যমে সম্মান দান করেছেন। এই দীনের মাধ্যমে অন্যসব ধর্মাবলম্বীর ওপর আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। অতএব, আল্লাহর বান্দারা, শামে রোমানদের ওপর আক্রমণের জন্য তৈরি হোন। আমি আপনাদের সেনাপতি নির্ধারণ করে দেবো। তাদের যুদ্ধ-পতাকা দেবো। আপনারা আপনাদের রবের আনুগত্য করুন। নিয়ত ও জীবনকে শুদ্ধ করুন। হালাল খাবার ভক্ষণ করুন। কারণ, আল্লাহ তো তাদের সঙ্গেই থাকেন, যারা মুত্তাকি এবং যারা সৎকাজ করে।'[৩৭১]

এর পর তিনি বিলাল রা.-কে লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দেন। বিলাল তখন এই বলে ঘোষণা দেন, 'মুসলিমরা, তোমরা শামে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নাও।'[৩৭২]

খ. পরামর্শসভা গুরুত্বপূর্ণ দিক

- এই পরামর্শসভা থেকে আমাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রে আবু বকরের কার্যপদ্ধতি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, তিনি ততক্ষণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেন না, যতক্ষণ-না কর্তৃত্ব ও সমাধানের যোগ্যতাধারী সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এরপর আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে যে সিদ্ধান্তই সামনে আসত, সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতেন। এটি রাসুলের সুন্নাহ। সিরাতের গ্রন্থসমূহে আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই, যেখানে তিনি এমন কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

---

[৩৭১] এই অর্থসংবলিত অনেক বর্ণনা বিভিন্ন সাহাবির থেকে বর্ণিত হয়েছে। দ্র. *সহিহ বুখারি*, আল-ইতিসাম : ৭৩১১। *সহিহ মুসলিম*, আল-ইমারাহ অধ্যায় : ১৫৩৩।

[৩৭২] *তারিখু দিমাশক*, ইবনু আসাকির : ২/৬৩-৬৫—হুমায়দি।

- এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলে আমাদের সামনে এ সত্যই প্রতিভাত হয়ে ওঠে যে, রোমে আক্রমণের ব্যাপারে সাহাবিদের সর্বসম্মত অভিমত পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য আক্রমণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁদের মতভিন্নতা ছিল। উমরের মত ছিল, 'বাহিনীর পর বাহিনী পাঠানো, যাতে শামে মুসলিমদের এমন এক বিশাল বাহিনী জড়ো হয়ে যায়, যারা শত্রুদের বুখে দাঁড়াবে।' আবদুর রাহমান ইবনু আওফের মত ছিল, 'প্রথমে ছোট ছোট বাহিনীর মাধ্যমে আক্রমণ গড়ে তোলা হোক, যারা শামে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে মদিনায় আসা-যাওয়া করবে। এরপর যখন শত্রুরা ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন বিশাল বাহিনী নিয়ে হামলে পড়া যাবে।' আবু বকর রা. আক্রমণের ক্ষেত্রে উমরের মতকে অগ্রাধিকার দেন; আর ইয়ামেনবাসী ও আরবের বিভিন্ন গোত্রের সহায়তা চাওয়ার ক্ষেত্রে আবদুর রাহমান ইবনু আওফের মত দ্বারা উপকৃত হন।[৩৭৩]

২. ইয়ামেনবাসীকে যুদ্ধে বেরোনোর নির্দেশসংবলিত চিঠি

আবু বকর রা. পত্রযোগে ইয়ামেনবাসীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। তাঁর সে চিঠির ভাষ্য ছিল,

> *বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।*
>
> *আল্লাহর রাসুলের খলিফার পক্ষ থেকে ইয়ামেনের সে-সকল মুমিন মুসলিমের প্রতি, যাদের এই চিঠি পড়ে শোনানো হবে।*
>
> *আসসালামু আলাইকুম।*
>
> *আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।*
>
> *নিঃসন্দেহে আল্লাহ ইমানদারদের ওপর জিহাদ ফরজ করেছেন। তাদের নির্দেশ দিয়েছেন তারা যেন জিহাদের জন্য বের হয়—চাই চলাফেরা তার ওপর ভারী হোক কিংবা হালকা। আল্লাহর রাস্তায় যেন তারা জানমাল দ্বারা জিহাদ করে। কারণ, জিহাদ হচ্ছে ফরজ ইবাদত। আল্লাহর কাছে এর অনেক বড় সাওয়াব রয়েছে। আমরা শামে রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য মুসলিমদের আহ্বান করছি। যারা দ্রুত বেরিয়ে এসেছেন, তাদের নিয়ত সঠিক। এর জন্য রয়েছে বিশাল পুণ্য।*
>
> *আল্লাহর বান্দারা, তোমরাও জিহাদের দিকে দ্রুত বেরিয়ে এসো। নিজেদের নিয়ত ঠিক করে নাও। তোমাদের জন্য দুটি কল্যাণের একটি নিশ্চিত—*

---

[৩৭৩] *আত-তারিখুল ইসলামি, হুমায়দি : ৯/১৮৮।*

হয় তোমরা শাহাদাতবরণ করবে, নতুবা বিজয় ও গনিমত নিয়ে ফিরবে। আল্লাহ তাআলা বান্দার কাজ ছাড়া কেবল কথায় সন্তুষ্ট হন না। আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে ততক্ষণ যুদ্ধ চলতে থাকবে, যতক্ষণ-না তারা সত্য গ্রহণ করে, কুরআনের নির্দেশের স্বীকৃতি দেয়।

আল্লাহ তোমাদের দীনকে হিফাজত করুন। তোমাদের অন্তরসমূহ হিদায়াতপ্রাপ্ত করুন। তোমাদের আমলসমূহ পবিত্র করুন। ধৈর্যধারণকারী মুজাহিদদের সাওয়াব তোমাদের দান করুন।[৩৭৪]

আবু বকর রা. আনাস ইবনু মালিকের মাধ্যমে চিঠিটা পাঠিয়েছিলেন। এ চিঠির মাধ্যমে মুসলিমদের এক পতাকাতলে নিয়ে আসা ও জিহাদের প্রতি তাঁদের উৎসাহ প্রদানের কৃতিত্ব প্রকাশ পায়। এটাকেই সেনাবাহিনীর সদস্যপদে সাধারণ ভর্তি নামে অভিহিত করা যায়।[৩৭৫] ইয়ামেনবাসীর নামে আবু বকরের এ চিঠি পাঠানোর ফলে সেখানকার বিপুলসংখ্যক মানুষ চারদিক থেকে স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্ট চিত্তে যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে পড়েন।

খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে আনাস রা. ইয়ামেনের প্রতিটা গোত্রের কাছে যেতেন এবং সেটা পড়ে শোনাতেন। যুদ্ধে দ্রুত বেরোতে আগ্রহ জোগাতেন। তিনি বলেন, যারাই চিঠির আহ্বান শুনেছে, তারাই আমাকে সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে। তারা বলছিল, 'আমরা বেরিয়ে পড়ছি।' একপর্যায়ে জুল-কিলার কাছে গিয়ে তাঁকে চিঠিটা পড়ে শোনাই। তখনই তিনি নিজের ঘোড়া ও অস্ত্র চেয়ে পাঠান। এরপর পুরো গোত্রে চক্কর দিয়ে যুবকদের অবিলম্বে বেরিয়ে আসার নির্দেশ দেন। দেখতে দেখতে ইয়ামেনের বিপুলসংখ্যক মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। তিনি তখন তাদের বলেন, 'তোমাদের কল্যাণকামী ভাইয়েরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিশাল প্রতিদানের প্রতি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। অতএব, যারা এই পুণ্যকাজে অংশগ্রহণে আগ্রহী, তারা আমাদের সঙ্গে দ্রুত বেরিয়ে পড়ো।'[৩৭৬]

আনাস রা. ১২ হিজরির ১১ রজব মদিনায় পৌঁছে আবু বকরকে ইয়ামেনবাসীর আগমনের সুসংবাদ দেন। তিনি বলেন, 'ইয়ামেনের বাহাদুর, দুঃসাহসী অশ্বারোহীরা বিক্ষিপ্ত চুল ও ধুলোমলিন অবস্থায় আপনার কাছে চলে আসছে। তারা তাদের মালসামানা এবং নারী-শিশুদের সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে।' আনাস রা. ফিরে আসার অল্প কদিনের মধ্যেই অর্থাৎ, ১২ হিজরির ১৬ রজব জুল-কিলা হিমইয়ারি তাঁর গোত্রের লোকজনকে নিয়ে মদিনায় এসে পৌঁছান। এই নিঃশর্ত গ্রহণযোগ্যতা কেবল হিমইয়ারিদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল

---

৩৭৪ *তারিখু ফুতুহিশ শাম*, বালাজুরি : ৪৮; *তাহজিবু তারিখি দিমাশক* : ১/১২৯।

৩৭৫ *তারিখুদ দাওয়া ইলাল ইসলাম* : ২৯৪।

৩৭৬ *আল-কামিল*, ইবনু আসির : ২/৬৪; *আল-ইয়ামান ফি সাদরিল ইসলাম* : ৩০১-৩০২।

না; বরং ইয়ামেন থেকে যারাই মদিনায় এসেছিল, তাদের সবার অবস্থাই ছিল এমন। উদাহরণত, হামাদানের লোকজন হামজা ইবনু মালিকের নেতৃত্বে ২ হাজারের অধিক যোদ্ধা নিয়ে মদিনায় আসে।[৩৭৭]

ইয়ামেনবাসী মদিনায় আসার পর মসজিদে নববিতে আবু বকরের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর থেকে কুরআনের বাণী শুনতে পায়, তখন আল্লাহর ভয়ে তাদের অন্তরে কম্পন শুরু হয়ে যায়। তারা তখন নিজেদের ধরে রাখতে পারেনি। তাদের কাঁদতে দেখে আবু বকরও কান্নায় ভেঙে পড়েন। কান্নাবিজড়িত কণ্ঠেই বলেন, 'আমরাও তো এমন ছিলাম; কিন্তু ধীরে ধীরে আমাদের অন্তর পাষাণ হয়ে গেছে।'[৩৭৮]

৩. জুল-কিলার খোদাভীরুতা

জুল-কিলা যখন আবু বকরের প্রতি তাকিয়ে দেখেন, তিনি একজন শীর্ণকায় বুড়ো। চেহারা মাংসল নয়। গায়ে মোটা কাপড়, চাকচিক্যহীন; কিন্তু চেহারা থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে ইবাদত ও আল্লাহভীতির দ্যুতি। জুল-কিলা যখন ইয়ামেন থেকে আবু বকরের কাছে আসেন, তখন তাঁর আশেপাশে ছিল ১ হাজার অশ্বারোহী গোলাম। মাথায় ছিল মুকুট। তাঁর জামার মূল্যবান পাথরগুলো দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। তাঁর চাদরে সোনালি সুতোর ওপর মণিমাণিক্যখচিত ছিল। তিনি ও তাঁর সাথিরা আবু বকরের দুনিয়াবিমুখতা, পরহেজগারি আর সাধারণ বেশভূষা দেখে একেবারে হতবাক হয়ে পড়েন। তাঁরা তখনই সেসব পোশাক খুলে আবু বকরের মতো সাধারণ বেশ ধারণ করেন।

জুল-কিলা আবু বকরকে দেখে বেশ প্রভাবিত হন। তিনি তাঁর মতো পোশাক গায়ে চড়িয়ে নেন। একদিন লোকজন তাঁকে মদিনার বাজারে দেখতে পায়—তার কাঁধে রয়েছে বকরির চামড়া। গোত্রের লোকজন তাঁকে এমন অবস্থায় দেখতে পেয়ে একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে। তাঁকে বলতে থাকে, 'আপনি তো দেখি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে আমাদের অপমানিত করে ছাড়বেন।' জুল-কিলা তাদের বলেন, 'আপনারা কি চান, জাহিলিয়াতের সময় আমি যেমন অহংকারী আর দাম্ভিক ছিলাম, এখনো তেমন থেকে যাই? আল্লাহর শপথ, এমনটা হতেই পারে না। দুনিয়ার জীবনে কেবল আল্লাহর আনুগত্য, বিনয় আর পরহেজগারিই থাকতে পারে।'[৩৭৯]

জুল-কিলা হিমইয়ারি যা করেছিলেন, ইয়ামেনের অন্য বাদশাহরাও তা থেকে পিছিয়ে ছিলেন না। তাঁরাও তাঁদের পোশাক আর মূল্যবান পাথরখচিত মুকুটগুলো শরীর থেকে

---

[৩৭৭] *আল-ইয়ামান ফি সাদরিল ইসলাম* : ৩০২।

[৩৭৮] *আস-সিদ্দিক আওয়ালুল খুলাফা* ১১৪; *আবু বকর*, তানতাবি : ২১৮।

[৩৭৯] *মুরুজুজ জাহাব*, মাসউদি : ২/৩০৫।

নামিয়ে নিয়েছিলেন। মণিমুক্তাখচিত মখমলের মিহি কাপড়গুলোও ছুড়ে ফেলেন। এরপর মদিনার বাজার থেকে মোটা কাপড়ের পোশাক কিনে গায়ে জড়িয়ে নেন। আবু বকর রা. তাঁদের সেই মূল্যবান পোশাকগুলো বায়তুলমালে জমা করেন।[৩৮০]

রাসুলের পর নিজের জীবনে ইসলাম বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে আবু বকরই ছিলেন সবার শীর্ষে। তিনি যুগোপযোগী ভাষায় মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানাতেন। সবচেয়ে কার্যকর উপদেশ তো তা-ই, যা মানুষ কেবল কানে না শুনে চর্মচক্ষে দেখতে পায়। উত্তম উপদেশকারী তো সে-ই, যে জিহ্বার ভাষায় উপদেশ না দিয়ে কাজের ভাষায় উপদেশ দিয়ে থাকে।

ইয়ামেনের বাদশাহরা যখন দেখতে পান আবু বকর রা.—পুরো জাজিরাতুল আরব যাঁর নির্দেশে চলে—অতি সাধারণ পোশাক ও পাগড়ি পরে মদিনার বাজারে ঘোরাফেরা করেন, তখন তাঁরা এই বাস্তবতার সন্ধান পেয়ে যান যে, কারুকার্যখচিত পোশাকের চেয়ে আও বড় কিছু রয়ে গেছে; আর সেটা হচ্ছে মহান ব্যক্তিত্ব। তাই তাঁরা আবু বকরের সাযুজ্য অবলম্বনে দ্রুত মনোযোগ দেন। তাঁরা তখন মুকুট ও কারুকার্যখচিত পোশাক পরা অবস্থায় আবু বকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লজ্জা অনুভব করতে থাকেন। তাঁর সামনে নিজেদের ছোট অনুভব করতে থাকেন। তাঁরা তাঁদের আত্মম্ভরিতা ও অহংকার দূরে ছুড়ে ফেলেন। যেভাবে ছোট ছোট তারকা সূর্যের মোকাবিলায় ম্লান হয়ে আসে, আবু বকরের সামনে তাঁদের অবস্থাও হয় অনুরূপ। আল্লাহ আবু বকরের ওপর রহম করুন। তিনি বিনয়ে ছিলেন অনেক ঊর্ধ্বে এবং মর্যাদার অনুপাতে ছিলেন একেবারে বিনয়ী।[৩৮১]

তিন. সেনাপতি নিয়োগ ও বাহিনী প্রেরণ

আবু বকর রা. শামে বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। লোকজনকে জিহাদের দাওয়াত দেন এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি চারটি বাহিনী প্রস্তুত করেন :

১. ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ানের বাহিনী

এটিই ছিল সেই প্রথম বাহিনী, যারা শাম অভিমুখে এগিয়ে গিয়েছিল। ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ানের দায়িত্ব ছিল, দামেশক জয় করার পর অপর তিনটি বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। ইয়াজিদের বাহিনীতে প্রথমদিকে সেনাসংখ্যা ছিল

---

৩৮০ *আস-সিদ্দিক আওয়ালুল খুলাফা* : ১৩৭-১৩৮।

৩৮১ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক*, আলি তানতাবি : ২১৯।

৩ হাজার। এরপর খলিফা আরও সাহায্যকারী মুজাহিদ পাঠিয়েছিলেন। ফলে তাঁর বাহিনীর সদস্যসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় ৭ হাজার। ইয়াজিদের বাহিনী পাঠানোর আগে আবু বকর রা. প্রভাব বিস্তারকারী গুরুত্বপূর্ণ যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ছিল যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারে স্পষ্ট প্রজ্ঞাপূর্ণ। তিনি পায়ে হেঁটে এগিয়ে গিয়ে ইয়াজিদকে বিদায় জানান এবং উপদেশস্বরূপ বলেন,

> আমি তোমাকে পরীক্ষা করতে শাসক নিযুক্ত করছি। তোমার অভিজ্ঞতা যাচাই করব। তোমাকে অভিজ্ঞ করে তুলব। যদি সুচারুরূপে দায়িত্ব পরিচালনা করতে পারো, তাহলে তোমাকে পুনরায় ওই কাজে নিযুক্ত করব। আরও বড় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেবো; কিন্তু ত্রুটি করলে তোমাকে পদচ্যুত করব। আল্লাহভীতিকে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে ধারণ করবে। তিনি তোমার ভেতরটা সেভাবে দেখে থাকেন, যেভাবে বাহ্য অবস্থা দেখে থাকেন। সে ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহের অধিক দাবিদার, যে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের দাবি বেশি করে আদায় করে থাকে। সে-ই আল্লাহর নৈকট্যধন্য, যে নিজের কাজকর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্যপ্রার্থী হয়।
>
> আমি খালিদের[৩৮২] জায়গায় তোমাকে নিযুক্ত করেছি। সাবধান, জাহিলিয়াতের সাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে বেঁচে থাকবে। আল্লাহর কাছে এমন লোক চূড়ান্ত পর্যায়ের ঘৃণিত। নিজ বাহিনীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে। তাদের কল্যাণের অঙ্গীকার দেবে। যখন উপদেশ দেবে, সংক্ষিপ্ততা অবলম্বন করবে। কারণ, কথা লম্বা হয়ে গেলে তাতে অপ্রয়োজনীয় বিষয় এসে যায়। নিজেকে ঠিক রাখবে, তখন মানুষও তোমার জন্য ঠিক হয়ে যাবে। সালাতসমূহ যথাসময়ে রুকু-সিজদার সঙ্গে পূর্ণরূপে আদায় করবে। সালাতে বিনয় ও নম্রতাকে গুরুত্ব দেবে। শত্রুবাহিনীর কোনো দূত এলে সম্মান করবে এবং দ্রুত বিদায় করে দেবে। তারা যাতে তোমার সেনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কোনো তথ্য নিয়ে যেতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। নিজেদের কোনো বিষয় তাদের সামনে প্রকাশ করবে না। তারা যেন তোমার কোনো দুর্বলতা জানতে না পারে, সে ব্যাপারে চৌকশ থাকবে। তাদেরকে সেনাবাহিনীর মধ্যখানে রাখবে, যাতে মুসলিমবাহিনীর শক্তি দেখে ভীত হয়ে পড়ে। তাদের সঙ্গে নিজের লোকদের আলাপ জমাতে নিষেধ করবে। নিজেই তাদের সঙ্গে কথা বলবে। কখনো রহস্য উন্মোচন করবে না। যখন পরামর্শ নেবে, সত্য কথা

[৩৮২] খালিদ ইবনু সায়িদ রা. পদত্যাগপত্র দিলে আবু বকর রা. সেটি গ্রহণ করেন।

বলবে; তাহলে সঠিক পরামর্শ পাবে। পরামর্শকদের থেকে কোনো ঘটনা গোপন করবে না, নতুবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

সাথিদের সঙ্গে রাতে কথাবার্তা বলবে, তাহলে দিনের সংবাদ জানতে পারবে। এমতাবস্থায় তোমার সামনে থেকে পর্দা সরে যাবে। নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীতে বেশিসংখ্যক সদস্য রাখবে। সেনাবাহিনীর মধ্যে তাদের ছড়িয়ে দেবে। আগাম না জানিয়ে আচমকা মাঝেমধ্যে তাদের কাছে যাবে। যাকে দায়িত্ব পালনে গুরুত্বহীন পাবে, তাকে খুব শাসাবে। বাড়াবাড়িহীন শাস্তি দেবে। রাতে পাহারার দায়িত্ব বণ্টন করে দেবে এবং প্রথম প্রহরের কর্তব্যপালন শেষ রাতের কর্তব্যপালন থেকে কিছুটা বেশি রাখবে। দিনের কাছাকাছি হওয়ায় এই পর্যায়টা হয়ে থাকে সহজ। শাস্তিযোগ্য ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে ভয় করবে না। এ ক্ষেত্রে নম্র ব্যবহার করবে না। হ্যাঁ, শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে দ্রুততার আশ্রয় নেবে না; বরং (শাস্তি না দেওয়ার) অজুহাতের সন্ধানে থাকবে।

নিজের বাহিনী সম্পর্কে বেখবর থাকবে না, নাহয় তারা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে তাদের হেনস্তা করবে না। তাদের গোপন বিষয় মানুষের কাছে প্রকাশ করবে না। তাদের বাহ্য আচরণকেই যথেষ্ট মনে করবে। বেকারশ্রেণির মানুষের সঙ্গে উঠাবসা করবে না। সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত মানুষের সঙ্গেই উঠাবসা রাখবে। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার সময় দৃঢ়তা দেখাবে, ভীরুতা প্রদর্শন করবে না। গনিমতের সম্পদে খিয়ানত থেকে বেঁচে থাকবে। এটা মানুষকে অভাবগ্রস্ত করে তোলে, বিজয় ও সাহায্য রুখে দেয়। তোমরা এমন মানুষেরও সাক্ষাৎ পাবে, যারা ইবাদতখানায় ইবাদতে লিপ্ত, তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দেবে।

আল্লামা ইবনু আসির রাহ. বলেন, এটা হচ্ছে শাসকদের উদ্দেশে সর্বোত্তম উপদেশ।[৩৮৩]

২. এই উপদেশসমূহের শিক্ষণীয় দিক

- নেতৃত্ব ও পদ কোনো চিরস্থায়ী অধিকার নয়; বরং এটি উত্তম কৃতিত্ব, সফল দায়িত্ব সম্পাদনের পুরস্কার। যদি কেউ সুন্দর কৃতিত্ব দেখাতে না পারে, দায়িত্ব সম্পাদনে অলসতা দেখায়, তাহলে প্রয়োজনে তাকে পদচ্যুত করতে হবে।
- এই অনুভূতি একজন মানুষকে মানগত দিক দিয়ে শীর্ষে পৌঁছাতে অধিক শ্রম

---

[৩৮৩] *আল-কামিল*, ইবনু আসির : ২/৬৪-৬৫।

ও শক্তি ব্যয়ের প্রতি উৎসাহ জোগায়। যখন তার অনুভূতিতে এটা বসে যাবে যে, সে যা-ই করুক না কেন, তাকে তার পদ থেকে হটিয়ে দেওয়ার মতো কেউ নেই, তখন তার কাজে আলস্য এসে যাওয়া ও দুনিয়ার প্রতি তার ঝুঁকে পড়া অবধারিত হয়ে যায়। এতে দায়িত্ব আদায়ে ত্রুটি আসে। আর অধীনদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসাদ, দুষ্কর্ম, মতবিরোধ ও ঝগড়া বেড়ে যায়।

- আমলের ক্ষেত্রে তাকওয়া হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আল্লাহ তাআলা বান্দার বাহির-ভেতর সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তারা নিজেদের গুপ্ত বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করলে বাহ্য অবস্থায়ও তাকওয়া অবলম্বন করবে। আর এভাবে শাসকশ্রেণি ফ্যাসাদ ও অরাজকতা থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবে, যা সাধারণত লাগামহীন জজবার কারণে সৃষ্ট হয়ে থাকে, যেখানে আল্লাহভীতি মোটেও পাওয়া যায় না।

- ওয়াজ-নসিহতের ক্ষেত্রে কথা সংক্ষিপ্ত করার ব্যাপারে লক্ষ রাখা দরকার। নতুবা মূল কথা ভুলে যাওয়া এবং উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলার প্রবল আশঙ্কা থাকে। শ্রোতারা বক্তব্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে বক্তব্যের ভাষালংকারে হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে বক্তব্যের মধ্যে যদি সাহিত্যের সৌন্দর্য বা উপস্থাপনার সৌকর্য না থাকে, তাহলে শ্রোতা বিরক্ত হয়ে উঠবে। তখন বক্তার বক্তব্য তার কানে ঢুকে না।

- যদি দায়িত্বশীল নিজেকে সংশোধন করে, নিজের দোষত্রুটির ব্যাপারে সতর্ক থাকে, নিজেকে অন্যদের আদর্শ হিসেবে গড়ে তোলে, তাহলে তার নিজের পরিবর্তনই অন্য মানুষের সংশোধনের জন্য নিয়ামক হয়ে উঠবে।

- বাহ্যিক ও অন্তরঙ্গভাবে সালাতসহ ইবাদতগুলোকে তার সঠিক অবস্থান থেকে আদায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। বাহ্যত সালাতকে পূর্ণতার সঙ্গে আদায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে সালাতের রুকনগুলো যথাযথভাবে আদায় করা; আর অন্তরঙ্গতার অর্থ হচ্ছে একাগ্রতার সঙ্গে আদায় করা। এভাবে সালাত আদায়ের মাধ্যমেই জমিনে আল্লাহর জিকিরের দায়িত্ব আদায় হয়ে থাকে। এ ধরনের সালাতই মানুষের কাজ ও ব্যবহারকে সংস্কার করতে পারে। অন্তরে শক্তি বাড়ায়। আত্মাকে প্রশান্ত করে। বিপদাপদে মুসলিমদের আশ্রয় গণ্য হয়।

- শত্রুবাহিনীর দূত এলে তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করা উচিত। তবে মুসলিমবাহিনীর রহস্য সম্পর্কে তাদের অবহিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না। তাদের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার মূলত একপ্রকার দাওয়াহ। এর মাধ্যমে

শত্রুদের কাছে মুসলিমদের উত্তম আচরণের বার্তা পৌঁছে যায়। তবে সৌজন্য এ পর্যায়ের হবে না, যার ফলে শত্রুরা মুসলিমদের রহস্য সম্পর্কে অবগত হয়ে যায়। তাদের সামনে মুসলিমদের শক্তিমত্তা তুলে ধরা দরকার, যাতে তারা দেশে গিয়ে নিজের জাতিকে মুসলিমদের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করে। এভাবে শত্রুরা যেন আগে থেকেই মুসলিমদের ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়ে।

- রহস্যগুলো সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় গোপন রাখার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিশেষত যেসব গোপনীয়তা মুসলিমদের স্বার্থ ও নিরাপত্তাসংশ্লিষ্ট। এতে অলসতা করা যাবে না। মানুষ যতক্ষণ কোনো গোপনীয়তা তার মনের ভেতর লুকিয়ে রাখতে পারে, ততক্ষণ সে বিচক্ষণ গণ্য হয়; কিন্তু যখন তার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়, তখন সব বিষয় তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, সব ছত্রখান হয়ে যায়।

- পরামর্শ গ্রহণের যথার্থতা পরামর্শের পরিণতি নিয়ে চিন্তাভাবনা থেকে শ্রেয়তর। পরামর্শদাতা তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও পরামর্শ প্রদানে অভিজ্ঞ থাকলেও যে বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে, সেটা পরামর্শ গ্রহণকারীর কাছে স্পষ্ট না থাকলে পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে কোনো কল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়। পরামর্শ গ্রহণকারী যদি বিষয়টা পরামর্শদাতার কাছে বিস্তারিত না বলে, তাহলে সে প্রকারান্তরে নিজের ওপরই জুলুম করল। এ ধরনের পরামর্শগ্রহণ অর্থহীন।

- নেতা ও দায়িত্বশীলদের জন্য তাঁদের অধীনদের সঙ্গে মিলেমিশে চলা দরকার, যাতে তাদের সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা যায়। এতে তাদের সমস্যাবলি শোনা ও এর যথাযথ সমাধান সহজ হয়। যে-সকল নেতা ও দায়িত্বশীল কেবল উচ্চপদস্থ লোকদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সাধারণ লোকদের সঙ্গ এড়িয়ে চলে, তারা তথ্যের আদ্যোপান্ত জানতে ব্যর্থ হয়। তারা কেবল ওই বিশেষ লোকদের দেওয়া সংবাদই জানতে পারে, যা অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত হতে পারে। এ ছাড়া এ কারণে অনেক সময় ভুল বিষয় সামনে এসে যেতে পারে।

- মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে শঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে। তবে নিরাপত্তারক্ষী ও প্রহরীদের ওপর ভরসা করে থাকা উচিত হবে না; বরং এদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে, যাতে তাদের অলসতার কারণে মুসলিমদের কোনো ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে।

- নির্দেশ অমান্যকারীদের শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত। তবে অভিযুক্ত প্রমাণিতদের শাস্তিপ্রদানে কোনো প্রকার অবহেলা করা যাবে না। এতে অতিরিক্ত বিরোধিতা এবং নির্দেশ অমান্য করায় তারা

দুঃসাহসী হয়ে উঠতে পারে। এ ছাড়া শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোরতা পরিহার আবশ্যক। নতুবা তাদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়তে পারে, তারা দলবাজির উদ্যোগী হয়ে উঠতে পারে। শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কৌশল, ভারসাম্য, দূরদর্শিতা ও চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন, যাতে দীক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায় এবং কোনো প্রকার ফ্যাসাদ কিংবা অসন্তোষ সৃষ্টি না হয়।

- দায়িত্বশীলদের সতর্ক থাকা অপরিহার্য। তার কর্তৃত্বের ভেতরে যা কিছু সংঘটিত হয়, তা জানা থাকতে হবে। জনগণ যেন বুঝতে পারে তাদের বিষয় গুরুত্বসহকারে দেখা হচ্ছে। এমন হলে ভালোকাজ সম্পাদনকারীদের অন্তরে অধিকতর সুধারণার জন্ম নেবে এবং মন্দকাজে জড়িতরা মন্দকাজ থেকে বিরত থাকবে। তবে লক্ষ রাখতে হবে, অধীনদের মধ্যে গোয়েন্দাগিরি চালানো যাবে না। এতে প্রকারান্তরে তাদের অপমানিত করা হয়। ফলে তাদের অন্তর থেকে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও কৃতজ্ঞতাবোধ উধাও হয়ে যাবে; অথচ এটাই শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রাখে। সম্পর্ক যতক্ষণ অটুট থাকবে ততক্ষণ সত্যবিভ্রান্ত লোকজন এমন বিরোধিতার সুযোগ পাবে না, যার ফলে সমাজে ফ্যাসাদ ও অরাজকতা বিরাজ করে। যখন এই সম্পর্ক ভেঙে যাবে, মন্দকাজ থেকে বিরতকারী কেউ থাকবে না, তখন বিষয়টার সমাধান কঠিন হয়ে পড়বে। এর জন্য বিশাল শক্তির প্রয়োজন। এটা এমন বিষয়, যার অনিষ্ট একেবারে স্বতঃসিদ্ধ।

- সেনাপতি ও কমান্ডারদের জন্য শত্রুর মোকাবিলায় দৃঢ়তা প্রদর্শন জরুরি। কোনো অবস্থায়ই ভীরুতা প্রদর্শন করা যাবে না। নেতাদের ভীরুতা সাধারণ সেনাদের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে। এর পরিণতি হয় পরাজয় ও লজ্জা। যুদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে নেতার জন্য দুঃসাহস প্রদর্শন আবশ্যক। নেতাদের দুর্বলতা তাদের অধীনকে দুর্বল করে ফেলবে। এতে কাজ আদায়ের গতি হ্রাস পাবে। ফলাফল মন্দ হবে।

- সেনাপতি ও কমান্ডাররা গনিমতের সম্পদে কোনো প্রকার খিয়ানত করতে পারবে না। গনিমত বণ্টনের আগে এর থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। যুদ্ধময়দান ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও দায়িত্বশীলদের জন্য এমন কোনো দুনিয়াবি স্বার্থ আদায় করা যাবে না, যা শরিয়তসিদ্ধ নয়। যেমন : এমন কোনো হাদিয়া-তুহফা গ্রহণ, যার উদ্দেশ্য হয় দায়িত্বশীলকে প্রভাবিত করা, সত্য থেকে বিচ্যুত করা। এটাও একধরনের খিয়ানত। এই খিয়ানতের পরিণতি হচ্ছে দরিদ্রতা ও অভাব এবং বিজয় ও সাহস থেকে বঞ্চিতি।

- উপর্যুক্ত গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ থেকেই অনুধাবন করা যায়—আবু বকর রা. সবসময় মুসলিমদের কল্যাণচিন্তা লালন করতেন। সেনাপতিরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন, তিনি তা ভালোভাবে জানতেন। তারা এ থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পেতে পারেন, সে ব্যাপারে তাদের সঠিক সমাধানে সাহায্য করতেন।

এ উপদেশ এবং এর মতো আরও অসংখ্য উপদেশ আবু বকরের অবস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে। আপনি তাঁর রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। মনে হবে তিনি নিজেই যেন সেনাপতি ও কমান্ডারদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত। আর যখন তাঁর নম্রতা ও স্নেহ-ভালোবাসা দেখবেন, তখন মনে হবে তিনি যেন দরদি দায়ি। তিনি মুমিনদের ব্যাপারে ছিলেন দয়ালু। সত্য ও উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীদের মর্যাদাদানকারী। যোগ্যতা ও ক্ষমতার অধিকারীদের ব্যাপারে অবগত। আল্লাহর শত্রু কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর।[৩৮৪]

৩. শুরাহবিল ইবনু হাসানার বাহিনী

ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ানের বাহিনী পাঠানোর তিন দিন পর শুরাহবিল ইবনু হাসানার বাহিনী পাঠান। সেদিন তিনি শুরাহবিলকে বিদায় দিতে গিয়ে বলেন, 'শুরাহবিল, আমি ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ানকে যেসব উপদেশ দিয়েছি, সেগুলো তুমি শুনেছ?' শুরাহবিল বলেন, 'জি, অবশ্যই।' আবু বকর বলেন, 'আমি তোমাকেও সেসব উপদেশ দিচ্ছি। এ ছাড়া আরও কিছু উপদেশ দিচ্ছি, যা ইয়াজিদকে দিইনি। আমি তোমাকে যথাসময়ে সালাত আদায়, যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় কিংবা শাহাদাত পর্যন্ত দৃঢ়পদ থাকা, রোগীদের দেখাশোনা করা, জানাজায় অংশগ্রহণ এবং সর্বাবস্থায় অধিকহারে আল্লাহর জিকিরের উপদেশ দিচ্ছি।' শুরাহবিল বলেন, 'আল্লাহ সাহায্যকারী। আল্লাহর যা ইচ্ছা, তা-ই হয়ে থাকে।'[৩৮৫]

শুরাহবিলের সেনাদলের সংখ্যা ছিল ৩ থেকে ৪ হাজার। আবু বকর তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'প্রথমে তাবুক ও বালকায় যাবে, এরপর বসরা অভিমুখে রওনা হবে। সেটাই হবে তোমার শেষ গন্তব্য।' তিনি তখন বালকার দিকে এগোতে থাকেন। তাঁর বাহিনীকে উল্লেখযোগ্য কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। শুরাহবিলবাহিনী আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহের বাহিনীর বাম পাশ এবং আমর ইবনুল আসের ডান পাশ হয়ে পথ অতিক্রম করে বালকায় পৌঁছায়। এরপর বসরায় গিয়ে শহরটা অবরোধ করে, তবে

---

[৩৮৪] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/১৯২-১৯৭।

[৩৮৫] *ফুতুহুশ শাম*, আজদি : ১৫।

বসরা জয় করা সম্ভব হয়নি। কারণ, এটা ছিল রোমানদের সংরক্ষিত সুদৃঢ় একটা কেন্দ্র।[৩৮৬]

৪. আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহের বাহিনী

আবু বকর রা. আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে বাহিনীসহ পাঠানোর ইচ্ছা করলে তাঁকে বিদায় জানাতে গিয়ে বলেন, 'ওই ব্যক্তির মতো আমার কথাগুলো শোনো, যে আনুগত্য ও আমলের নিয়তে শুনে থাকে। অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য, সৎকর্মপরায়ণ মুসলিম ও জাহিলি যুগের বীরপুরুষদের নিয়ে তুমি বের হচ্ছ। এরা তখন দলান্ধ হয়ে যুদ্ধ করত; আর এখন প্রতিদানের আশায় যুদ্ধ করছে। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো, সাহায্যকারী হিসেবে তিনিই যথেষ্ট। তাঁর ওপর ভরসা করো, তাঁর ওপর নির্ভর করাটাই সবচেয়ে উত্তম। ইনশাআল্লাহ কাল তুমি রওনা হয়ে যাবে।'[৩৮৭]

তাঁর বাহিনীর সদস্যও ছিল ৩ থেকে ৪ হাজারের মধ্যে। এই বাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল হিমস। আবু উবায়দা মদিনা থেকে রওনা হয়ে ওয়াদিউল কুরা হয়ে হিজরে (মাদায়িনে সালিহ) পৌঁছান। সেখান থেকে প্রথমে 'জাতে মানার', তারপর জিজা এবং সেখান থেকে মোয়াব পৌঁছান। সেখানে শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর সংঘর্ষ হয়। অবশেষে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। সিরিয়ায় সংঘটিত সন্ধির মধ্যে এটাই ছিল প্রথম সন্ধি। এরপর তিনি জাবিয়ার দিকে এগিয়ে যান।[৩৮৮] এই বাহিনী ছিল প্রথম বাহিনীর ডান ও দ্বিতীয় বাহিনীর বাম বাহু।[৩৮৯]

আবু উবায়দার সঙ্গে ছিলেন আরবের বিখ্যাত বাহাদুর কায়েস ইবনু হুবায়রা ইবনু মাসউদ মুরাদি। আবু উবায়দা রওনার আগে আবু বকর তাঁকে উপদেশস্বরূপ বলছিলেন, 'তোমার সঙ্গে যাচ্ছে আরববিখ্যাত উঁচুমানের একজন বাহাদুর। তাঁকে সঙ্গে রাখবে এবং তাঁর সঙ্গে নম্র আচরণ করবে। তাঁকে এ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করবে যে, তুমি তাঁর অমুখাপেক্ষী নও। তাঁকে সাধারণজন মনে করবে না। ফলে তুমি তাঁর দ্বারা উপকৃত হবে এবং শত্রুর মোকাবিলায় তাঁর প্রচেষ্টা তোমাকে উপকৃত করবে।'

এরপর আবু বকর রা. কায়েস ইবনু হুবায়রাকে ডেকে বলেন, 'আমি তোমাকে আমিনুল উম্মাহ আবু উবায়দার সঙ্গে পাঠাচ্ছি। তিনি এমন ব্যক্তি, তাঁর ওপর যদি অত্যাচার করা হয়, তবু তিনি অত্যাচার করেন না, দুর্ব্যবহার করলে ক্ষমা করে দেন। সম্পর্কচ্ছেদ করলে সেই সম্পর্ক প্রতিস্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি মুমিনদের ওপর দয়ালু ও কাফিরদের বিপরীতে পাথরের মতো কঠিন।

---

৩৮৬ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক*, নাজার আল হাদিসি : ৬২

৩৮৭ *ফুতুহুশ শাম*, আজদি : ১৭।

৩৮৮ *আল কামিল*, ইবনু আসির : ২/৬৬।

৩৮৯ *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া ওয়াদ দিফাইয়াহ ইনদাল মুসলিমিন*, নাহাদ আব্বাসি : ১৪১

তুমি তাঁর নির্দেশ অমান্য করবে না। তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করবে না। তিনি তোমাকে কল্যাণের নির্দেশই দেবেন। আমি তাঁকে তোমার কথা বলে দিয়েছি। তিনি তাকওয়া ছাড়া অন্য কিছুর নির্দেশ দেবেন না। আমরা শুনেছি, তুমি একজন বাহাদুর ও অভিজাত ব্যক্তি। তুমি তোমার শক্তিমত্তাকে ইসলাম ও মুসলিমদের স্বার্থে ব্যবহার করবে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে, যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করে, আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে অংশীদার স্থাপন করে। আল্লাহ এতেই উত্তম প্রতিদান, সম্মান ও বিজয় রেখেছেন।'

আবু বকরের উপদেশ শুনে কায়েস ইবনু হুবায়রা বলেন, 'যদি আপনি বেঁচে থাকেন, তাহলে আমার ব্যাপারে মুসলিমদের নিরাপত্তার ও কাফিরদের ধ্বংসকল্পে সচেষ্ট থাকার মতো অন্তর প্রশান্তকারী সুসংবাদই শুনবেন।' আবু বকর তখন বলেন, 'আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন। তুমি এমনটাই করতে থাকো।' এরপর তিনি যখন জানতে পারেন, হুবায়রা জাবিয়ার মল্লযুদ্ধে দুই রোমান-জেনারেলকে মৃত্যুর ঘাটে পৌঁছে দিয়েছেন, তখন তিনি আনন্দ চিত্তে বলেন, 'কায়েস তাঁর ওয়াদা সত্য প্রমাণিত করে দেখিয়েছে।'[৩৯০]

এখানে আমরা দেখতে পাই, আবু বকর রা. কায়েস ইবনু হুবায়রাকে উৎসাহ জুগিয়ে তাঁর ভেতরে থাকা শক্তি কাজে লাগানোর চেষ্টা করছেন। তাঁর ভেতরের বীরত্বকে জাগিয়ে তুলে ইসলামের খিদমত ও জিহাদে লাগিয়ে দিতে সচেষ্ট ছিলেন। নিঃসন্দেহে বীরপুরুষদের প্রশংসা তাদের ভেতরগত শক্তিকে জাগিয়ে তোলে। তারা নিজেদের মধ্যে শক্তিমত্তা অনুভব করে থাকেন। আর এটা আত্মোৎসর্গের প্রতি তাদের আরও উৎসাহী করে।[৩৯১]

৫. আমর ইবনুল আসের বাহিনী

আবু বকর রা. আমর ইবনুল আসের সঙ্গে একটা বাহিনী ফিলিস্তিনে পাঠিয়ে দেন। তিনি তাঁকে এই অধিকার দেন যে, চাইলে আপনি সেই কাজ করতে পারবেন, যে কাজের দায়িত্ব আপনাকে রাসুল ﷺ অর্পণ করেছিলেন।[৩৯২] আর চাইলে সেই কাজও গ্রহণ করতে পারেন, যা দুনিয়া-আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। তবে গৃহীত কাজটা আপনার কাছে পছন্দনীয় হতে হবে। উত্তরে তিনি এই মর্মে চিঠি লেখেন,

> *আমি ইসলামি তিরসমূহের অন্যতম তির। এই তির পরিচালনা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব আপনার। আপনি ভেবে দেখুন, কোন তিরটা বেশি শক্তিশালী ও ভয়ংকর। আপনি যেটা ইচ্ছা নির্দ্বিধায় সেটা চালিয়ে দিন।*[৩৯৩]

---

[৩৯০] *ফুতুহুশ শাম*, আজদি : ২৬-২৭।

[৩৯১] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/২০৬।

[৩৯২] তিনি কুজাআ অঞ্চলের সাদাকা উসুলের জিম্মাদার ছিলেন।

[৩৯৩] *ইতমামুল ওয়াফা বি সিরাতিল খুলাফা* : ৫৫।

এরপর আমর ইবনুল আস রা. মদিনায় এলে আবু বকর রা. তাঁকে নির্দেশ দেন, 'আপনি মদিনার বাইরে গিয়ে শিবির স্থাপন করুন, যাতে লোকজন আপনার সঙ্গে যোগ দিতে পারে।' তখন কুরাইশের নেতৃস্থানীয় বহু লোক তাঁর বাহিনীতে যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে হারিস ইবনু হিশাম, সুহাইল ইবনু আমর এবং ইকরিমা রা.-ও ছিলেন। বিদায় জানাতে গিয়ে আবু বকর রা. তাঁকে বলেন, 'আমর, আপনি অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ এবং সিদ্ধান্তগ্রহণে দক্ষ ব্যক্তি। এ ছাড়া আপনার প্রচুর যুদ্ধাভিজ্ঞতা রয়েছে। আপনি কুরাইশের অভিজাত ও পুণ্যবানদের নিয়ে আপন ভাইদের সহায়তায় যাচ্ছেন। অতএব, তাঁদের কল্যাণকামনায় ত্রুটি করবেন না। তাঁদের উত্তম পরামর্শগুলো ফেলে দেবেন না। আপনার যুদ্ধবিষয়ক সিদ্ধান্তগুলো পরিণাম বিবেচনায় হয়ে থাকে প্রশংসাযোগ্য ও বরকতময়।' আমর বলেন, 'আমার ব্যাপারে আপনার যে সুধারণা রয়েছে, ইনশাআল্লাহ আমি এর বাস্তবায়ন করে দেখানোর চেষ্টা করব।'[৩৯৪]

এরপর তিনি বাহিনী নিয়ে রওনা হয়ে যান। তাঁর বাহিনীর সেনাসংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৭ হাজারের মধ্যে। তাঁদের গন্তব্য ছিল ফিলিস্তিন। এই বাহিনী লোহিত সাগরের তীর ধরে মৃতসাগরের নিকটবর্তী 'আরবা' উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছায়। আমর রা. ১ হাজার সেনার একটা বাহিনীকে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ইবনুল খাত্তাবের নেতৃত্বে রোমানদের দিকে পাঠান। এই বাহিনী এগিয়ে গিয়ে রোমানদের একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করে। এরপর বেশকিছু বন্দিকে নিয়ে বিজয়ীর বেশে ফিরে আসে।

আমর রা. বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারেন, বুওয়াইসের নেতৃত্বে রোমানদের একটা বাহিনী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। নতুন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমর তাঁর বাহিনীকে প্রস্তুত করেন। ফলে রোমানরা মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করলে তারা সহজেই সে হামলা রুখে দিতে সক্ষম হন। আক্রমণকারী বাহিনীকে পিছু হটে যেতে বাধ্য করেন। এরপর সংঘবদ্ধভাবে তাদের ওপর চড়াও হলে তারা পালাতে শুরু করে। তারা যখন পালাচ্ছিল, তখন মুসলিমবাহিনী তাদের ধাওয়া করে হাজার হাজার সেনাকে হত্যা করে। এভাবেই পূর্ণ বিজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধটা সমাপ্ত হয়।[৩৯৫]

আবু বকর রা. সেনাপতিদের এই নির্দেশ দিয়েছিলেন—প্রত্যেকেই যেন অন্যের পথ এড়িয়ে চলেন। তাঁর ধারণামতে এর মধ্যেই কল্যাণ ছিল। তিনি আসলে এখানে নবি ইয়াকুব আ.-এর সুন্নাহ অনুসরণ করেছিলেন,[৩৯৬] যিনি তাঁর সন্তানদের বলেছিলেন,

> আমার ছেলেরা, তোমরা এক দরজা দিয়ে প্রবেশ না করে ভিন্ন ভিন্ন দরজা

---

৩৯৪ *ফুতুহুশ শাম*, বালাজুরি : ৪৮-৫১।

৩৯৫ *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া ওয়াদ দিফাইয়াহ ইনদাল মুসলিমিন* : ১৪৩।

৩৯৬ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৪।

দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না।। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই ওপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহর ওপরই নির্ভর করুক। [সুরা ইউসুফ : ৬৭]

চার. খালিদকে শামে প্রেরণ এবং আজনাদায়ন ও ইয়ারমুকযুদ্ধ

১. আজনাদায়নযুদ্ধের পটভূমি ও শামের মুসলিমবাহিনীর পক্ষ থেকে খলিফার কাছে চিঠি

শামের মুসলিমবাহিনী রোমানবাহিনীর প্রতিটা পদক্ষেপের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছিল। অবস্থার ভয়াবহতা অনুমান করে জাওলান এলাকায় তারা নেতাদের একটা সভা আহ্বান করে। সভা শেষে আবু উবায়দা অবস্থার ভয়াবহতা জানিয়ে খলিফার কাছে চিঠি লেখেন। সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয়েছিল :

- অধিকৃত এলাকাগুলো আপাতত শূন্য করা হোক।
- রোমানদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করার সুবিধার্থে মুসলিম সেনাদলকে একীভূত করা হোক।
- মুসলিমদের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধে উপনীত হতে তাদের বাধ্য করা হোক।

আমর ইবনুল আস রা. যুদ্ধের জন্য ইয়ারমুক প্রান্তরের নাম প্রস্তাব করেন। এরপর মুসলিমবাহিনী সেখানে একত্রিত হয়। আবু বকরের সিদ্ধান্তও ছিল আমর ইবনুল আসের সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

নেতৃবর্গ এই সিদ্ধান্তেও উপনীত হয়েছিলেন যে, আপাতত শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে না জড়িয়ে সবাই ইয়ারমুক প্রান্তরে এসে সমবেত হবেন। সুতরাং হিমস থেকে আবু উবায়দা রা., বালকা (জর্দান) থেকে শুরাহবিল ইবনু হাসানা ও শাম থেকে ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এদিকে আমর ইবনুল আসও ফিলিস্তিন থেকে ধীরলয়ে প্রত্যাগমন শুরু করেন।[৩৯৭] কিন্তু রোমানবাহিনী তাঁকে পেছন দিক থেকে তাড়া করছিল, এ কারণে তিনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের আগমনের আগে ফিরে আসা নিশ্চিত করতে পারেননি। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁকে বিরে সাবা নামক স্থানে রোমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয়। এর ফলেই সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক আজনাদায়নযুদ্ধ।[৩৯৮]

---

[৩৯৭] *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৪৮।

[৩৯৮] *হুরুবুল ইসলামি ফিশ শাম*, আহমাদ মুহাম্মাদ : ৪৫।

আবু বকরের কাছে আবু উবায়দার চিঠি পৌঁছলে তিনি নির্দেশ দেন, 'তোমরা ইয়ারমুক প্রান্তরে সমবেত হয়ে অশ্বারোহী বাহিনীকে গ্রাম ও বস্তি এলাকায় ছড়িয়ে দাও। রোমানদের রসদপত্র আসার পথ বন্ধ করে দাও। আমার পরবর্তী নির্দেশ না পৌঁছা পর্যন্ত শহর অবরোধ করবে না। তবে শত্রুরা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে শক্তপায়ে লড়াই চালিয়ে যাবে। আমি তোমাদের কাছে আরও অতিরিক্ত সেনা পাঠাচ্ছি।'[৩৯৯]

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলছিলেন, 'তোমাদের মতো মানুষ সংখ্যাস্বল্পতার কারণে পরাজিত হতে পারে না। ১০ হাজার লোকের একটা বাহিনীও তাদের গুনাহের কারণে পরাজিত হতে পারে। অতএব, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে ইয়ারমুক প্রান্তরে চলে আসে।' আবু বকর রা. বাহিনী চতুষ্টয়কে ইয়ারমুকে পৌঁছে সব বাহিনীকে এক হওয়ার নির্দেশ দেন, যাতে মুশরিকদের হামলার দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া সহজ হয়।' তিনি আরও বলেন, 'তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী। যারা তাঁর দীনের সাহায্য করে, তিনি তাদের সাহায্য করেন। যারা দূরে থাকে, আল্লাহও তাদের সঙ্গ ছেড়ে দেন।'[৪০০]

২. খালিদকে শামে রওনার নির্দেশ

আবু বকরের নির্দেশের আলোকে আমরা দেখতে পাই, তিনি সবসময় মুসলিমবাহিনীর বিজয় ও আধিপত্যের জন্য আল্লাহর আনুগত্যকেই ভিত্তি মনে করতেন; আর পরাজয় ও লজ্জা গুনাহের প্রতিক্রিয়া মনে করতেন। রোমানরা যাতে পৃথক পৃথকভাবে ধ্বংস করে দিতে না পারে, এ জন্য তিনি মুসলিমবাহিনীকে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন। ইয়ারমুক প্রান্তরকে ঘাঁটি বানানোর নির্দেশ এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি সমকালের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। অবস্থানগত সুবিধার কথা তাঁর ভালো করেই জানা ছিল। এটা তাঁর সামরিক প্রজ্ঞার বড় এক নিদর্শন। তিনি এই নির্দেশনাও জারি করেছিলেন, 'খালিদ যেন ইরাক থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে শামে পৌঁছে সম্মিলিত মুসলিমবাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।'

তখন শামে এমন এক নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল অনেক বেশি, যার একার মধ্যেই রয়েছে আবু উবায়দার শক্তি ও যোগ্যতা, ইবনুল আসের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ইকরিমার দক্ষতা এবং ইয়াজিদের এগিয়ে যাওয়ার অদম্য স্পৃহা, যিনি হবেন কুশলী যোদ্ধা ও অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ।[৪০১]

---

[৩৯৯] *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৪৮।

[৪০০] *তারিখুত তাবারি* : ৪/২১১।

[৪০১] *তারিখুদ দাওয়া ইলাল ইসলাম* : ৩৫৯-৩৬০।

এসব গুণের প্রতি লক্ষ রেখেই আবু বকরের দৃষ্টি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের দিকে নিবদ্ধ হয়। খালিদ রা. খলিফার নির্দেশ কার্যকর করতে বাহিনীসহ সেই বিভীষিকাময় মরুভূমি পাড়ি দিয়ে দ্রুত শামে পৌঁছে যান। সে ছিল ইতিহাসের তাক লাগানো এক বিরল ঘটনা। পেছনে আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে এসেছি।

এদিকে খলিফার পক্ষ থেকেও অব্যাহতভাবে সেনাসহায়তা আসছিল। তাঁর পরিকল্পনাগুলো ছিল বেশ সফল পরিকল্পনা। তিনি শত্রুদের বস্তুগত ও চিন্তাগত সব ধরনের কৌশলের জবাব দিতে থাকেন, যেগুলোর উদ্দেশ্য ছিল তাদের অবস্থান গুঁড়িয়ে দেওয়া। আবু বকর রা. বলছিলেন, 'আমরা খালিদের মাধ্যমে রোমানবাহিনীকে তাদের শয়তানি পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করব।'[৪০২]

৩. শামে বাহিনী প্রেরণে আবু বকরের সামরিক প্রজ্ঞা

আবু বকরের গৃহীত এ পদক্ষেপ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলি সামনে আসে :

- শামের চারটি মুসলিমবাহিনী এক বাহিনীর আকার ধারণ করবে।
- সকল নেতা হবেন খালিদের নেতৃত্বের অধীন।
- সমবেত হওয়ার স্থান নির্ধারণ।

এর দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায়, আবু বকর রা. সেনাবাহিনী পরিচালনার যোগ্যতা রাখতেন। মদিনা থেকে পাঠানো তাঁর সাহায্যবাহিনী দলবদ্ধভাবে না গিয়ে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা বর্শা অথবা পাখার রূপ ধারণ করে অগ্রসর হচ্ছিল, যে পদ্ধতিকে আধুনিক পরিভাষায় বিক্ষিপ্ত চলাচল বলা হয়। চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় তিনি সবাইকে একত্রিত করেন। এর মাধ্যমে সেনাপরিচালনায় তাঁর দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়; যাকে বর্তমান সামরিক ভাষায় Strategy বা কুশলী সেনাপরিচালনা বলা হয়ে থাকে।[৪০৩]

৪. আবু উবায়দার প্রতি আবু বকরের চিঠি

আবু বকর রা. খালিদকে ইরাক থেকে শামে গিয়ে সম্মিলিত মুসলিমবাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণের নির্দেশ প্রদানের পর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে এ ব্যাপারে অবগত করেন। এর কারণ উল্লেখপূর্বক খালিদের আনুগত্য প্রদর্শনের নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর কাছে চিঠি লেখেন,

---

[৪০২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৫।

[৪০৩] *আল-ফান্নুল আসকারিয়িল ইসলামি* : ৮৯; *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, আল হাদিসি : ৬০।

শামে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব খালিদের হাতে বুঝিয়ে দিয়েছি। তুমি এর বিরোধিতা না করে আনুগত্য প্রদর্শন করবে। আমি তাঁকে তোমার সেনাপ্রধান নিয়োগ দিয়েছি। যদিও আমি জানি, তুমি তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ। তবে আমি মনে করি, সামরিক জ্ঞানে সে তোমার থেকে এগিয়ে। আল্লাহ তাআলা আমার ও তোমার পক্ষ থেকে দীনের কাজ নিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

৫. আবু উবায়দার নামে খালিদের চিঠি

এ ছাড়া ইরাক থেকে ইমান ও তাকওয়ার বার্তা নিয়ে আবু উবায়দার নামে খালিদের পক্ষ থেকেও একটা চিঠি এসে পৌঁছায়। চিঠির ভাষ্য ছিল এমন,

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পক্ষ থেকে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহের নামে। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।

হামদ ও সালাতের পর,

আমি আমার ও আপনার জন্য ভয়ের দিনে নিরাপত্তা এবং দুনিয়ার জীবনে পাপ থেকে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করছি। আমার কাছে আল্লাহর রাসুলের খলিফার চিঠি এসে পৌঁছেছে। চিঠিতে তিনি আমাকে শামে পৌঁছে সেখানকার সব মুসলিমবাহিনীর দায়িত্বগ্রহণের নির্দেশ পাঠিয়েছেন।

আল্লাহর শপথ, আমি কখনো তাঁর কাছে এমন আবেদন করিনি। এটা আমার আকাঙ্ক্ষাও ছিল না। এ ব্যাপারে আমি তাঁর কাছে কোনো চিঠিও পাঠাইনি। আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন, আপনি আপনার পদে নিয়োজিত থাকবেন। আপনার কোনো নির্দেশ লঙ্ঘন করা হবে না। আপনার কোনো সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হবে না। আপনাকে এড়িয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। অবশ্যই আপনি সর্বজনমান্য নেতাদের একজন। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারের কোনো উপায় নেই। আপনার সিদ্ধান্ত থেকে অমুখাপেক্ষী থাকা যায় না। আমার ও আপনার ওপর আল্লাহ যে অনুগ্রহ করেছেন, তা যেন তিনি পূর্ণতায় পৌঁছান। আমাদের উভয়কে যেন জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।[৪০৪]

---

৪০৪ *মাজমুআতুল ওয়াসায়িকিস সিয়াসিয়া : ৩৯২-৩৯৩।*

৬. শামের মুজাহিদদের প্রতি খালিদের চিঠি

একইভাবে খালিদ রা. শামে অবস্থানরত মুজাহিদদের নামেও একটা চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি তাঁদের উদ্দেশে বলেন,

> *হামদ ও সালাতের পর,*
>
> *যে আল্লাহ ইসলামের মাধ্যমে আমাদের সম্মানিত করেছেন, দীনের মাধ্যমে আমাদের যে আভিজাত্য প্রদান করেছেন, তাঁর নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে যেভাবে আমাদের মর্যাদামণ্ডিত করেছেন, ইমানের মাধ্যমে আমাদের যে সম্মান দান করেছেন, সেই আল্লাহর রহমত আমাদের ওপর অত্যন্ত প্রশস্ত। আমরা তাঁর নিয়ামতের সাগরে ডুবে আছি। আমরা সেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের ওপর তাঁর নিয়ামত পূর্ণ করে দেন। হে আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর প্রশংসা করুন, তাঁর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন। তিনি আপনাদের আরও দান করবেন। আল্লাহর কাছেই অনুগ্রহপ্রার্থী হোন, তিনি অনুগ্রহ আরও বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে জীবন অতিবাহিত করুন।*
>
> *আমার কাছে আল্লাহর রাসুলের খলিফার নির্দেশনামা পৌঁছেছে। এতে তিনি আমাকে আপনাদের পাশে পৌঁছার নির্দেশ দিয়েছেন। মনে করুন, আমার ঘোড়া মুজাহিদদের নিয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে গেছে। অতএব, আল্লাহর ওয়াদার পূর্ণতা এবং উত্তম সাওয়াবপ্রাপ্তির ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যান। আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের ইমানের ওপর হিফাজত রাখুন। আমাদের ও আপনাদের ইসলামের ওপর অটল রাখুন। সকল মুজাহিদকে উত্তম প্রতিদান দিন। ওয়াসসালামু আলাইকুম।*

আমর ইবনু তুফায়েল ইবনু আমর আজদি চিঠি দুটি নিয়ে শামে মুসলিমদের কাছে পৌঁছান। তখন মুসলিমরা জাবিয়া প্রান্তরে অবস্থান করছিলেন। চিঠি পড়ে তাদের শোনানো হয়। আবু উবায়দার উদ্দেশে লিখিত চিঠিটাও তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। সেটা পড়ে তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাঁর রাসুলের খলিফার সিদ্ধান্তে বরকত দিন এবং খালিদকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন।'[৪০৫]

৭. খালিদ ও আবু উবায়দার সৌহার্দ্য

দুই মহান সেনাপতির এমন আচরণের মাধ্যমে মূলত ইসলামি ভ্রাতৃত্বের সৌন্দর্য প্রকাশ

---

৪০৫ *ফুতুহুশ শাম* আজদি: ৬৮-৭২—হুমায়দি।

পায়, যা একমাত্র নিখাদ তাওহিদের মাধ্যমে অস্তিত্বে এসে মানুষকে উত্তম চরিত্রে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। এ ছিল সাহাবিদের বিশেষ মর্যাদা। ইরাকে বিপুল বিজয়ও খালিদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেনি। তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার অহমিকা জাগাতে পারেনি; বরং দেখা যাচ্ছে তিনি নিজের ওপর আবু উবায়দার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন, তাঁর আনুগত্য গ্রহণের স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

অপরদিকে দেখা যায়, আবু উবায়দাও খলিফার এই নির্দেশকে বরকতময় আখ্যা দিচ্ছেন। খালিদকে উদার চিত্তে স্বাগত জানাচ্ছেন। এগুলোই প্রমাণ করে যে, খালিদ ও আবু উবায়দারা ছিলেন প্রবৃত্তিপরায়ণতার অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁরা সবসময় জনগণের কল্যাণকেই অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।[৪০৬] এর মধ্যে শাসক, যুদ্ধের নেতা, আলিম, দায়ি ও মুবাল্লিগদের জন্য নেতৃত্ব নির্বাচন এবং প্রয়োজনে তাদের পদচ্যুত করার মধ্যে রয়েছে বিশাল শিক্ষা।

পাঁচ. আজনাদায়নযুদ্ধ

খালিদ রা. শামে পৌঁছেই বসরা জয় করেন। এরপর তিনি মুসলিম সেনাপতিত্রয় তথা আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, শুরাহবিল ইবনু হাসানা এবং ইয়াজিদ আবি সুফিয়ানের সঙ্গে মিলিত হন। সেখানে পৌঁছেই সামরিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। তাঁদের থেকে সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিত হন। এ ছাড়া আমর ইবনুল আসের অবস্থান সম্পর্কেও জেনে নেন, যিনি তখন সম্মিলিত মুসলিমবাহিনীর কাছে দ্রুত পৌঁছার জন্য জর্দান নদীর তীরবর্তী রোমানবাহিনীর মোকাবিলা এড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন; কিন্তু শত্রুবাহিনী পূর্ণ প্রস্তুতিসহ তাঁকে ধাওয়া করে চলছিল বিধায় তাঁর পৌঁছতে দেরি হচ্ছিল। তারা তাঁকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করছিল।

তবে আমর রা. ছিলেন এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। তিনি ভালো করেই জানতেন, এমতাবস্থায় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া হবে সম্পূর্ণ বোকামি। কারণ, তাঁর বাহিনীর সংখ্যা মাত্র ৭ হাজারের মতো; অথচ রোমানবাহিনী ছিল এর কয়েকগুণ বেশি। খালিদ রা. সেখানে পৌঁছে সামরিক বিষয়াদি পর্যবেক্ষণের পর এ সিদ্ধান্তে যান যে, এখন তাঁর সামনে দুটি বিষয় রয়েছে :

১. হয় তিনি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে আমর ইবনুল আসের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবেন। এরপর রোমানবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাদের ধ্বংস করে ফিলিস্তিনে তাঁর অবস্থান মজবুত করবেন।

---

[৪০৬] *আত-তারিখুল ইসলামি* : হুমায়দি : ৯/২৩১।

২. নিজ অবস্থানে থেকে আমর ইবনুল আসকে তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হওয়ার কথা বলবেন। আর রোমানদের সেই বাহিনীর অপেক্ষায় বসে থাকবেন, যারা শাম থেকে ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে। তারা চলে এলে পরে চূড়ান্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন।

খালিদ রা. প্রথম বিষয়টা অগ্রাধিকার দেন। এর অন্যতম কারণ ছিল, তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, ফিলিস্তিন অধিকার করতে পারলে প্রয়োজনে মুসলিমদের পিছু হটার পথ উন্মুক্ত থাকবে। তাদের কেন্দ্রগুলোও অপেক্ষাকৃত নিরাপদ থাকবে। এমতাবস্থায় তাঁরা রোমানদের যেকোনো সময় চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন। শত্রুরাও পেছন থেকে মুসলিমবাহিনীর ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকবে। কারণ, তখন তাঁর বাহিনীর একাংশ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়তে এবং একাংশ তাঁদের নিরাপত্তা জুগিয়ে যেতে পারবে।

সুতরাং খালিদ রা. সেনাদের নিয়ে ফিলিস্তিন অভিমুখে রওনা দেন এবং আমর ইবনুল আসকে চিঠি পাঠিয়ে বলেন, তিনি যেন রোমানবাহিনীকে ধোঁকায় ফেলে তাঁর বাহিনীর কাছে নিয়ে আসেন। এরপর সবাই মিলে একসঙ্গে তাদের ওপর হামলা করবেন। খালিদের নির্দেশ পেয়ে আমর ইবনুল আস আজনাদায়নে এসে পৌঁছান।[৪০৭]

১. খালিদ ও আমরের সামরিক প্রজ্ঞা

আমর ইবনুল আসের বাহিনী যখন খালিদের বাহিনীর কাছে এসে পৌঁছায়, তখন মুসলিমবাহিনীর সেনাসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজারে। খালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে উপযুক্ত সময়েই ময়দানে হাজির হন। একপর্যায়ে রোমানদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে খালিদ ও আমরের সামরিক প্রজ্ঞা বিশেষ ভূমিকা রাখে। তাঁরা ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বিশেষজ্ঞ বাহাদুরদের সমন্বয়ে আলাদা একটা ইউনিট গঠন করে রাখেন। তাঁরা যুদ্ধের একপর্যায়ে শত্রুবাহিনীর ব্যূহ পর্যুদস্ত করে রোমান-জেনারেলের কাছাকাছি পৌঁছে তাদের নিঃশেষ করে ফেলেন। জেনারেলের মৃত্যুর পরপরই রোমনবাহিনী দিগ্‌বিদিক পালিয়ে যেতে থাকে।

শামের আজনাদায়ন প্রান্তরের লড়াই ছিল মুসলিম ও রোমানদের মধ্যকার প্রথম বৃহৎ লড়াই। যখন হিমসে অবস্থানরত রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে তার বিশাল বাহিনীর পর্যুদস্ত হওয়ার সংবাদ পৌঁছায়, তখন সে অবস্থার ভয়াবহতা ভালো করেই অনুধাবন করতে পারে।[৪০৮]

---

৪০৭ 'আজনাদায়ন' ফিলিস্তিনের পাশেরই একটি এলাকা। *আল-মুজাম, ইয়াকুত হামাবি* : ১/২০৩।

৪০৮ *আবু বাকরিনিস সিদ্দিক রা.*, নাজার আল হাদিসি : ৭০-৭১।

২. খালিদ কর্তৃক খলিফার কাছে আজনাদায়ন বিজয়ের সংবাদ

এদিকে খালিদ মদিনায় অবস্থানরত খলিফা আবু বকরকে আজনাদায়নের বিজয়ের সংবাদ পাঠিয়ে বলেন,

> *আল্লাহর রাসুলের খলিফা বরাবরে আল্লাহর তরবারি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পক্ষ থেকে। আমি সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই।*
>
> *হামদ ও সালাতের পর,*
>
> *আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আমি আপনাকে সংবাদ দিচ্ছি, আমরা শত্রুর মোকাবিলায় নেমেছিলাম। তারা আজনাদায়ন প্রান্তরে আমাদের বিরুদ্ধে বিশাল একটা বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছিল। তারা তাদের ক্রুশ উত্তোলন করেছিল। তাদের কিতাব মেলে ধরেছিল। তারা শপথ করে বলেছিল, আমাদের ধ্বংস করে ছাড়বে অথবা তাদের দেশ থেকে আমাদের বের করে স্বস্তির নিশ্বাস নেবে; কোনো অবস্থায়ই তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবে না।*
>
> *এদিকে তখন আমরাও আল্লাহর ওপর নির্ভর করে দৃঢ়পায়ে তাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাই। বর্শা দ্বারা তাদের ওপর হামলে পড়ি। এরপর তরবারি ধারণ করে এগিয়ে যাই। প্রতিটা উপত্যকা, মাঠ ও পথে আমরা তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ি। আমি আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি যে, তিনি তাঁর দীনকে বিজয়ী করেছেন। শত্রুবাহিনীকে লাঞ্ছিত-অপদস্থ করেছেন। তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছেন।*
>
> *আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।*

আবু বকর রা. চিঠি পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন, 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মুসলিমদের বিজয়ী করেছেন এবং আমার চক্ষু শীতল করে দিয়েছেন।'[৪০৯]

ছয়. ইয়ারমুকের যুদ্ধ

আজনাদায়ন প্রান্তরে রোমানরা লজ্জাজনক পরাজয়ের শিকার হয়। মুসলিমরা বিশাল বিজয় অর্জনের পর তাদের সেনাদল নিয়ে ফিরে আসেন। তারা অনেকটা প্রশান্ত চিত্তে খলিফার নির্দেশমতো ইয়ারমুক প্রান্তরে কাজে লেগে যান। এদিকে রোমানবাহিনী তাদের জেনারেল থিয়োডরের নেতৃত্বে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারাও একটা বিশাল প্রশস্ত

---

[৪০৯] *ফুতুহুশ শাম*, আজদি : ৮৪-৯৩।

মাঠে এসে শিবির স্থাপন করে, যেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার রাস্তা ছিল সংকীর্ণ। তারা ইয়ারমুকের একেবারে পাশে ওয়াকুসা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল।

১. উভয় বাহিনীর সেনাসংখ্যা

- **মুসলিমবাহিনী :** খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন মুসলিমবাহিনীর সংখ্যা ছিল ৪০ হাজার। কোনো কোনো বর্ণনামতে তাঁদের সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার।
- **রোমানবাহিনী :** থিয়োডরের নেতৃত্বে রোমানবাহিনীর সংখ্যা ছিল ২ লাখ ৪০ হাজার।

২. যুদ্ধের আগে

মুসলিমরা খালিদের নেতৃত্বে ইয়ারমুক পৌঁছে সেখানে শিবির স্থাপন করেন; আর রোমানরা নদীর দক্ষিণ তীরে তাদের সেনাসমাবেশ ঘটায়। এই অবস্থায় আমর ইবনুল আস মুসলিমবাহিনীকে লক্ষ্য করে বলেন, 'মুসলিমরা, সুসংবাদ নাও। আল্লাহর শপথ, রোমানরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে; আর অবরুদ্ধরা খুব কম ক্ষেত্রেই বিজয় অর্জন করতে পারে।'[৪১০]

খালিদ রা. এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ নতুন কৌশলে সেনাব্যূহ রচনা করেন, যা ইতিপূর্বে আরবদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত।[৪১১]

- **ফিরকা (ছোট বাহিনী) :** এটা ১০ থেকে ২০ কুরদুস পর্যন্ত হয়ে থাকত। এর একজন আলাদা অধিনায়ক থাকতেন।
- **কুরদুস :** ১ হাজার সেনার একটা ইউনিট, যার একজন পৃথক নেতা থাকত।[৪১২] খালিদ রা. এই প্রক্রিয়ায় বাহিনীকে ৪০ সারিতে বিন্যস্ত করেন।
- **কালব (মধ্যবাহিনী) :** এটা ছিল ১৮ কুরদুসের সমন্বয়ে ঘটিত। এর নেতৃত্ব ছিল আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহের হাতে। তাঁর সহযোগিতায় ছিলেন ইকরিমা ইবনু আবি জাহল ও কা'কা ইবনু আমর রা.।
- **মায়মানা (ডান বাহু) :** এটা ছিল ১০ কুরদুসের সমন্বয়ে ঘটিত। এর নেতৃত্বভার ছিল আমর ইবনুল আসের কাঁধে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শুরাহবিল ইবনু হাসানা রা.।
- **মায়সারা (বাম বাহু) :** এটাও ছিল ১০ কুরদুস বিশিষ্ট। এর নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান রা.।

---

৪১০ *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৬৩।

৪১১ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৮।

৪১২ *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৬৪।

- **তালিয়া (অগ্রবর্তী বাহিনী)** : এরা ছিল অশ্বারোহীদের দ্বারা গঠিত নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। এদের দায়িত্ব ছিল মুসলিমবাহিনীর দেখাশোনা ও শত্রুবাহিনীর ওপর কড়া দৃষ্টি রাখা। তাই এদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলক কম।
- **সাকা (পশ্চাদ্‌বাহিনী)** : এই বাহিনী ছিল ৫ কুরদুস তথা ৫ হাজার যোদ্ধার সমন্বয়ে ঘটিত। এর নেতৃত্বে ছিলেন সায়িদ ইবনু জায়েদ রা.। এই বাহিনীর দায়িত্ব ছিল সাধারণত প্রশাসনিক দিকগুলোর ওপর নজর রাখা। এর কাজি ছিলেন আবুদ দারদা রা.; আর খাবার-পানি, গনিমত একত্রিত করাসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.। মিকদাদ ইবনু আসওয়াদ রা. ছিলেন কারির ভূমিকায়। তিনি সেনাবাহিনীর সামনে জিহাদ-সংক্রান্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতেন, যাতে মুজাহিদদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ ঘটে। সেনাবাহিনীর বক্তা হিসেবে নিযুক্ত হন আবু সুফিয়ান ইবনু হারব রা.। তিনি প্রত্যেক সারিতে গিয়ে সেনাবাহিনীকে উদ্দীপ্ত করতেন।[৪১৩] আর সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. বড় বড় সাহাবিকে নিয়ে সেনাবাহিনীর ঠিক মধ্যখানে অবস্থান করছিলেন।

মুসলিমবাহিনী খালিদের নেতৃত্বে তাঁদের প্রস্তুতি সেরে নিয়েছিল। প্রত্যেক নেতা নিজ নিজ সেনাদলের সামনে উপস্থিত হয়ে জিহাদের ব্যাপারে তাদের উৎসাহিত করতে থাকেন। মুসলিমবাহিনীর নেতারা জানতেন, এই যুদ্ধ এক বিশাল প্রতিফল বহন করতে যাচ্ছে। এটা হবে ইতিহাসের মোড় নির্ধারণী এক যুদ্ধ। রোমানবাহিনীও মনে করছিল, 'এই যুদ্ধের পরাজয় হবে পুরো শাম অঞ্চলের পরাজয়। যদি আমরা যুদ্ধে হেরে যাই, তাহলে শামের সব দরজা মুসলিমদের জন্য খুলে যাবে। তাদের সামনে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তখন তাদের জন্য এশিয়া-ইউরোপ বিজয় একেবারে সহজ হয়ে যাবে।'[৪১৪]

৩. ইমানি প্রস্তুতি

ইমান ও কুফরের বাহিনী যখন পরস্পর মুখোমুখি হয়, তখন একে অন্যকে দ্বৈরথের আহ্বান জানায়। এমতাবস্থায় আবু উবায়দা রা. মুসলিমদের উপদেশ দিয়ে বলছিলেন, 'আল্লাহর বান্দারা, আল্লাহর দীনের সাহায্য করো। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। মুসলিমরা, ধৈর্যসহকারে কাজ করো। ধৈর্য হচ্ছে কুফর থেকে মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। লজ্জা পরাজয় ও বিনাশের কারণ। নিজেদের সারি থেকে পিছু হটবে

---

[৪১৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৮।

[৪১৪] *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৬৪।

না। আগে বেড়ে শত্রুর ওপর হামলা করবে না। বর্শাগুলো সঠিক আঙ্গিকে ধরে রেখে ঢাল দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। নীরবতা অবলম্বন করবে। মনে মনে আল্লাহর জিকির করতে থাকবে। আমি নির্দেশ দেওয়ার পরই তোমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

এরপর সাহাবি মুআজ ইবনু জাবাল রা. লোকজনকে উপদেশস্বরূপ বলেন, 'কুরআনধারী মুসলিমরা, আল্লাহর কিতাবের হিফাজতকারীরা, হিদায়াতের সাহায্যকারীরা, হকের পতাকাবাহীরা, আল্লাহর রহমত ও জান্নাত কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয় না, আল্লাহ তাঁর সুমহান রহমত ও সাহায্য কেবল সত্যবাদীদেরই দান করে থাকেন। তোমরা কি আল্লাহর ঘোষণা শোনোনি—"তোমাদের যারা ইমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন; তিনি অবশ্যই তাদের প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেভাবে প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের।" [সুরা নুর : ৫৫]

আল্লাহ তোমাদের ওপর রহম করুন। তোমাদের তিনি পলায়নকারী হিসেবে দেখছেন, এ থেকে লজ্জা অনুভব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের সম্মান ও বিজয়দানকারী কেউ নেই।'

সাহাবি আমর ইবনুল আস রা. বলছিলেন, 'মুসলিমরা, দৃষ্টি অবনত রাখবে। হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে। বর্শাগুলো সোজা রাখবে। শত্রুরা যখন হামলা চালাবে, তাদের একটু ছাড় দেবে, যতক্ষণ-না তারা তোমাদের বর্শার পাল্লায় এসে পৌঁছায়। এরপর বাঘের মতো তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। শপথ সেই সত্তার, যিনি সত্যকে ভালোবাসেন, যিনি প্রতিদান দেন, যিনি মিথ্যাকে অপছন্দ করেন এবং মিথ্যার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন, যিনি ভালোর প্রতিদান ভালো দিয়েই করেন। আমি শুনেছি, মুসলিমরা অচিরেই একের পর এক বস্তি, একের পর এক মহল্লা জয় করবে। অতএব, ওদের সেনাধিক্য দেখে ভয় করেবে না। তোমরা যদি দৃঢ়পদে যুদ্ধ করো, তাহলে ওরা পাখির মতো উড়ে যাবে।'

সাহাবি আবু সুফিয়ান রা. বলছিলেন, 'মুসলিমরা, এ মুহূর্তে তোমরা পরিবার-পরিজন এবং আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে পাঠানো সাহায্যবাহিনী থেকে দূরে অবস্থান করছ। আল্লাহর শপথ, তোমরা এমন এক বাহিনীর মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে আছ, যাদের সংখ্যা তোমাদের থেকে অনেক বেশি। যারা অত্যন্ত কঠিন প্রতিপক্ষ। তারা আছে নিজেদের সন্তানাদি এবং মালসামানার পাশে, নিজেদের দেশে। আল্লাহ তোমাদের তখনই সাহায্য করবেন, যখন তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। যখন তোমরা কঠিন অবস্থায় ধৈর্যধারণ করবে, নিজেদের তরবারি দ্বারা নিজেদের হিফাজত করবে, একে অন্যকে সাহায্য করবে—এটাই তোমাদের জন্য মুক্তির মাধ্যম হতে পারে।'

এরপর তিনি মহিলাদের কাছে যান। তাদেরও যথাযথ উপদেশ দিয়ে বলেন,[৪১৫]

---

[৪১৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/৯।

‘মুসলিমরা, সেই জিনিস এসে গেছে, যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছ। শোনো, এই তো তোমাদের সামনে নবিজি ও জান্নাত। তোমাদের সামনে রয়েছে শয়তান ও জাহান্নাম।’ এরপর তিনি নিজের জায়গায় ফিরে যান।[৪১৬]

সেই মুহূর্তে আবু হুরায়রা রা. লোকজনকে উপদেশস্বরূপ বলছিলেন, ‘হে লোকজন, আয়তলোচনা হুর ও জান্নাতের দিকে এগিয়ে চলো। তোমরা আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছ, সেই জায়গাই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান। সাবধান, ধৈর্যধারণকারীদের জন্যই রয়েছে সবচেয়ে উঁচু অবস্থান।’

ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান প্রতিটা কুরদুসে গিয়ে বলতেন, ‘আল্লাহ, আল্লাহ, তোমরা আরবদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী এবং ইসলামের সহায়তাকারী। তোমাদের শত্রুরা রোমের নিরাপত্তারক্ষী এবং শিরকের সাহায্যকারী। হে আল্লাহ, এটা তোমার দীন। আল্লাহ, তোমার বান্দাদের ওপর সাহায্য অবতরণ করো।’[৪১৭]

আরবের এক খ্রিষ্টান খালিদ রা.-কে লক্ষ করে বলে, ‘রোমানরা সংখ্যায় কতই-না বেশি এবং মুসলিমরা কতই-না কম!’ উত্তরে খালিদ বলেন, ‘তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি আমাকে রোমানদের সংখ্যাধিক্যের ভয় দেখাচ্ছ? আমাদের কাছে জনসংখ্যার কোনো মূল্য নেই। মূল লক্ষ্য তো হলো শত্রুকে পরাজয় ও লজ্জা উপহার দেওয়া এবং আল্লাহর বিজয় ও সাহায্য অর্জন করা। আল্লাহর শপথ, আমার তো মন চাইছে, আজ যদি আমার আশকার[৪১৮] সুস্থ থাকত আর শত্রুবাহিনী দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হতো।’

মুআজ ইবনু জাবাল পাদরি ও যাজকদের আওয়াজ শুনলে বলে ওঠেন, ‘আল্লাহ, শত্রুর পা টলিয়ে দিন। তাদের অন্তরগুলো সন্ত্রস্ত করে দিন। আমাদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করুন। তাওহিদের ওপর আমাদের স্থির রাখুন। জিহাদ প্রিয়তম বৃত্তি বানিয়ে দিন এবং আপনার সিদ্ধান্তে আমাদের সন্তুষ্ট করে তুলুন।’[৪১৯]

সাত. রোম

রোমানরা তাদের অহংকার ও দৌরাত্ম্য নিয়ে কালো বাদলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে মাঠের ওপর ছেয়ে যায় এবং ভীষণ চ্যাঁচামেচি শুরু করে। পাদরি ও যাজকরা ইনজিল পাঠ করে তাদের সেনাদের উদ্দীপ্ত করে তুলছিল।[৪২০] তারা ইয়ারমুকের পাশে ওয়াকুসা নামক

---

[৪১৬] *তারতিবু ও তাহজিবুল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৬৩।

[৪১৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১০।

[৪১৮] খালিদের ঘোড়া। শামের কঠিন মরূভূমি পাড়ি দিতে গিয়ে তাঁর প্রিয় ঘোড়া আশকারের খুর জখম হয়ে গিয়েছিল।

[৪১৯] *আবু বাকরিন রাজুলুদ দাওলাহ* : ৮৮।

[৪২০] *তারতিবু ও তাহজিবুল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৬৩।

স্থানে জমায়েত হয়; কিন্তু উপত্যকাটা তাদের জন্য পরিখা হয়ে ওঠে।

রোমানরাও কুশলী সেনাবিন্যাস করে। তারা দুটি লাইনে সেনাবিন্যাস করে প্রতি পাঁচজনকে বৃত্তাকারে রাখে। মধ্যখানে ছিল যথেষ্ট ফাঁকা। দ্বিতীয় সারি ছিল প্রথম সারি থেকে পেছনের দিকে। এ ছাড়া যুদ্ধে তারা যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করে :

১. তিরন্দাজদের সম্মুখভাগে রেখেছিল। তাদের দায়িত্ব ছিল তির ছুড়ে যুদ্ধের সূচনা করেই ডান, বাম ও পেছনে চলে যাওয়া।

২. ডান ও বাম বাহুতে ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। এদের দায়িত্ব ছিল তিরন্দাজরা পেছনে সরে যাওয়া পর্যন্ত তাদের নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদান।

৩. কুরদুস, (পদাতিক) এদের দায়িত্ব ছিল আক্রমণ জোরদার করে তোলা।

৪. সম্মুখসারিতে ছিল জেনারেল জারজাহ; আর ডান বাহুর সেনাপতি ছিল দারকিস।[৪২১]

১. যুদ্ধপূর্ব সংলাপ

উভয় বাহিনী একে অন্যের পাশে পৌঁছে গেলে মুসলিমবাহিনী থেকে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান রোমানদের দিকে এগিয়ে যান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন জিরার ইবনুল আজওয়ার ও হারিস ইবনু হিশাম। তাঁরা বলছিলেন, 'আমরা তোমাদের নেতার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' থিয়োডরের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করা হয়। সে তখন একটা রেশমি তাঁবুতে বসা ছিল। সাহাবিরা বলেন, 'আমরা এমন তাঁবুতে বসা বৈধ মনে করি না।' সে রেশমের গালিচা বিছিয়ে দেয়। তাঁরা তাতে বসতে অস্বীকার করে নিজেদের পছন্দমতো জায়গা দেখে বসে পড়েন। সন্ধি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়; কিন্তু সে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ফলে তাঁরা আল্লাহর দীনের দিকে তাদের আহ্বান জানিয়ে সেখান থেকে চলে আসেন।'

ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম বর্ণনা করেন; বাহান খালিদের কাছে প্রস্তাব দেয়—'এসো, আমরা উভয় বাহিনীর মধ্যখানে বসে সন্ধি নিয়ে আলোচনা করি।' খালিদ বেরিয়ে এলে বাহান তাঁকে বলে, 'জানি, নানাবিধ কষ্ট ও ক্ষুধা দেশ থেকে তোমাদের বেরিয়ে পড়তে বাধ্য করেছে! এসো, আমরা তোমাদের প্রত্যেকের হাতে ১০টা করে দিনার, পোশাক ও খাদ্যদ্রব্য ধরিয়ে দিই; আর তোমরা নিজের দেশে চলে যাও! চাইলে পরবর্তী বছরও তোমাদের এই পরিমাণ সাহায্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে!' খালিদ বলেন, 'তুমি যা

---

৪২১ *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৬৬।

ভাবছ, ব্যাপার আসলে তা নয়। এখানে আসার কারণ হচ্ছে, আমরা মূলত রক্তপিপাসু জাতি। জানতে পেরেছি, রোমানদের রক্ত নাকি খুব সুস্বাদু। এ জন্যই আমরা এখানে ছুটে এসেছি।' খালিদের জবাব শুনে বাহানের সঙ্গীরা বলে ওঠে, 'আরবদের ব্যাপারে আমরা এমনটাই শুনে এসেছি।'

২. যুদ্ধের সূচনা

যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্নের পর খালিদ রা. মধ্যসারির উভয় বাহুতে নিযুক্ত ইকরিমা ও কা'কার দিকে এগিয়ে এসে তাঁদের আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। তাঁরা উভয়ে তখন রণসংগীত গেয়ে গেয়ে এগোচ্ছিলেন। মধ্যমাঠে পৌঁছেই তাঁরা দ্বৈতযুদ্ধের আহ্বান জানান। রোমান বাহাদুররা বেরিয়ে আসে। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ। খালিদ রা. তাঁর কুরদুস (১ হাজার সেনার বাহিনী) নিয়ে সেনাসারির মধ্যভাগে চলে আসেন। মুজাহিদরা তাঁর সামনে অবস্থান নিয়ে শত্রুর ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন; আর তিনি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে যথাযথ নির্দেশনা দিচ্ছিলেন।[৪২২]

৩. রণাঙ্গনে রোমান সেনাপতি জারজাহর ইসলামগ্রহণ

রোমানবাহিনীর বড় সেনাপতি জারজাহ বেরিয়ে এসে খালিদকে ডাক দেয়। তিনি তার পাশেই চলে যান। এতটাই কাছে যান, উভয়ের ঘোড়ার ঘাড় পরস্পর মিলে যায়। জারজাহ তাঁকে বলে, 'খালিদ, আমি আপনাকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব, আপনি কি আমাকে সঠিক তথ্য দেবেন? দয়া করে মিথ্যা বলবেন না, মিথ্যা বলা একজন স্বাধীন মানুষের জন্য লজ্জার বিষয়। এ ছাড়া আমাকে ধোঁকায়ও ফেলবেন না। অভিজাত ব্যক্তিরা আল্লাহর দিকে নত লোকদের ধোঁকা দিতে পারে না। আল্লাহ কি আপনাদের নবির কাছে আসমান থেকে কোনো তরবারি পাঠিয়েছেন, যা তিনি আপনাকে দান করে গেছেন? যার ফলে আপনি কখনোই পরাজিত হন না?'

—না।

—তাহলে আপনার নাম 'সাইফুল্লাহ' কেন?

—আল্লাহ আমাদের কাছে তাঁর নবিকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি দীনের পথে আমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তখন আমাদের কিছুসংখ্যক মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর অনুসরণ করে; আর কিছুসংখ্যক সাড়া না দিয়ে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপাদন করে। এরপর আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দেন। আমরা তাঁর হাতে বায়আত হই। আল্লাহর

---

[৪২২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১০।

নবি আমাকে লক্ষ করে বলেন, 'তুমি আল্লাহর তরবারিসমূহের একটি, যা আল্লাহ মুশরিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন।' তিনি আমার জন্য বিজয় ও সাহায্যের দুআ করে গেছেন। এ কারণে আমার নাম হয়ে গেছে 'সাইফুল্লাহ'। আমি মুসলিমদের মধ্যে মুশরিকদের ওপর সবচেয়ে কঠোর।

—আপনারা মানুষকে কীসের দিকে আহ্বান করেন?

—আমরা মানুষকে 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল,' এই সাক্ষ্য প্রদানের আহ্বান জানাই এবং আল্লাহর রাসুল যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলো স্বীকার করার আহ্বান করে থাকি।

—যারা আপনাদের দাওয়াত গ্রহণ করে না, তাদের ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্ত কী?

—তারা জিজয়া প্রদান করবে, আমরা তাদের নিরাপত্তাভার নেব।

—যদি তারা জিজয়া দিতে রাজি না হয়?

—আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

—আজ যদি কেউ আপনাদের দীনে প্রবেশ করে, তার অবস্থান কী হবে?

—আল্লাহ আমাদের ওপর যা ফরজ করেছেন, সেসব ব্যাপারে তার অবস্থান হবে ঠিক আমাদের মতো। আমাদের এখানে উঁচু-নীচু, প্রথম ও শেষ এসবের কোনো ভেদাভেদ নেই।

—আজ যে আপনাদের দীনে প্রবেশ করবে, সে কি আপনাদের সমান প্রতিদান পাবে?

—হ্যাঁ; বরং বেশিই পাবে।

—আপনাদের সমান হবে কীভাবে? অথচ আপনারা এ ব্যাপারে কতই-না অগ্রগামী?

—আমরা এই দীন কবুল করেছি। নবির হাতে বায়আত হয়েছি। তিনি যতদিন আমাদের মধ্যে জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর কাছে ঐশী-নির্দেশনা আসত। তিনি আমাদের সেই কিতাবের সংবাদ দিতেন, মুজিজা দেখাতেন, আমরা যারা তা দেখেছি, শুনেছি, আমাদের জন্য তাঁর আনুগত্য প্রদর্শন ও বায়আতগ্রহণ জরুরি ছিল। কিন্তু আমরা যা দেখেছি ও শুনেছি, তোমরা তো তা দেখোনি বা শোনোনি, তাই তোমাদের যারা নিষ্ঠ চিত্তে ইসলামগ্রহণ করবে, সে আমাদের থেকে উত্তমই পরিগণিত হবে।

—(জারজাহ চিৎকার দিয়ে বলে) আল্লাহর দোহাই, আপনি সত্য বলছেন! আমাকে প্রতারিত করছেন না তো?

—আল্লাহর শপথ, আমি সত্য কথা বলেছি। তুমি আমাকে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ, এর ওপর আল্লাহ সাক্ষী।

এ কথা শুনে জারজাহ তার ঢাল ঘুরিয়ে খালিদের সঙ্গী হয়ে যায়। এরপর সে আবেদন করে, 'আমাকে ইসলাম শিক্ষা দিন।' খালিদ তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের তাঁবুতে চলে আসেন। তাকে গোসল করার নির্দেশ দেন। এরপর দুই রাকআত সালাত পড়ান। জারজাহ খালিদের সঙ্গে চলে আসতেই রোমানরা আক্রমণ তীব্র করে তোলে। ফলে প্রথমদিকে মুসলিমদের পা টলতে শুরু করে। ইকরিমা ইবনু আবি জাহল আর হারিস ইবনু হিশামের নেতৃত্বে শুধু প্রতিরক্ষাবাহিনী তাদের অবস্থানে অবিচল থাকে।[৪২৩]

৪. মুসলিম ডান বাহুতে রোমান বাম বাহুর আক্রমণ

অন্ধকার রাতের মতোই রোমানবাহিনী মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে এগিয়ে আসছিল। তাদের বাম বাহু মুসলিমদের ডান বাহুর ওপর আক্রমণ করে বসে। ফলে মুসলিমবাহিনীর মধ্যসারি ডান বাহুর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। রোমানবাহিনী মুসলিমদের বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে একেবারে পেছনের সারি পর্যন্ত পৌঁছে যেতে সমর্থ হয়। এ দৃশ্য দেখে মুআজ ইবনু জাবাল মুসলিমদের উদ্দেশে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেন, 'আল্লাহর বান্দারা, এরা তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে আক্রোশে ফেটে পড়ছে। আল্লাহর শপথ, তোমাদের ধৈর্য আর অবিচলতাই ওদের ফিরিয়ে দিতে পারে।' এরপর তিনি ঘোড়া থেকে নেমে বলেন, 'যে আমার ঘোড়া নিয়ে লড়তে ইচ্ছুক, সে ঘোড়াটা নিয়ে নিক!' তিনি নিজে পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন।[৪২৪]

আজদ, মাজহাজ, হাজারামাউত ও খাওলানের লোকজন বীরত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করে শত্রুবাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখে দিতে সক্ষম হয়। রোমানরা পাহাড়-উঁচু আক্রমণের ঢেউ তুলে মুসলিমবাহিনীর ডান বাহু ও মধ্যসারির দিকে চলে আসে। এমতাবস্থায় মুসলিমবাহিনীর একটা দল পৃথক হয়ে শিবিরের দিকে চলে যায়। তবে বড় একটা দল তাদের অবস্থানে অনড় থেকে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। জুবায়দের লোকজন শুরুতে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেলেও পরে আবার জড়ো হয়ে যায়। তারা তখন দিক পালটে তীব্রগতিতে শত্রুর ওপর হামলে পড়ে ওদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেয়। বিক্ষিপ্ত হওয়া মুসলিমদের পিছুধাওয়া থেকেও ওদের বিরত রাখতে সমর্থ হয়। যারা শিবিরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল, মুসলিম বীরাঙ্গনারা লাঠি ও পাথর হাতে তাদের স্বাগত জানাচ্ছিল। ফলে ওরা পুনরায় নিজেদের সারি বিন্যস্ত করে নেয়।[৪২৫]

ইকরিমা ইবনু আবি জাহল বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে অংশ

---

[৪২৩] প্রাগুক্ত : ৭/১৩।

[৪২৪] *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৬৯।

[৪২৫] *ফুতুহুশ শাম*, আজদি : ২২২; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১৯।

নিয়েছি। আজ কি আমি পলায়ন করতে পারি?' এরপর তিনি ঘোষণা দেন, 'কে আছ মৃত্যুর বায়আতকারী?' তাঁর চাচা জিরার ইবনুল আজওয়ার ও হারিস ইবনু হিশাম তখন ৪০০ অশ্বারোহী নিয়ে তাঁর হাতে বায়আত হন। তাঁরা তখন খালিদের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। একপর্যায়ে সবাই আহত হয়ে পড়েন। অনেকে শাহাদাতবরণ করেন। শহিদদের একজন ছিলেন জিরার ইবনুল আজওয়ার।[৪২৬]

ওয়াকিদিসহ কতিপয় ইতিহাসবিদের বর্ণনায় রয়েছে, জিরার আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলে তিনি পানি পান করতে চাচ্ছিলেন। যখন তাঁর কাছে পানি নিয়ে যাওয়া হয়, তখন দেখতে পান আরেক আহত ব্যক্তি পানির দিকে কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। তিনি পানিবাহককে বলেন, 'আগে ওকে পান করিয়ে এসো!' দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তিনিও অনুরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বলেন, আগে ওকে পান করিয়ে এসো!' তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। শুধু তা-ই নয়, মুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এ প্রবণতা থেকে তাঁরা সবাই পানির বদলে শাহাদাতের শরাবে চুমুক দেন। রাজিআল্লাহু আনহুম আজমায়িন।

বলা হয়ে থাকে, সেদিন যিনি প্রথমে শাহাদাতবরণ করেন, তিনি ইতিপূর্বে আবু উবায়দার কাছে গিয়ে বলেছিলেন, 'আমি সব প্রস্তুতি সেরে নিয়েছি। রাসুলের সঙ্গে কি আপনার কোনো কাজ আছে?' জবাবে আমিনুল উম্মাহ বলেন, 'রাসুল ﷺ-কে আমার সালাম দেবে আর বলবে, আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রতিপালক আমাদের সঙ্গে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমরা তা সত্য পেয়েছি।'

এরপর ওই মুজাহিদ যুদ্ধ করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকেন এবং একপর্যায়ে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন। সকল মানুষ নিজেদের পতাকার নিচে অবস্থান করে দৃঢ়পায়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। রোমানরা চাকার মতো চারদিকে ঘুরছিল। সেদিন ইয়ারমুকের রণাঙ্গনে কেবল কর্তিত মস্তক, বলবান বাহু আর কবজিগুলোই উড়তে দেখা যাচ্ছিল।[৪২৭]

৫. রোমান ডান বাহুর মুসলিমদের বাম বাহুতে আক্রমণ

কানাতিরের নেতৃত্বে রোমানদের ডান বাহু মুসলিম বাম বাহুর ওপর হামলে পড়ে। মুসলিম বাম বাহুতে ছিল কিনানা, কায়েস, খুসআম, জুজাম, কুজাআ, আমিরা ও গাসসান গোত্রসমূহের লোকজন। তাঁদের বাধ্য হয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে যেতে হয়। রোমানরা তখন পিছিয়ে যাওয়া মুসলিমদের ওপর আছড়ে পড়ে ধাওয়া শুরু করে। ধাওয়া খেয়ে মুসলিমরা শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছলে ওদিক থেকে মুসলিম

---

[৪২৬] *তারতিবু ও তাহজিবুল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৭০।

[৪২৭] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১২।

বীরাঙ্গনারা লাঠি ও পাথর হাতে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। মহিলারা পাথর ছুড়ে বলছিলেন, 'ইসলাম, মা আর স্ত্রীদের ইজ্জত কোথায় চলে গেল? তোমরা কাফিরদের জন্য আমাদের রেখে কোন দিকে পালিয়ে যাচ্ছ?'

নারীরা যখন এভাবে তাঁদের পৌরুষ ধরে নাড়া দেন, তখন তাঁদের চেতনা ফিরে আসে। তাঁরা যারপরনাই লজ্জিত হয়ে পুনরায় রণাঙ্গনে গিয়ে দৃঢ়পায়ে লড়তে থাকেন। রোমানদের বিপুলসংখ্যক লোক নিহত হয়েছিল। একপর্যায়ে মুসলিমদের একাংশের সেনাপতি সায়িদ ইবনু জায়েদ শাহাদাতবরণ করেন। তখন রোমানদের বাম বাহু ফের মুসলিম ডান বাহুর ওপর আক্রমণে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর ওপর হামলা করে তাঁদের প্রায় অবরুদ্ধ করে ফেলে; কিন্তু আমরের বাহিনী অত্যন্ত দৃঢ়পদে মোকাবিলা করতে থাকে। তারপরও রোমানরা মুসলিমবাহিনীর শিবিরে পৌঁছে যেতে সমর্থ হয়।

এ অবস্থা দেখে মুসলিম নারীরা পুনরায় পাহাড় থেকে নেমে এসে পাথর ছুড়তে থাকেন। তাঁরা পুরুষ-যোদ্ধাদের ভর্ৎসনা করে বলছিলেন, 'যদি তোমরা আমাদের নিরাপত্তা দিতে না পারো, তাহলে তোমরা আমাদের স্বামী নও।' এর ফলে মুসলিমরা নবপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। পুনরায় যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁরা তখন রোমানদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন যে, শত্রুবাহিনী এখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।[৪২৮]

৬. পালানোর পথ করে দেওয়া এবং পদাতিক বাহিনীকে ধ্বংস

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. তাঁর অশ্বারোহী বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রোমানদের সেই বাম বাহুর ওপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে বসেন, যারা মুসলিমবাহিনীর ডান বাহুকে মধ্যভাগের দিকে ঠেলে নিয়ে আসছিল। তিনি তখন মুসলিমবাহিনীর উদ্দেশে বলছিলেন, 'আল্লাহর শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ; তোমরা যা দেখেছ এ ছাড়া তাদের কাছে এখন ধৈর্য আর শক্তি বলতে কিছুই নেই। আমার বিশ্বাস, ওদের গর্দানগুলোও আল্লাহ তোমাদের কবজায় দিয়ে দেবেন।'

এরপর তিনি অশ্বারোহীদের সঙ্গে নিয়ে রোমানদের ১ লাখ বাহিনীর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। আক্রমণের ক্ষিপ্রতায় শত্রুবাহিনী ছত্রখান হয়ে যায়। মুসলিমরা সম্মিলিত হামলা চালালে তারা একেবারে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। এরপর তাঁরা ওদের পিছু ধাওয়া শুরু করেন।[৪২৯]

---

৪২৮ *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৭৪।

৪২৯ *তারতিব ওয়া তাহজিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৭১—*ফুতুহুল বুলদান*, আজদি : ১৭১।

মুসলিমবাহিনীর ডান বাহু পলায়নপর রোমানদের পালানোর পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা তখন ইয়ারমুক উপত্যকা ও জারকা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। এরপরও যুদ্ধ তুমুল গতিতেই চলছিল। মুসলিমরা ইমানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে চলছিলেন। কঠিন হামলা চালিয়ে রোমানদের অশ্বারোহী বাহিনীকে পদাতিকদের পাশ থেকে সরিয়ে দিতে সফল হন। এরপর তাদের ওপর হামলে পড়েন। ধাওয়া করে ক্লান্ত করে তোলেন।

রোমান অশ্বারোহীরা তখন পালানোর পথ খুঁজছিল। খালিদ রা. আমর ইবনুল আসকে নির্দেশ দেন, 'ওদের পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেন।' তিনি তা-ই করেন। সুযোগ পেতেই রোমানবাহিনীর ডানায় যেন পালক গজিয়ে ওঠে। তারা দ্রুত পালিয়ে যায়। তাদের পদাতিক বাহিনী তখন অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্য-বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এদের শেকলবন্দি করে পরিখার দিকে নিয়ে আসা হয়। তাদের অবস্থা ছিল বিধ্বস্ত দেয়ালের মতো। রাতের আঁধারে টেনে-হিঁচড়ে পরিখার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এতে তারা উপত্যকায় মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছিল। তাদের একজনকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে শেকলে বাঁধা সবাই পড়ে যেত। এ পর্যায়ে মুসলিমরা তাদের বড় একটা দলকে হত্যা করতে সক্ষম হন। নিহতদের সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২০ হাজারের মতো। তবে তাদের কিছুসংখ্যক ফাহাল ও দামেশকের দিকে পালিয়ে যায়।[৪৩০]

পরাজিতদের মোকাবিলায় ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে যান। তিনি অত্যন্ত জোরদার আক্রমণ পরিচালনা করেন। তাঁর পিতা তখন তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ইয়াজিদকে ডেকে বলেন, 'আমার কলিজার টুকরো, খোদাভীতি ও ধৈর্য অবলম্বন করো। আজ এই উপত্যকায় উপস্থিত সকল মুসলিমের ওপর যুদ্ধ জরুরি। মুসলিমবাহিনীর নেতৃত্বে তোমার মতো যাঁরা আছে, তাঁদের ওপর তো অগ্রাধিকারভিত্তিতে জরুরি হবে। প্রিয় ছেলে, আল্লাহকে ভয় করো। তোমার সঙ্গীদের কেউ যেন আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় ধৈর্য ও দৃঢ়তায় তোমাকে ছাড়িয়ে না যায়।' ইয়াজিদ জবাবে বলেন, 'জি আব্বা, ইনশাআল্লাহ তা-ই হবে।' এরপর তিনি অবিচলভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যান। এ সময় ইয়াজিদ ছিলেন মুসলিমবাহিনীর মধ্যসারির দিকে।[৪৩১]

সায়িদ ইবনুল মুসাইয়িব রা. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন; 'ইয়ারমুকের দিন নীরবতা ছেয়ে গিয়েছিল। আমরা হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পাই। আওয়াজটা পুরো শিবির থেকেই শোনা যাচ্ছিল। সেটা ছিল—'আল্লাহর সাহায্য, নিকটে এসে যাও। হে মুসলিমরা, অনড় হয়ে যাও।' আমরা চেয়ে দেখি, সেই আওয়াজদাতা ছিলেন আবু সুফিয়ান রা.। তিনি তাঁর পুত্র ইয়াজিদের পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছিলেন।

---

৪৩০ *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া ওয়াদ দিফাইয়াহ ইনদাল মুসলিমিন* : ১৭৫।

৪৩১ *ফুতুহুল বুলদান*, আজদি : ২২৮।

মুসলিমরা মাগরিব ও ইশার সালাত পিছিয়ে দেন। একপর্যায়ে বিজয় হাতের মুঠোয় আসে। খালিদ রা. রোমান সেনাপতি হিরাক্লিয়াসের ভাই থিয়োডরের তাঁবুতে রাতযাপন করেন। সে পলায়নকারীদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। অশ্বারোহীরা খালিদের তাঁবুর আশপাশে টহল দিচ্ছিল। রোমানদের যারাই ওদিকে আসত, তাদের হত্যা করে ফেলা হতো। সকাল পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। থিয়োডরকেও একসময় হত্যা করা হয়। সেদিন তার তাঁবুতে ছিল ৩০টা শামিয়ানা, ৩০টা রেশমের সূর্যরশ্মি প্রতিরোধক। এ ছাড়া ছিল প্রচুর কার্পেট, রেশমের জামাকাপড় ও পর্দা। সেখানে যেসব সম্পদ ছিল, সকাল হলে মুসলিমরা তা গনিমত হিসেবে নিয়ে নেন।[৪৩২]

৭. যুদ্ধের ফল

এ যুদ্ধে প্রায় ৩ হাজার মুসলিমযোদ্ধা শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে ইকরিমা ইবনু আবি জাহল, তাঁর পুত্র আমর, সালমা ইবনু হিশাম, আমর ইবনু সায়িদ, আবান ইবনু সায়িদসহ রাসুলের সাহাবি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে রোমানদের নিহতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার। এদের মধ্যে ৮০ হাজার ছিল শেকলবদ্ধ আর বাকিরা ছিল শেকলবিহীন।[৪৩৩]

এই বিশাল বিজয় মুসলিমদের আনন্দিত করে তুললেও খলিফা আবু বকরের মৃত্যুসংবাদ সে আনন্দ মাটি করে দেয়। তাঁর ইনতিকালে তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়েন।

আট. আবু বকরের ইনতিকাল, উমরের খিলাফতগ্রহণ ও খালিদের অপসারণ

১. উমরকে খলিফা নির্ধারণ ও আবু বকরের ইনতিকাল

১৩ হিজরির জুমাদাস সানি মাসে খলিফাতুর রাসুল আবু বকর রা. অসুস্থ হন এবং এ অসুস্থতা নিয়েই ২২ জুমাদাল উখরা সোমবার দিবাগত রাতে ইনতিকাল করেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা যখন ক্রমেই অবনতি হচ্ছিল, তখন একসময় তিনি বুঝে নেন, তাঁর বেলা ফুরিয়ে এসেছে। ফলে শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের সঙ্গে আলোচনা করে খিলাফতের গুরুভার উমর রা.-এর হাতে অর্পণ করেন।

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলাকালে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কাছে খলিফা

---

[৪৩২] *তারতিবু ও তাহজিবুল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ১৭৩।

[৪৩৩] *আল-আমালিয়াতুত তারিজিয়া* : ১৭৯।

আবু বকরের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছেছিল; কিন্তু তিনি সংবাদটা তখনই মুসলিমদের না জানিয়ে চেপে রাখেন, যাতে মুসলিমবাহিনী মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে না পড়ে। বিজয় পূর্ণতায় পৌঁছার পরই সংবাদটা তাঁদের সামনে প্রকাশ করেন।

২. খলিফা উমর কর্তৃক খালিদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

এদিকে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. খলিফা হওয়ার পরপরই শামে খালিদের পরিবর্তে আবু উবায়দাকে সেনাপতি নিয়োগের ফরমান পাঠান। খালিদ আমিরুল মুমিনিনের এই ফরমানকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেন। এরপর খলিফাতুর রাসুলের ইনতিকালে মুসলিমদের পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আবু বকরকে মৃত্যু দান করেছেন। তিনি ছিলেন আমার কাছে উমরের চেয়ে প্রিয়। সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি উমর রা.-কে খলিফা বানিয়েছেন। তিনি আবু বকরের চেয়ে আমার কাছে ছিলেন অপ্রিয়; অথচ আল্লাহ আমার ওপর তাঁকে পছন্দ করা জরুরি করে দিয়েছেন।'[৪৩৪] এরপর খলিফা উমরের নির্দেশমতো আবু উবায়দা রা. সেনাবাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।

উমর রা. খিলাফতের দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর আবু বকরের শাসনামলে নিযুক্ত অনেক প্রাদেশিক গভর্নর, কর্মকতা ও সেনাপতিকে অপসারণ করে নতুন দায়িত্বশীল নিয়োগ দেন। এটা খলিফা উমরের ইজতিহাদি বিষয় ছিল। এ হিসেবে সেনাপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকেও তিনি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলে সঙ্গে সঙ্গেই খালিদ রা. তা মেনে নেন।

৩. কা'কা ইবনু আমরের কবিতা

ইয়ারমুকের যুদ্ধ প্রসঙ্গে আরবের কবিদের মধ্যে কা'কা ইবনু আমরের কবিতাগুলো হচ্ছে,

দেখোনি কি ইয়ারমুকে আমরা তেমন বিজয়ই লাভ করেছি
যেমন বিজয় লাভ করেছি ইতিপূর্বে ইরাকে।
কুমার ঘোড়ায় চড়ে মাদায়েন ও
মারজ আস-সাফারের স্বাধীন এলাকাগুলো করেছি জয়।
সেই বসরাও জয় করেছিলাম, কা-কা-কারীদের কাছে
যে শহরের আঙিনায় পা রাখা ছিল নিষিদ্ধ।
যারাই সামনে আসছিল তাদের হত্যা করছিলাম
ধারালো তরবারির মাধ্যমে গনিমত কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম।

---

[৪৩৪] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১৪-১৪।

আমরা ইয়ারমুকে রোমানদের হত্যা করেছিলাম
তারা আমাদের দুর্বলদের সমকক্ষতাও প্রদর্শন করতে পারেনি।
আমরা ধারালো তরবারির মাধ্যমে ওয়াকুসা প্রান্তরে
ওদের বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিলাম।
সেই ভোরে যখন ভিড় জমেছিল, তখন তারা
এমন জিনিস আস্বাদন করে, যা ছিল ভীষণ তিক্ত।[৪৩৫]

৪. রোমানদের পরাজয়

যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সম্রাট হিরাক্লিয়াস মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বেঁচে যাওয়া তার ভগ্নমনোরথ সেনারা ইনতাকিয়ায় (এন্টিয়ক) গিয়ে পৌঁছলে সে তাদের বলে ওঠে,

—তোমরা ধ্বংস হও! বলো দেখি, তোমরা যাদের মোকাবিলায় লড়ছিলে, তারা কি তোমাদের মতোই মানুষ ছিল না?

—জি, অবশ্যই ছিল।

—সংখ্যায় তোমরা বেশি ছিলে নাকি তারা?

—প্রতিটা জায়গায়ই আমরা তাদের কয়েকগুণ বেশি ছিলাম।

—তারপরও তোমরা পরাজিত হলে কেন?

তখন তাদের এক প্রবীণ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে থাকে, 'তারা বিজয়ী হয়েছে; কারণ তারা দিনে থাকে রোজাদার আর রাতে থাকে আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান। তারা অঙ্গীকার পূরণ করে। কল্যাণের দাওয়াত দেয় এবং অকল্যাণ ও অসত্য থেকে বিরত রাখে। একে অন্যের সঙ্গে ন্যায্য আচরণ করে। আর আমাদের পরাজয়ের কারণ হচ্ছে—আমরা মদপান করি, ব্যভিচার করি, বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হই। ওয়াদা ভঙ্গ করি। অত্যাচার-অনাচার করি। অন্যায় কাজের নির্দেশ প্রদান করি। আল্লাহ যেসব কাজে অসন্তুষ্ট হন, মানুষকে তা থেকে বিরত রাখি না। জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করি।'

হিরাক্লিয়াস তখন বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি সঠিক বলেছ।'[৪৩৬]

---

[৪৩৫] প্রাগুক্ত : ৭/১৫।

[৪৩৬] প্রাগুক্ত : ৭/৫১-৬১।

১১ তম অধ্যায়

সেনাপতির পদ থেকে খালিদের অপসারণ, ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ ও শাম বিজয়

এক. মদপানের শাস্তি নির্ধারণে খালিদের পরামর্শ

উমর রা. খিলাফতের দায়িত্ব পালনকালে ইসলামের বিজয়াভিযান বাড়তে থাকে। দূরদূরান্ত পর্যন্ত আবাদি ছড়িয়ে পড়ে। সমৃদ্ধি ঘটে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার। এমন বহু লোক ইসলামগ্রহণ করে, যারা ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল ছিল না। তাদের মধ্যে অনেককে মদপান করতে দেখা যায়।

উমরের সামনে এটা বড় একটা দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি বিশিষ্ট সাহাবিদের সমবেত করে তাঁদের পরামর্শ চাইলেন। সবাই তখন মদ্যপের শাস্তিস্বরূপ ৮০টা বেত্রাঘাতের ব্যাপারে সম্মতি প্রকাশ করলেন। এটা ছিল হদের সর্বনিম্ন পরিমাণ। মোটকথা, তিনি এটা কার্যকর করেন। তাঁর গোটা খিলাফতকালে কোনো সাহাবি এর বিরোধিতা করেননি।

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহ. বলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. ওয়াবরাহ আস সালিতিকে উমরের কাছে পাঠান। তাঁর বর্ণনা, আমি উমরের কাছে এলাম। তাঁর কাছে তখন তালহা, জুবায়ের ও আবদুর রাহমান ইবনু আওফ রা. মসজিদে হেলান দেওয়া অবস্থায় বসা ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, 'খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আপনাকে এই সংবাদ জানাতে বলেছেন যে, লোকেরা অধিকহারে মদে আসক্ত হয়ে পড়েছে। তারা শাস্তির পরোয়া করছে না। সুতরাং এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশনা কী?'

উমর বললেন, 'এরা সবাই তোমার সামনে রয়েছেন। (এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে)।' ওয়াবরাহ বলেন, আলি বললেন, 'আমার অভিমত হচ্ছে, তারা যখন নেশায় মাতাল হয়ে যাবে, তখন আজেবাজে কথা বকাবকি করতে থাকবে। বকাবকির সময় তারা একে অন্যের ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করবে। আর অপবাদের শরয়ি শাস্তি হচ্ছে ৮০টা বেত্রাঘাত।'

এ কথা শুনে সবাই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করলেন। উমর তখন বললেন, 'তাঁর পরামর্শে তোমাদের শাসক (অর্থাৎ আমি) সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে।' এরপর উমর এবং খালিদও এমন অপরাধীদের ৮০টা বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করেন।[৪৩৭]

দুই. শামের রাজ্যসমূহ

আবু বকরের ইনতিকালের সময় পর্যন্ত সিরিয়ার মুসলিম সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা দেখভাল করতেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। উমর রা. খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁর আসনে আবু উবায়দাকে নিযুক্ত করেন। আর খালিদ রা.-কে দামেশকের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। ইতিহাসবিদ খালিফা ইবনু খাইয়াতের বর্ণনায়ও এমনটা উল্লেখ রয়েছে।[৪৩৮]

১. ইরাক ও পারস্যপ্রদেশ

ইরাক বিজয়ের ধারাবাহিকতা আবু বকরের খিলাফতকাল থেকেই শুরু হয়। প্রথমদিকে মুসান্না ইবনুল হারিসা শায়বানি রা. ইরাকের প্রশাসক ছিলেন; কিন্তু যখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ সেখানে পৌঁছান, তখন তাঁর হাতে ইরাকের শাসনভার তুলে দেওয়া হয়। যখন আবু বকর থেকে ইরাকের সেনাদল নিয়ে ফিরে যাওয়ার আদেশ আসে, তখন আবার ইরাকের শাসনভার মুসান্না ইবনুল হারিসার হাতে অর্পণ করা হয়।

উমরের খিলাফতকালে মুসান্নাকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবু উবায়দা ইবনু মাসউদকে বসানো হয়। মুসান্নাকে অপসারণের সময় আর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অপসারণের সময় একই।

২. প্রাক্তন গভর্নরদের সম্মান

ফারুকি শাসনামলের গভর্নরদের একটি স্বতন্ত্র গুণ ছিল, তাঁরা তাঁদের আগের গভর্নরদের যথেষ্ট ইজ্জত-সম্মান করতেন। কেবল ফারুকি যুগেই নয়; বরং সকল খলিফায়ে রাশিদের যুগের অধিকাংশ গভর্নরের মধ্যে এই গুণ ছিল পূর্ণমাত্রায়। যেমন, আমরা দেখতে পাই, যখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ প্রমুখের পর সিরিয়ার গভর্নর হয়ে আসেন, তখন তিনি মোটেই এটা ইচ্ছা করেননি যে, আবু উবায়দাকে পেছনে রেখে নিজে সালাতের ইমামতি করবেন। অনুরূপ যখন সিরিয়ার মুসলিমবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ থেকে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে অপসারণ করে

---

৪৩৭ *ইলামুল মুওয়াক্কিয়িন* : ১/২১১।

৪৩৮ *তারিখু খালিফা* : ১৫৫।

তাঁর স্থলে আবু উবায়দাকে নিয়োজিত করা হয়, তখন আবু উবায়দা খালিদের সম্মানে ফারুকি ফরমাননামা গোপন রাখেন। খালিদকে ব্যাপারটা অবহিত করেননি। একপর্যায়ে খালিদের নামে উমরের দ্বিতীয় চিঠি এলে ব্যাপারটা তিনি জানতে পারেন।[৪৩৯]

ড. আবদুল আজিজ আল উমরি লেখেন, 'এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পর্যবেক্ষণ করে তখনকার রাজ্যের কর্মকর্তাদের ইতিহাসে আমি এমন কোনো ঘটনা পাইনি, যেখানে নবনিয়োজিত গভর্নর প্রাক্তন গভর্নরকে অপমান বা তিরস্কার করেছেন বলে কোনো তথ্য আছে বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের কুৎসা রটিয়েছেন; বরং সচরাচর তাঁরা দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর প্রথম যে ভাষণ দিতেন, সেখানে প্রাক্তন গভর্নরের প্রশংসা করতেন।'[৪৪০]

তিন. খালিদকে সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অপসারণ

ইসলামের শত্রুরা সবসময় সুযোগ খুঁজে বেড়ায়। মুসলিমদের ক্ষতি করা যায়, এমন কোনো সুযোগই তাই হাতছাড়া করতে চায় না। তারা সাহাবিদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলির ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁদের সম্মানে দাগ লাগাতে চেষ্টা করে। যখন তাদের শয়তানি উদ্দেশ্য পূরণে সফল হতে পারে না, তখন নিজেরাই এমন কিছু মনগড়া বর্ণনা তৈরি করে, যাতে পাঠকের অন্তরে সহজেই সাহাবিদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা চলে আসে। এ লক্ষ্যেই তারা উমর ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের পবিত্র সোনালি ইতিহাসকে কলঙ্কিত করতে মনগড়া বর্ণনাগুলো ছড়িয়ে দেয়। উমরের পক্ষ থেকে খালিদকে অপসারণের কারণগুলোর ভুল ব্যাখ্যা করে। ব্যক্তিত্ববান উভয় সাহাবির নামে ভিত্তিহীন অপবাদ লাগায়। তাঁদের বিরুদ্ধে এমন কিছু বর্ণনাকে দলিল বানায়, যার কোনো ভিত্তিই নেই এবং সত্যানুসন্ধানীদের কাছে এসব কথাবার্তা অসার-অবান্তর বলে গণ্য।[৪৪১]

খালিদের অপসারণের ঘটনাবলি কোনো ধরনের রদবদল ছাড়া পূর্ণ সততার সঙ্গে বর্ণনা করব। তাঁর অপসারণ দুই স্থানে দুবার ঘটে। প্রত্যেকটার কারণও ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

১. প্রথমবার অপসারণ

উমর রা. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে সিরিয়ার সেনাপ্রধান ও প্রধান প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন। এ অপসারণটা করা হয় আবু বকরের ইনতিকালের পর উমরের খিলাফতকালের একদম শুরুর দিকে ১৩ হিজরিতে। এর কারণ হচ্ছে, আবু বকর ও উমরের শাসনপদ্ধতিতে অনেকটা পার্থক্য ছিল। আবু বকরের শাসনপদ্ধতি ছিল—

---

৪৩৯ *তারিখুল ইয়াকুবি* : ২/১৩৯-১৪০।

৪৪০ *আল-ওয়ালায়াতু আলাল বুলদান* : ২/৫৫।

৪৪১ *আবাতিলুন ইয়াজিবু আই ইয়ামহা মিনাত তারিখি*, ইবরাহিম শাউত : ২২৩।

তিনি তাঁর গভর্নরদের রাষ্ট্রের সব ধরনের কাজে মানুষের একক ও সমষ্টিগত সদস্যের ওপর ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার শর্তে কার্যক্রম পরিচালনার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা—এটা নিজের হাতে হোক বা গভর্নরদের হাতে। খলিফার পক্ষ থেকে সকল গভর্নরের জন্য এ অনুমতি ছিল যে, রাজ্যের ছোট-বড় কাজে যেটা ভালো মনে হবে সেটাই করবে। এর জন্য চিঠির মাধ্যমে খলিফার পক্ষ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ গভর্নর আর্থিক বা রাজ্যের অন্যান্য কাজে ইনসাফ বজায় রাখবে, তাকে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণের প্রয়োজন নেই।[৪৪২]

একবার উমর রা. আবু বকরকে বললেন, 'আপনি খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে চিঠি লিখে বলুন, তিনি যেন আপনার অনুমতি ছাড়া কাউকে একটা ছাগল বা উটও না দেন।' আবু বকর খালিদের নামে এ আদেশ লিখে চিঠি পাঠান। উত্তরে খালিদ লেখেন, 'আমি যেভাবে কাজ করছি সেভাবেই কাজ করতে দেন; নাহয় আপনি জানেন আর আপনার কাজ জানে।'

তাঁর এ উত্তর দেখে উমর তাঁকে অপসারণ করতে পরামর্শ দেন;[৪৪৩] কিন্তু আবু বকর তাঁকে তাঁর স্থানে বহাল রাখেন।[৪৪৪]

এরপর উমর রা. যখন খলিফার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁর সংবিধানে গভর্নদের ইচ্ছা-স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে দেন। গভর্নরদের জন্য আবশ্যক করে দেন, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ যখন সামনে আসবে, তখন সেটা সম্পর্কে খলিফাকে অবগত করতে হবে এবং কাজের যে ফল আসবে, সেটাও খলিফার আদেশক্রমে বাস্তবায়ন করবে।

তিনি মনে করতেন, খলিফা তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে এবং প্রজাদের ওপর অর্পিত গভর্নরদের দায়িত্বের ব্যাপারেও দায়িত্বশীল। আর এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, কোনো গভর্নর যদি ভুলক্রমে ত্রুটি বা ক্ষতি করে বসে, তাহলে খলিফার এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আমি তো সঠিকভাবে গভর্নর নির্বাচন করেছি।

তিনি খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার সময় লোকদের সামনে দেওয়া ভাষণে বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের মাধ্যমে আমাকে পরীক্ষা করছেন। আর আমার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করছেন। আমার দুই সাথির (মুহাম্মাদ ﷺ ও আবু বকর রা.) পর তিনি আমাকে বাকি রেখেছেন। আল্লাহর শপথ, তোমাদের কারও কোনো বিষয় যদি আমার কাছে পৌঁছায়; অথবা আমার কাছে পৌঁছতে কেউ বাধা দেয়, তাহলে আমি তার বদলা ও আমানত যথাযথভাবে পূরণ করব। গভর্নররা যদি তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন

---

৪৪২ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ৩২১-৩২২।

৪৪৩ *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু* : ৭/১১৫।

৪৪৪ *আত-তারিখুল ইসলামি* : ১/১৪৬।

করে, তাহলে আমি তাদের সঙ্গে সুন্দর আচরণ করব; তারা অপরাধ করলে আমি তাদেরও কঠিন শাস্তি দেবো।'[৪৪৫]

উমর রা. জিজ্ঞেস করেন, 'আমি যদি সঠিক ব্যক্তিকে তোমাদের দায়িত্বশীল বানাই; আর তাকে যদি ইনসাফের আদেশ করি, তাহলে কি আমার দায়িত্ব পালন করা হয়ে যাবে?' লোকেরা বলেন, 'জি হ্যাঁ।' উমর বলেন, 'না; বরং ততক্ষণ আমার দায়িত্ব আদায় হবে না, যতক্ষণ আমি দেখব না যে, সে আমার কথামতো কাজ করেছে কি না।'[৪৪৬]

তিনি দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আবু বকরের নির্ধারিত গভর্নরদের তাঁর প্রণীত সংবিধানমতো চালানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের কেউ কেউ তাঁর এ নিয়মনীতি গ্রহণ করেন; আর কেউ কেউ মানতে অস্বীকৃতি জানান। অস্বীকারকারীদের মধ্যে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-ও ছিলেন।[৪৪৭]

মালিক ইবনু আনাস রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, উমর দায়িত্ব গ্রহণের পর খালিদকে চিঠি লিখে বলেন, 'আমার অনুমতি ছাড়া কাউকে একটা উট বা ছাগলও দেবেন না।' খালিদ তাঁর উত্তরে বলেন, 'আমি যেভাবে কাজ করছি সেভাবে কাজ করতে দেন; নাহয় আপনার কাজ আপনাকে সোপর্দ করলাম।'

উমর বলেন, 'আমি আবু বকরকে যে জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করেছিলাম, সেটা যদি এখন বাস্তবায়ন না করি, তাহলে আল্লাহর কাছে আমি সত্যবাদী থাকব না।' তারপরই তিনি খালিদকে অপসারণ করেন।[৪৪৮]

এরপর বার বার উমর রা. তাঁকে গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, 'আমার কাজে স্বাধীনতা থাকতে হবে। আমি যা ইচ্ছা করব।' কিন্তু উমর তাঁর এ সিদ্ধান্তের কারণে গভর্নর নিযুক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন।[৪৪৯]

সুতরাং জানা গেল, উমর সাংবিধানিক কারণেই খালিদকে অপসারণ করেন। শাসক তার সকল দায়িত্বশীলের ওপর দায়িত্বশীল। তার অধিকার আছে রাষ্ট্রের যেকোনো কাজে হস্তক্ষেপ করার। রাজনৈতিক জীবনে এ ধরনের ঘটনা কারও না কারও সঙ্গে ঘটবেই; এটা স্বাভাবিকতা। খালিদের অপসারণের ঘটনায় এমন কোনো নজরবিহীন কারণ পাওয়া যায়নি, যা সাব্যস্ত করতে অসার আর অগ্রহণযোগ্য বর্ণনার আশ্রয় নিতে হবে।

আরও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, উমর রা. যে সময়টাতে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ

---

৪৪৫ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ৩৩১।

৪৪৬ *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু* : ৭/৫১১।

৪৪৭ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ* : ৩৩১।

৪৪৮ *আল-বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু* : ৭/৫১১।

৪৪৯ *আত-তারিখুল ইসলামি* : ১/১৪৬।

করেন, তখন সবাই পূর্ণ ব্যক্তিত্ববান মানুষ ছিলেন। নবুওয়াতের পরশে তাঁরা ছিলেন সুসংগঠিত। আর গভর্নরের জন্য প্রথমত একটা শর্ত হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় শর্তের সঙ্গে যিনি একমত হতে পারবেন, তাকেই তিনি গভর্নরের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং উম্মতে মুসলিমা যতক্ষণ তার কাজে নিরাপদ ও শান্তিতে থাকবে, ততক্ষণ তিনি তার স্থানে বহাল থাকতে পারবেন। কেননা, কোনো শাসক বা গভর্নরের অধিকার ছিল না, আজীবন তার আসনে বহাল থাকতে পারবেন। বিশেষ করে খলিফা ও গভর্নরের মধ্যে শাসনপদ্ধতিতে মতানৈক্য দেখা দিলে তখন কাউকে অপসারণ করাটা দূষণীয় কিছু নয়।

ইতিহাসের ঘটনাবলি সাক্ষী, উমর রা. আল্লাহর তাওফিকে তাঁর পূর্ণ খিলাফতকালে অতুলনীয় সফলতা অর্জন করেন। একজনকে অপসারণ করে সঙ্গে সঙ্গে অন্যজনকে সে দায়িত্বে বসিয়ে দিতেন। যাকে পরে দায়িত্বে বসাতেন, তিনি আগের জনের চেয়ে কম উপযুক্ত হতেন না। আসল কথা হচ্ছে, এটা ইসলামের আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার ফল, যার ভিত্তি এ কথার ওপর যে, তিনি সর্বদা উম্মতে মুসলিমার জন্য সবচেয়ে কল্যাণকর এবং রাজনৈতিক গভীর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরই দায়িত্ব প্রদান করতেন।[৪৫০]

খালিদ রা. তাঁর অপসারণের চিঠি কোনো আপত্তি ছাড়াই অত্যন্ত মান্যতার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং আবু উবায়দার নেতৃত্বে জিহাদ করতে থাকেন। আল্লাহ তাঁর হাতে কিন্নাসরিন বিজিত করেন। তারপর আবু উবায়দা খালিদকে সেখানকার আমির নিযুক্ত করে উমরের কাছে এ মর্মে চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি কিন্নাসরিন বিজয়ের বিস্তারিত আলোচনা করেন। উমর তাঁর চিঠি পড়ে বলেন, 'খালিদ নিজেকে নিজে সেখানের আমির বানিয়ে নিল। আল্লাহ আবু বকরের ওপর রহম করুন। তিনি আমার চেয়েও অধিক দূরদর্শী ছিলেন।'

সম্ভবত উমর রা. এটাই বলতে চাচ্ছেন যে, খালিদ স্বভাবগতভাবে সাহসিকতা ও যুদ্ধের বিষয়াদিতে খুবই পারদর্শী। যুদ্ধ, জিহাদ ও সংগ্রামের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

ভয়ানক পরিস্থিতিতে প্রাণপণ লড়াই করে যেতে সামান্যতম চিন্তাও করেননি। তা সত্ত্বেও উমর রা. তাঁকে অপসারণের জন্য আবু বকরের কাছে অনেক অনুরোধ করেন; কিন্তু তিনি তাঁকে অপসারণ করেননি। সেটা হয়তো তাঁর প্রতি আবু বকরের এই দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, তিনি ছিলেন একজন বীরবাহাদুর ও কৌশলী যোদ্ধা। মুসলিমদের যে কজন হাতেগোনা সাহসী বীর আছেন, তিনি তাঁদের অন্যতম।[৪৫১]

---

[৪৫০] *খালিদ ইবনু ওয়ালিদ* : ৩৩২-৩৩৩।

[৪৫১] প্রাগুক্ত : ৩২১।

খালিদ আবু উবায়দার নেতৃত্বে চার বছর ছিলেন। ইতিহাস সাক্ষী, কখনো কোনো বিষয়ে আবু উবায়দার সঙ্গে ইবনুল ওয়ালিদের মতপার্থক্য হয়নি। খালিদের মন থেকে তাঁকে অপসারণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া (বেদনা) দূর করার ক্ষেত্রে আবু উবায়দার কৃতিত্ব অস্বীকার করার নয়। তিনি সর্বদা তাঁকে যথাযথ সম্মান করতেন। তাঁর কথাবার্তা-পরামর্শকে অন্যের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দিতেন। অপসারণের পর তাঁকে বিভিন্ন যুদ্ধে অগ্রভাগে রাখার ফলে এতটা ইতিবাচক প্রভাব পড়ে যে, তাঁকে যুদ্ধের ময়দানে এক নজিরবিহীন সাহসের মূর্তপ্রতী হয়ে আবির্ভূত হতে দেখা যায়। দামেশক, কিন্নাসরিন ও ফিহল বিজয় তাঁর উচ্চ আত্মিক দীক্ষার স্বীকৃতি দেয়। এ কারণে তিনি খুব সহজে তাঁর অপসারণ মেনে নেন।

তিনি অপসারণের আগে ও পরে 'সাইফুল্লাহ' হয়েই বেঁচে ছিলেন।[৪৫২] ইতিহাস আবু উবায়দার সোনালি কথাগুলো আমাদের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে, যে কথাগুলো তিনি খালিদের অপসারণের পর সহমর্মী হয়ে উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, 'আমি দুনিয়ার বাদশাহি চাই না, চাই না দুনিয়ার জন্য কাজ করতে। আপনি যা কিছু দেখছেন; এগুলোর ধ্বংস অনিবার্য। আমরা দুজন পরস্পর ভাই—উভয়ে মিলে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং এটাই সত্য। কারও জন্য এটা দূষণীয় নয় যে, তার দীনি ভাই তার ওপর প্রশাসক হবে। যারা প্রশাসক বা গভর্নর, তারা ভুলত্রুটি ও অপরাধের খুব কাছাকাছি থাকেন। কেবল আল্লাহ যাদের পরম করুণায় রক্ষা করেন, তারাই এসব ভুলত্রুটি থেকে বেঁচে থাকেন।'[৪৫৩]

আবু উবায়দা তাঁর অধীনে খালিদকে যুদ্ধে যাওয়ার আহ্বান করলে তিনি বলেন, 'ইনশাআল্লাহ, আমি উপস্থিত থাকব। আমি তো আপনার আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলাম।' আবু উবায়দা বলেন, 'আবু সুলায়মান, আমি আপনাকে আদেশ করে খুবই লজ্জিত।' খালিদ বলেন, 'আমার ওপরে যদি একজন ছোট্ট বাচ্চাকেও আমির নিযুক্ত করা হতো, তাহলে আমি তার আদেশও যথাযথ মেনে চলতাম। আমি আপনার বিরোধিতা করব কোন যুক্তিতে? আপনার ইমান আমার আগের। আপনি আমার আগে ইসলামগ্রহণ করেছেন। ইসলামের অগ্রগামীদের সঙ্গে আপনিও অগ্রগামী। তাঁদের সঙ্গে খুব দ্রুত সময়ে আপনি ইসলামগ্রহণ করেছেন। রাসুল ﷺ আপনাকে 'আমিন' উপাধি দিয়েছেন। আমি আপনার সমমর্যাদা ও সম্মান কী করে পাব! আপনার সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করেছি। আমি কখনো আপনার বিরোধিতা করব না এবং কোনো রাজ্য শাসনও করব না।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. এসব বলেই শুধু ক্ষান্ত হননি; বরং বাস্তবায়ন করে

---

[৪৫২] প্রাগুক্ত : ৩৪৬।

[৪৫৩] প্রাগুক্ত : ৩২৩।

দেখিয়েছেন এবং আদেশ পালনে দ্রুত বেরিয়েছেন। তাঁর কথা ও কাজে এটা পরিষ্কার যে, ধর্মীয় ও নৈতিক প্রেরণা খালিদ ও আবু উবায়দার কর্মক্ষেত্রে মুখ্যভূমিকা পালন করেছিল। মুসলিমবাহিনীর সেনাপতির দায়িত্ব থেকে অপসারণের ফলে খালিদের ব্যক্তিগত অবস্থা নেতা থেকে অনুগামীতে পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও তিনি খলিফা ও গভর্নরকে আনুগত্যের নীতিমালা অনুসরণ করেছিলেন।[৪৫৪]

খালিদের প্রথম অপসারণ এ কারণে ছিল না যে, তাঁর যোগ্যতা নিয়ে খলিফার কোনো সন্দেহ, তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ, তিনি শরিয়তের পবিত্র সীমা লঙ্ঘন করেছেন বা খালিদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতার ওপর কোনো কলঙ্কের দাগ পড়েছে; বরং সেটা ছিল দুজন মহাপুরুষ, দুজন প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির গৃহীত দুটি ভিন্ন পদ্ধতি। তাঁদের প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন যে, তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতির বাস্তবায়ন ছিল অপরিহার্য। তাঁদের মধ্যে কোনো একজনকে ছাড় দিতে বা মেনে নিতে হতো, তাহলে অন্তরে কোনো রকম একগুঁয়েমি, বিরক্তি বা অসন্তোষ পোষণ না করে মুসলিমবাহিনীর সেনাপতিকেই খলিফার কাছে হার মানতে হতো।[৪৫৫]

মহান আল্লাহর পথনির্দেশনায় উমর রা. আবু উবায়দা রা.-কে সিরিয়ার মুসলিমবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ইয়ারমুকযুদ্ধের পর অঞ্চলটার প্রয়োজন ছিল যুদ্ধনিবৃত্তি, যেন হিংসা-বিদ্বেষ শেষ হয়, আঘাত আরোগ্য লাভ করে এবং অন্তরের পুনর্মিলন সাধিত হয়। আবু উবায়দা যখন সন্ধিস্থাপনের কোনো সুযোগ দেখতেন, তখন ত্বরান্বিত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ছুটে চলতেন; কিন্তু প্রয়োজনের সময় তিনি যুদ্ধ থেকে পিছপা হননি। শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো পথ যদি থাকত, সেটা অনুসরণ করতেন। অন্যথায় জিহাদের প্রস্তুতি নিতেন।

সিরিয়াবাসী আবু উবায়দার ক্ষমাশীলতার কথা জানত। এ জন্য তারা আত্মসমর্পণ করতে তাঁর কাছে আসে। তারা অন্যের তুলনায় তাঁর মুখোমুখি হওয়া বেশি পছন্দ করত। উমরের নির্দেশে আবু উবায়দাকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর নিযুক্তি ছিল প্রাদেশিক কল্যাণের স্বার্থে।[৪৫৬]

২. দ্বিতীয়বার অপসারণ

১৭ হিজরিতে কিন্নাসরিনে খালিদকে দ্বিতীয়বার অপসারণ করা হয়। উমরের কাছে খবর পৌঁছায়, খালিদ ও ইয়াজ ইবনু গানাম বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে

---

[৪৫৪] *নিজামুল হিকামি ফি আহদিল খুলাফায়ির রাশিদিন* : ৮৩।

[৪৫৫] *আবাতিল ইয়াজিব আন-তুমহা মিনাত তারিখ* : ১৩২।

[৪৫৬] *আবকারিয়াতু খালিদ*, আল আক্কাদ : ১৫৪, ১৫৫-১৫৬।

বিপুল পরিমাণ গনিমত নিয়ে ফিরেছেন। খালিদের বদান্যতার আশায় লোকেরা দূরদূরান্ত থেকে তাঁর কাছে আসছে। লোকদের মধ্যে ছিল আশআস ইবনু কায়েস আল কিনদি। খালিদ রা. তাকে ১০ হাজার মুদ্রা দিয়েছিলেন। খালিদের কর্মকাণ্ডের কিছুই উমরের কাছে গোপন ছিল না।[৪৫৭]

উমর রা. তাঁর সেনাপতি আবু উবায়দার কাছে চিঠি লিখলেন। খালিদ রা. যে উৎস থেকে আশআসকে মোটা অঙ্কের সম্পদ দিয়েছেন, উমর তাঁকে তা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে খালিদকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দেন। তিনি তাঁকে মদিনায় ডেকে আবু উবায়দার উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। অবশেষে গনিমত থেকে ১০ হাজার মুদ্রা চুরির অপবাদ থেকে খালিদ নির্দোষ প্রমাণিত হন।[৪৫৮]

খালিদকে তাঁর অপসারণের কথা জানানো হলে তিনি সিরিয়াবাসীর কাছ থেকে বিদায় নেন। সেনাবাহিনী থেকে সেনাপতির বিচ্ছেদ-বেদনার সামান্যই তিনি দৃষ্টিগোচর করা শোভনীয় মনে করেছিলেন। তিনি যে ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তা প্রকাশ পেয়েছিল জনসাধারণের উদ্দেশে তাঁর বিদায়ী কথামালায়—'সিরিয়ায় শান্ত-সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমিরুল মুমিনিন আমাকে সিরিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। এরপর তিনি আমাকে অপসারণ করেছেন।'

একজন তখন দাঁড়িয়ে বলল, 'ধৈর্য ধরুন সেনাপতি। কারণ, এখন তো ফিতনার সময়।' খালিদ বললেন, 'খাত্তাবের পুত্র যতদিন জীবিত, ততদিন ফিতনার অবকাশ নেই।'[৪৫৯]

এটি ছিল শক্তিশালী ও অভিভূতকারী ইমানের বহিঃপ্রকাশ। মুহাম্মাদ ﷺ-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা মনোনীত ছিলেন, কেবল তাঁরাই এমন ইমানের অধিকারী ছিলেন। কী সেই পারলৌকিক শক্তি, যা এমন রাশভারী পরিস্থিতিতেও খালিদকে দমিয়ে রেখেছিল। সেটা কী ছিল, যার কারণে তিনি এমন শান্তিপূর্ণ ও বিচক্ষণ জবাব দিয়েছিলেন?[৪৬০]

উমরের খিলাফতের সমর্থনে খালিদের কথাগুলো শোনার পর লোকেরা শান্ত হয়ে গেল। তারা উপলব্ধি করল যে, তাদের অপসারিত সেনাপতি এমন ব্যক্তি নন, যিনি হতাশা ও বিপ্লব উদ্রেক করে নিজের গরিমা গড়ে তুলবেন; বরং গঠনমূলক ভূমিকা পালনের জন্য যাঁদের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। যদি পরিস্থিতি কখনো তাঁদের কাছে নিজেদের গড়ে তোলা সাম্রাজ্য বা গৌরবও ভেঙে ফেলার দাবি জানায়, তখন তাঁরা আরও ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।

---

৪৫৭ *তারিখুত তাবারি* : ৫/৪১।

৪৫৮ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ৩২৪।

৪৫৯ প্রাগুক্ত : ৩৪৭; *আল-কামিল ফিত-তারিখ* :২/১৫৬।

৪৬০ *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ৩৪৭।

খালিদ রা. মদিনায় গিয়ে উমরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। উমর রা. তখন তাঁর সম্মানে আবৃত্তি করেন,

> *তুমি বিজয়ের এমন গৌরবগাথা তৈরি করেছ, যা তোমার মতো করে আর কেউ পারেনি।*
>
> *কিন্তু বাস্তবতা কী? মানুষ আসলে যা করে, সবকিছুর প্রকৃত কর্তাই মূলত আল্লাহ।*

খালিদ উমরকে বললেন, 'হে উমর, আমি মুসলিমদের কাছে আপনার নামে অভিযোগ করেছি এবং আল্লাহর শপথ, আপনি আমার প্রতি সদয় নন।' উমর জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব সম্পদ কোথা থেকে এসেছে?' তিনি বললেন, 'আমার গনিমতের অংশ থেকে। ৬০ হাজারের অতিরিক্ত যা থাকবে তা আপনার।' উমর সম্পদ গণনা করে ২০ হাজার মুদ্রা বেশি দেখে সেগুলো বায়তুলমালে জমা করেন। এরপর বলেন, 'হে খালিদ, আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর জন্যই তোমাকে ভালোবাসি এবং আজকের পর তুমি আর কখনো আমার ওপর মনঃক্ষুণ্ন হবে না।'

উমর রা. প্রদেশে চিঠি পাঠালেন, 'আমি খালিদকে এ জন্য অপসারণ করিনি যে, আমি তাঁর ওপর রাগান্বিত বা তিনি কোনো অসদাচরণ করেছেন; বরং লোকেরা তাঁর প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়েছিল। আমার ভয় হলো যে, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তাদের পরীক্ষা নেবেন। আমি চেয়েছিলাম তারা উপলব্ধি করুক যে, আল্লাহই একমাত্র সত্তা, যিনি বিজয় দান করেন; আর তারা যেন প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে বিভ্রান্তির শিকার না হয়।'[৪৬১]

চার. সেনাপতির দায়িত্ব থেকে খালিদকে অপসারণের কারণ এবং এর কল্যাণকর কিছু দিক

উমরের রাষ্ট্রপরিচালনা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে খালিদের অপসারণের কারণসমূহ আমরা সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করতে পারি :

১. তাওহিদের সংরক্ষণ

উমরের কথা ছিল, 'লোকেরা তাঁর মাধ্যমে ফিতনায় নিপতিত হচ্ছিল। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, এমন হয়ে যাবে না তো আবার যে, সাধারণ মানুষ তাঁর ওপরই ভরসা করে বসবে এবং তাঁর কারণে আল্লাহর পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যাবে।' এ কথা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের কারণে লোকেরা ফিতনায় পড়ে যাওয়ার

---

[৪৬১] *তারিখুত তাবারি* : ৫/৪৩।

আশঙ্কা করছিলেন তিনি। তারা হয়তো এমন মনে করতে শুরু করবে, এই বিজয়ধারা ও সাহায্য খালিদের সঙ্গেই নির্দিষ্ট। এতে ক্ষতি হবে, আল্লাহর ওপর তাদের ইমান ও বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে।

উমরের এই সতর্কতাগ্রহণমূলক পদক্ষেপ তাঁর প্রচেষ্টা ও ইচ্ছার বাস্তবায়ন ছিলমাত্র। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সাম্রাজ্যের প্রতিটা স্তরে খালিস তাওহিদ ও ইসলামি আকিদাকে জীবন্ত করা। বিশেষ করে সে সময়টাতে, যখন আকিদা ও আকিদার শক্তির প্রতিপত্তিতেই মুসলিম সাম্রাজ্য তার শত্রুদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছিল। হতে পারত, খালিদের মতো মহান সেনাপতি অহংকারের বশবর্তী হয়ে নিজেও ফিতনায় নিপতিত হবেন, জনসাধারণকেও ফিতনায় আপতিত করবেন। আর নিজের শক্তি ও সাহসিকতাকে পরাক্রমশালী মনে করে বসবেন। এর পরিণাম যা হবে, খালিদ নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন; আর ইসলামি সাম্রাজ্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবেন।

বাস্তবতা হচ্ছে, মুসলিমবাহিনীর নেতৃত্বের জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল, সবই খালিদের মধ্যে ছিল। তিনি আপাদমস্তক তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এমতাবস্থায় যদিও উমরের সেই আশঙ্কা অভাবনীয় মনে হয়, তবে তাঁর মৃত্যুর পর অদূর ভবিষ্যতে খালিদের মতো মহান সেনাপতিকে ঘিরে কোনো ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না; এটাও একেবারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। সবকিছু বিবেচনায় রেখেই মূলত খালিদের মতো মহান সেনাপতির যুদ্ধযুগেই ফিতনা মাথাচাড়া দেওয়ার সব পথ বুদ্ধ করে দেন উমর রা.।[৪৬২]

এটা তো সুস্পষ্ট বিষয় যে, একজন সাধারণ সেনাপতি, যিনি পুরোপুরিভাবে পরীক্ষিত নন এবং যার কীর্তির ঝুলিতেও তেমন কিছু নেই; তার বিপরীতে একজন যোগ্য, পরীক্ষিত ও কীর্তিমান সেনাপতির ক্ষেত্রে ফিতনার আশঙ্কা আসলেই বেশি থাকে।[৪৬৩] মিসরের কবি হাফিজ ইবরাহিম তাঁর কাব্যগ্রন্থে উমর ফারুকের এই আশঙ্কার দিকেই ইশারা করেছেন,

> *আর বলা হলো, হে ফারুক, আমাদের সঙ্গী (সেনাপতি)-এর ব্যাপারে আপনি সঠিক ফায়সালা করেননি; অথচ ধনুকের মালিকই তাঁকে ধনুক দান করেছিলেন।*
>
> *তখন উমর উত্তর দিলেন, তাঁর কারণে মুসলিমরা ফিতনায় নিপতিত হবে বলে আমি আশঙ্কা করেছি। আর যখন জনসাধারণ ফিতনায় নিপতিত হয়, তখন তা নির্বাপিত করবে, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না।*[৪৬৪]

---

[৪৬২] *আদ-দাওলাতুল ইসলামিয়া ফি আসরিল খুলাফায়ির রাশিদিন*, হামদি শাহিন : ১৪৯।

[৪৬৩] *আবকারিয়াতু উমর* : ১৫৮।

[৪৬৪] *হুরুবুল ইসলাম ফিশ শাম* : ৫৬৬।

২. অর্থসম্পদ ব্যয়ের পদ্ধতি নিয়ে খালিদ ও উমরের মতানৈক্য

উমর রা. ভেবেছিলেন যে, দুর্বল ইমানের লোকদের অর্থসম্পদ ও উপহার দিয়ে মন জয় ও আকৃষ্ট করার সময় শেষ হয়ে এসেছে; ইসলামে আর এসব লোকের প্রয়োজন নেই এবং তাদের নিজেদের ইমান ও বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়। অন্যদিকে খালিদ রা. ভেবেছিলেন যে, যে-সকল সাহসী যোদ্ধা ও মুজাহিদ তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন, তাঁদের নিয়ত পুরোপুরি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ছিল না এবং এ সকল লোককে আরও দৃঢ়সংকল্প ও অনুপ্রাণিত করতে অর্থসম্পদের একটা অংশের প্রয়োজন ছিল।[৪৬৫]

উমর ভেবেছিলেন, মুহাজিরদের দরিদ্ররাই এ সম্পদের অধিক হকদার। তিনি আল জাবিইয়াতে খালিদ রা.-কে অপসারণের কারণসমূহ জনসাধারণের উদ্দেশে ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তাঁকে বলেছিলাম, এ অর্থ-সম্পদ দরিদ্র মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করতে; কিন্তু তিনি সামর্থ্যবান ও শক্তিশালী লোকদের মধ্যেও তা বণ্টন করেছেন।'[৪৬৬]

নিশ্চিতভাবেই উমর ও খালিদ উভয়ের নিজেদের অবস্থানের পেছনে শক্ত ভিত ছিল; কিন্তু উমর এমন কিছু বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, যা খালিদ পারেননি।[৪৬৭]

৩. প্রশাসনিক বিষয়ে উমর ও খালিদের কর্মপদ্ধতির তারতম্য

উমর দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, প্রত্যেক ছোট-বড় বিষয়ে গভর্নরদের তাঁর অনুমতি নেওয়া উচিত। অন্যদিকে খালিদ ভাবতেন, জিহাদের ময়দানে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তিনি ভাবতেন, ময়দানে তিনি যেটা যথোচিত মনে করেন, তাঁকে সেটা করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। কারণ, জিহাদের ময়দানে উপস্থিত ব্যক্তি যা দেখে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তা দেখে না।[৪৬৮]

সম্ভবত আরেকটা কারণ ছিল, নতুন নেতৃত্ব-প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া, যেন মুসলিম উম্মাহ খালিদ, মুসান্না ও আমর ইবনুল আসের মতো ধীশক্তিসম্পন্ন মহানায়কের জন্ম দিতে পারে। আরেকটা লক্ষ্য ছিল, জনসাধারণের মধ্যে বোধশক্তির উদয় ঘটানো যে, বিজয় একজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়; সে যে-ই হোক না কেন।[৪৬৯]

---

৪৬৫ *আবাতিল ইয়াজিব* : ১৩৪।

৪৬৬ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/১১৫।

৪৬৭ *আত-তারিখুল ইসলামি* : ১১/১৪৭।

৪৬৮ *আল-খিলাফা ওয়া খুলাফাউ রাশিদুন*, সালিম আল বাহনাসাউই : ১৯৬।

৪৬৯ *আবাতিল ইয়াজিব* : ১৩৪।

৪. খালিদের অপসারণের প্রতি মুসলিমসমাজের মনোভাব

খলিফা কর্তৃক তাঁর গভর্নরদের নিয়োগ ও অপসারণের অধিকার হিসেবে মুসলিমসমাজ এ অপসারণকে গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা খলিফা কর্তৃক তাঁর গভর্নরদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা অস্বীকারের অধিকার কারও ছিল না।

বর্ণিত আছে; একবার মধ্যরাতে উমর রা. বাইরে বেরোলে আলকামা ইবনু উলাসাহ কিলাবির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। উমরের সঙ্গে খালিদের ভীষণ মিল থাকায় আলকামা ভেবেছিলেন তিনি খালিদ। তিনি বললেন, 'হে খালিদ, এই লোক আপনাকে অপসারণ করে হীন আচরণ করেছে। আমি আমার এক ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর কাছে কিছু চাইতে এসেছিলাম; কিন্তু তিনি যা করেছেন, তাই আমি তাঁর কাছে কখনো কোনোকিছু চাইব না।'

তিনি কী লুকোতে চেষ্টা করছেন, সেটা জানার জন্য উমর তাঁকে বললেন, 'বেশ, আমাকে আরও কিছু বলুন।' তিনি বললেন, 'আমাদের ওপর এ সকল মানুষের হক আছে, আমাদের তা আদায় করতে হবে এবং আল্লাহ আমাদের পুরস্কৃত করবেন।'

পরদিন সকালে আলকামা রা. যখন তাঁদের উভয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলেন, তখন উমর খালিদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গত রাতে আলকামা আপনাকে কী বলেছে?' খালিদ বললেন, 'আল্লাহর শপথ, তিনি কিছুই বলেননি।' তখন উমর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি শপথ করে এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছেন?'

আলকামা রা. মনঃক্ষুন্ন হয়ে ভাবলেন যে, গত রাতে তিনি খালিদ ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে কথা বলেননি। এরপর তিনি বলা শুরু করলেন, 'হে খালিদ, বলে ফেলুন।'

উমর আলকামার প্রতি উদার ছিলেন এবং তাঁর প্রয়োজন পূরণ করেছিলেন। তিনি বললেন, 'আপনার মতো চিন্তা করে—যদি এমন আরও লোকের সন্ধান মিলত—অর্থাৎ, যারা শাসকের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করা সত্ত্বেও তাঁকে মান্য করে, তাহলে তাঁরা আমার কাছে অমুক এবং অমুকের চেয়ে অধিক প্রিয় হতো।'[৪৭০]

মুসলিমসমাজে সবাই তাঁকে এত সম্মান ও আনুগত্য দেখানোর পরও কিছু অভিযোগ আসে তাঁর নামে। যেমন, জাবিইয়ায় উমর রা. যখন জনসাধারণের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদের বলব যে, কেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে আমি অপসারণ করেছি—আমি তাঁকে মুহাজির দরিদ্রদের মধ্যে এ অর্থ-সম্পদ বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু সামর্থ্যবান ও শক্তিশালীদের মধ্যে যারা উচ্চপদস্থ ও বাকপটু, তিনি তাদের এ সম্পদ দান করেছেন। ফলে আমি তাঁকে অপসারণ করে তাঁর স্থলে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে নিযুক্ত করেছি।'

---

[৪৭০] *আদ-দাউলাতুল ইসলামিয়াহ ফি আসর আল-খুলাফা আর রাশিদিন* : ১৫১।

তখন আবু আমর ইবনুল আস ইবনু মুগিরা বলেন, 'হে উমর ইবনুল খাত্তাব, আল্লাহর শপথ, আপনি ইনসাফ করেননি। আল্লাহর রাসুলের নিযুক্ত একজন সেনাপতিকে আপনি অপসারণ করেছেন। রাসুল ﷺ যে তরবারি কোষমুক্ত করেছিলেন, আপনি তা কোষবদ্ধ করেছেন। রাসুল ﷺ যে ঝান্ডা উত্তোলন করেছেন, আপনি তা অবনমিত করেছেন। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনার চাচাতো ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষা প্রদর্শন করেছেন।'

উমর ইবনুল খাত্তাব বললেন, 'আপনার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং আপনি বয়সেও তরুণ। আপনার চাচাতো ভাইয়ের জন্যই আপনি ক্রুদ্ধ।'[৪৭১] এভাবে উমর রা. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের চাচাতো ভাইয়ের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করলেন, যিনি খালিদের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে উমরকে পরশ্রীকাতরতার দোষে অভিযুক্ত করেছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও উমর ধৈর্যশীল ছিলেন।[৪৭২]

পাঁচ. ইরাক ও পূর্বাঞ্চল বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ

আবু বকর সিদ্দিকের খিলাফতকালে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের নেতৃত্বে ইরাকে যে বিজয়াভিযান সংঘটিত হয়, সেটা ছিল পূর্বাঞ্চলে ইসলামি বিজয়াভিযানের প্রথম ধাপ। আমি *আবু বকর সিদ্দিক রা. : জীবন ও কর্ম* গ্রন্থে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। যখন উমরের যুগ আসে, তখন তিনি সিদ্দিকি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যথাযথ প্রয়াস নেন। পূর্বাঞ্চলে বিজয়ের এই দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয় তাঁর শাসনামল থেকে।

১. আবু উবায়েদ সাকাফির নেতৃত্বে ইরাকযুদ্ধ

আবু বকর সিদ্দিক রা. ১৩ হিজরির ২৩ জুমাদাল উখরায় ইনতিকাল করেন। মঙ্গলবার রাতে তাঁকে দাফন করা হয়। পরদিন ভোরে উমর রা. লোকজনকে ইরাকযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেন। এর সাওয়াব ও পুরস্কার সম্পর্কেও জানান; কিন্তু কেউই তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। কারণ, পারসিকদের শক্তির দাপট এবং রণ-নৈপুণ্যের কারণে কেউই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাইত না। তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও যুদ্ধে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান; কিন্তু কেউই সাড়া দেয়নি। সেনাপতি মুসান্না রা. বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যে খালিদের হাতে ইরাকের একটা বিরাট অংশে আল্লাহ মুসলিমদের যে বিজয় দান করেছেন, তা উল্লেখ করেন। সেখানে যে ধনসম্পদ ও মালামাল মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে, তা-ও তিনি সবাইকে অবহিত করেন; কিন্তু তৃতীয় দিনের আহ্বানেও কেউ সাড়া দেয়নি। চতুর্থ দিনের আহ্বানের পর

---

[৪৭১] *সুনানুন নাসায়ি* : ৮২৮৩। *আস-সুনানুল কুবরার* বর্ণনাটি সহিহ; *মাহদুস সাওয়াব* : ২/৪৯৬। সনদ সহিহ।
[৪৭২] *সহিহ আত-তাওসিক ফি সিরাতি ওয়া হায়াতিল ফারুক* : ২১৯।

প্রথম সাড়া দিয়ে যুদ্ধে যেতে সম্মতি দেন আবু উবায়েদ ইবনু মাসউদ সাকাফি। এরপর ক্রমশ লোকজন সাড়া দিতে শুরু করে।[৪৭৩]

উমরের ডাকে আবু উবায়েদ সাকাফির পর সালিত ইবনু কায়েস আনসারি রা. লাব্বাইক বলেন। এরপর তিনি বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন, পারসিকদের ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত আমরা শয়তানের ধোঁকায় ছিলাম। শুনে নিন, আমি, আমার চাচাতো ভাই আর যারা আমাদের সঙ্গে রয়েছে, সবাই আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।'[৪৭৪]

সালিতের এই আত্মোৎসর্গী বক্তব্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করে চেতনা জাগ্রত করে। পারসিকদের বিরুদ্ধ প্রাণপণ লড়াইয়ের জাগরণ সৃষ্টি হয় তখন। লোকজন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাবকে বলতে থাকে, 'আপনি কোনো একজন মুহাজির বা আনসার সাহাবিকে আমাদের আমির বানিয়ে দিন।'

উমর তখন বলেন, 'যে মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছে, সে-ই আমির হওয়ার অধিক উপযুক্ত; অন্য কেউ নন। সালিত যদি সামরিক বিষয়ে চঞ্চল চিত্তের অধিকারী না হতো, তবে তাঁকেই তোমাদের আমির বানিয়ে দিতাম। সুতরাং আবু উবায়েদ আমির হবে আর সালিত হবে উজির।' সবাই বিনা বাক্যে তা মেনে নেন।[৪৭৫]

আরেক বর্ণনায় আছে; উমর রা. সবার ওপর সেনাপতির দায়িত্ব দেন আবু উবায়েদ সাকাফিকে। তিনি কিন্তু সাহাবি ছিলেন না। কেউ কেউ উমরকে জিজ্ঞেস করলেন যে, 'কোনো সাহাবিকে আপনি প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করলেন না কেন?' তিনি বললেন, 'যে প্রথমে সাড়া দিয়েছে, আমি তাঁকেই প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছি। আপনারা তো দীনের সাহায্যে সবার আগে এগিয়ে এসেছেন; আর এই ঘটনায় সে আপনাদের সবার আগে এগিয়ে এসেছে। সবার আগে সাড়া দিয়েছে।' এরপর উমর রা. আবু উবায়েদ সাকাফিকে ডেকে ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোদাভীতি, তাকওয়া অবলম্বন এবং সঙ্গী মুসলিম সেনাদের কল্যাণ-কামনার উপদেশ দিয়ে সব কাজে সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করার নির্দেশ দেন। সালিত ইবনু কায়েসের সঙ্গেও পরামর্শ করার কথা বলেন। কারণ, সালিতের রয়েছে যুদ্ধ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা।[৪৭৬]

উমর রা. আবু উবায়েদ রাহ.-কে উপদেশ দিয়ে আরও বলেন, 'রাসুলের সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে। নিজের সব কাজে তাঁদের শরিক রাখবে। কাজের ক্ষেত্রে দ্রুততার আশ্রয় নেবে না; বরং ধৈর্য ও বিচক্ষণতা দ্বারা সব কাজ সমাধা করবে।

---

[৪৭৩] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/২৬।

[৪৭৪] *আল-ফুতুহ*, ইবনু আসাম : ১/১৬৪; *আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি* : ২১৬।

[৪৭৫] *আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি* : ২১৬।

[৪৭৬] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/২৬।

কেননা, এটা যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় ধৈর্যশীল বিচক্ষণ লোকেরা সফল হতে পারে। আমি সালিতকে কেবল এ কারণে আমির বানাইনি যে, সে যুদ্ধের ব্যাপারে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করে থাকে। তীব্র প্রয়োজন দেখা না দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহর শপথ, সে যদি চঞ্চল চিত্তের না হতো, তবে তাঁকেই আমির বানাতাম।'

এরপর তিনি বলেন, 'তুমি এমন এলাকার দিকে যাচ্ছ, যেখানকার মানুষ ধোঁকাবাজ, দাম্ভিক ও অহংকারী। বিশৃঙ্খলা আর মন্দপ্রবণতাও তাদের বেশি। কল্যাণ ও সৎকাজের তারা ধার ধারে না। এ ব্যাপারে তারা ততটা পরিচিতও নয়। সুতরাং তাদের ব্যাপারে চৌকান্না থাকবে। জবান নিয়ন্ত্রণে রাখবে। গোপন ভেদ কারও কাছে প্রকাশ করবে না। কেননা, গোপনীয় বিষয় যতক্ষণ গোপন থাকে, ততক্ষণ নিরাপদ। গোপন ভেদ প্রকাশ হয়ে গেলে অনেক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়।'[৪৭৭]

এরপর তিনি মুসান্না ইবনুল হারিসা রা.-কে ইরাকে যেতে এবং আরও সেনার অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'যে-সকল স্বধর্মত্যাগী সত্যমনে তাওবা করে ইসলামে পুনরায় ফিরে আসবে, তাদের সঙ্গে নেবে। শত্রুর মোকাবিলার সময় তাদেরও সঙ্গে রাখবে।'

মুসান্না রা. তাঁদের সবাইকে নিয়ে দ্রুতবেগে সামনে এগিয়ে হিরা এলাকায় পৌঁছান। এদিকে উমর রা. ইরাক, পারস্য ও সিরিয়া অভিযানে বরাবর দৃষ্টি রেখে চলেছেন। বাহিনীর রসদপত্র পাঠাচ্ছেন। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা ও দীনি বিধানাবলির ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়ে পাঠাচ্ছেন। উদ্ভূত সমস্যার আলোকে পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। সব বিষয়ের পর্যবেক্ষণ ও দায়িত্ব রেখেছেন নিজ হাতে।

বস্তুত মুসলিমদের এই সেনাদল ইরাকের উদ্দেশে যাত্রা করে। তাঁদের সংখ্যা ৭ হাজার। খলিফা উমর রা. আবু উবায়েদকে লেখেন, 'খালিদের সঙ্গে ইরাক থেকে যে-সকল সেনা এসেছে, তাদের যেন পুনরায় ইরাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' তিনি ৪ হাজার সেনার একটা বাহিনী প্রস্তুত করলেন। হাশিম ইবনু উতবাকে নেতা মনোনীত করে তাঁর তত্ত্বাবধানে ওই বাহিনী ইরাকে পাঠান।

মুসলিমদের এই বিশাল কাফেলা যখন ইরাকে সমবেত হয়, তখন তাঁরা জানতে পারেন যে, পারস্য সাম্রাজ্যে বড় ধরনের বিরোধ-বিশৃঙ্খলা চলছে। পারসিকরা তখন তাদের রাজা-রানি মনোনয়ন ও অপসারণ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অবশেষে রানি আজার মিদাখতকে হত্যা করে কিসরার মেয়ে বুরানকে তারা ক্ষমতায় বসায়। রানি বুরান রুস্তম ইবনু ফারাখজাদ নামের এক সাহসী বীরযোদ্ধার কাছে ১০ বছরের জন্য রাজত্ব হস্তান্তর করে এই শর্তে যে, সে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। এরপর রাজত্ব ফিরে আসবে কিসরার বংশধরদের কাছে।

---

[৪৭৭] *ইতমামুল ওয়াফা ফি সিরাতিল খুলাফা* : ৬৫।

রুস্তম তা মেনে নেয়। এই রুস্তম ছিল জ্যোতির্বিদ। জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে তার ছিল পর্যাপ্ত জ্ঞান। একদিন তাকে বলা হয়েছিল, 'আপনি জানতেন যে, এই রাজত্ব আর পূর্ণতা পাবে না, স্থায়ী হবে না; তবু এটা গ্রহণে কীসে আপনাকে উৎসাহিত করল?' সে বলল, 'লোভ-লালসা আর মর্যাদালাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাকে উৎসাহিত করেছে।'[৪৭৮]

২. নামারিক, সাকাতিয়া ও বারুসমাযুদ্ধ

ক. ১৩ হিজরির নামারিকের যুদ্ধ

আবু উবায়েদ সাকাফি রাহ. ইরাক পৌঁছে সেখানকার সেনাপতির দায়িত্ব হাতে নেওয়ার পর এই যুদ্ধ সামনে আসে। প্রকৃতপক্ষে পারসিকদের উদ্দেশ্য ছিল এ যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী—অর্থাৎ, আবু উবায়েদ সাকাফিকে মানসিকভাবে দুর্বল করে রাখা; আর ইরাকবাসীর মনে সাহস জোগানো। বিজয়ের জন্য তাদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। রুস্তম প্রথমেই রাজ্যের প্রতিটা জেলায় সরকারি দূত পাঠিয়ে লোকদের মধ্যে জাতীয়তা ও ধর্মীয় অনুভূতির নামে মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেয়, যাতে মুসলিম সেনাপতি পৌঁছার আগেই ফুরাতের সব জেলায় বিদ্রোহের আগুন দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে। মুসলিমদের তারা সামন-পেছন সব দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। বিদ্রোহের ফলে মুসলিমদের অধিকৃত এলাকাগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। তাদের সেনাপতি জাবানকে ফুরাত তীরবর্তী এলাকায় আর নারসিকে কাসকার পৌঁছার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইরাকের একটা বিস্তীর্ণ এলাকায় তার জায়গির ছিল। এই দুই পারসিক সেনাপতি দুই দিক দিয়ে এগোতে থাকে।

অন্যদিকে আবু উবায়েদ ও মুসান্না রা. হিরা পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন; কিন্তু প্রতিপক্ষের বিরাট প্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে খাকান নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। আবু উবায়েদ মুজাহিদদের ভালোভাবে সজ্জিত করে আক্রমণের জন্য তিনি নিজেই শত্রুদের দিকে অগ্রসর হন। নামারিকে উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। আল্লাহ পারসিকদের পরাজিত করেন। জাবান ও তাদের সেনাদলের ডান বাহুর নেতা মারদানশাহ তখন মুসলিমদের হাতে বন্দি হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই উভয় সেনাপতি মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অনল ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৪৭৯] জাবানকে গ্রেপ্তার করেন মুতার ইবনু ফিজ্জাহ তামিমি। তিনি জানতেন না যে, তাঁর বন্দি লোকটা সেনাপতি জাবান। গ্রেপ্তার

---

[৪৭৮] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/২৭।

[৪৭৯] *হারকাতুল ফাতহিল ইসলামি* : ৭২।

হয়ে জাবান প্রতারণার আশ্রয় নেয়। সে বলে, 'আমার থেকে কিছু নিয়ে আমাকে ছেড়ে দাও।' অন্য মুসলিমরা তাকে আটক করে রাখেন। তাঁরা বলেন, 'এ-ই যে প্রধান সেনাপতি!' তাঁরা তাকে নিয়ে সর্বাধিনায়ক আবু উবায়েদের কাছে এসে বলেন, 'জাবানকে হত্যা করুন। কারণ, সে শত্রু-সৈন্যের প্রধান ব্যক্তি।' তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি। তাকে আমরা কীভাবে হত্যা করব? অথচ আমাদেরই আরেক মুসলমান তাকে নিরাপত্তা দিয়েছে! মুসলিমরা পারস্পরিক সাহায্য ও হৃদ্যতার ক্ষেত্রে একটা দেহের মতো। যে দায়িত্ব একজন মুসলমান বহন করে, সেটা সকল মুসলিমের দায়িত্ব।' তাঁরা তাঁকে বলেছিলেন, 'জাবানকে হত্যা করুন। কারণ, সে শত্রু-সৈন্যের প্রধান ব্যক্তি।' উত্তরে আবু উবায়েদ বলেছিলেন, 'সে যদি সেনাপ্রধানও হয়, তবু আমি তাকে হত্যা করব না।' এরপর তিনি তাকে ছেড়ে দেন।[৪৮০]

এ ঘটনায় আবু উবায়েদ সাকাফির অবস্থান মুসলিমদের ক্ষমা করার মানসিকতা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিশ্চয় লোকদের মুসলিম বানানো এবং ইসলামের দিকে আকর্ষণবোধ জাগানোর ক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিল সুমহান। এরপর যেখানেই এ ঘটনা চর্চা হয় যে, মুসলিমরা ইরানি বাহিনীর সেনাপ্রধানকে শুধু এ জন্য মুক্তি দিয়েছে যে, মুসলিমদের নগণ্য-সাধারণ একব্যক্তি তাকে ফিদয়া নিয়ে মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এসব যখন ইরানিরা শুনছিল, ইসলাম আর তাদের মধ্যে যে যোজন যোজন দূরত্ব ছিল, তা কমতে শুরু করেছিল। সবাই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিতে ব্যাকুল হতে শুরু করেছিল। এটি মূলত ইসলামেরই মাহাত্ম্য যে, তা এমন কিছু মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে আমরা মুসান্না ইবনুল হারিসার গৌরবময় ভূমিকাও কিছুতেই ভুলতে পারি না। তিনি নিজেকে আবু উবায়েদের অনুগত করে দেন; অথচ তিনি হচ্ছেন ইরাকের প্রাক্তন সেনাপতি। আর আবু উবায়েদ প্রথমবারের মতো এখানে এসেছেন। এই আনুগত্যের রহস্য হচ্ছে, আমিরুল মুমিনিন আবু উবায়েদকে আমির বানিয়ে পাঠিয়েছেন। এ এক ঈর্ষণীয় ব্যাপার। মুসান্না রা. স্বভাবগতভাবেই এমন চারিত্রিক উৎকর্ষের অধিকারী। ইতিপূর্বে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সঙ্গেও তিনি এমন আচরণ করেন। ইসলামের জন্য তাঁর ভালোবাসা ও আত্মোৎসর্গী মনোভাবের কোনো তুলনা হতে পারে না। তিনি সেনাপতি হন বা সাধারণ সেনা, সর্বাবস্থায় নিজের অনন্য চরিত্র মাধুরীর স্ফুরণ দেখিয়ে গেছেন।[৪৮১]

খ. ইয়াওমুল আগওয়াস

কাদিসিয়াযুদ্ধের দ্বিতীয় দিনকে বলা হয় ইয়াওমুল আগওয়াস। এ দিন রাতে কা'কা

---

[৪৮০] *আল-কামিল ফিত তারিখ* : ২/৮৭।

[৪৮১] *আত-তারিখুল ইসলামি* : ১০/৩৩৪।

ইবনু আমর তামিমির নেতৃত্বে সিরিয়াবাহিনীর একটা বহর কাদিসিয়া পৌঁছায়, যার বিবরণ হচ্ছে এমন—

আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাব রা. সিরিয়ার আমির আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে নির্দেশ দেন, 'খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সঙ্গে ইরাকের যে বাহিনী সিরিয়া গিয়েছিল, সেটা কাদিসিয়াযুদ্ধে মুসলিমদের সাহায্যে পাঠানো হোক।'

আবু উবায়দা উমরের নির্দেশমতো খালিদের সঙ্গে আসা বাহিনীকে ফেরত পাঠিয়ে তাঁকে নিজের কাছে রেখে দেন, যাতে প্রয়োজনের সময় তাঁর সহযোগিতা নেওয়া যায়। কাদিসিয়ার উদ্দেশে পাঠানো বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেন সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের ভাতিজা হাশিম ইবনু উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাসকে। ইরাকি এই বাহিনী যখন খালিদের নেতৃত্বে ইরাক থেকে সিরিয়া আসে, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার; কিন্তু ফেরার সময় সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ হাজার। তন্মধ্যে হাশিম ইবনু উতবা রা. ১ হাজার মুজাহিদের একটা বহর অগ্রবর্তী বাহিনী হিসেবে কা'কা ইবনু আমরের নেতৃত্বে কাদিসিয়ায় রওনা করান।[৪৮২]

গ. কা'কা ইবনু আমরের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা

কা'কা রা. তাঁর অগ্রবর্তী বাহিনী নিয়ে দ্রুতবেগে ইয়াওমুল আগওয়াসের ভোরে কাদিসিয়া পৌঁছে মুসলিমবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। তিনি মুসলিম সেনাদের হৃদয় থেকে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক দূর করে তাঁদের মধ্যে সাহস সঞ্চারের চেষ্টা করেন। কৌশল হিসেবে তাঁর সঙ্গে থাকা সেনাদের ১০০ জনকে আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলকে তাকবিরধ্বনি দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে প্রবেশের নির্দেশ দেন। বলেন, '১০ জন ১০ জন করে একেকটা দল একের পর এক তাকবির দিয়ে প্রবেশ করবে।' অর্থাৎ, এক দল চোখের আড়ালে চলে গেলে অপর দল সামনে এগোবে। সেনারা তাঁর নির্দেশনা অনুযায়ী ১০০ জনের প্রত্যেক দল ১০ জন করে তাকবির দিয়ে ময়দানে প্রবেশ করে। তাঁদের তাকবিরধ্বনি শুনে অন্যান্য সেনাও তাকবির দিতে শুরু করে। এতে মুসলমান সেনাদের মনে শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পায় এবং পারস্যবাহিনী হীনবল হয়ে পড়ে।

১ হাজার সেনার এই বাহিনীর আগমন তেমন বিশেষ কিছু ছিল না; কিন্তু এটা আল্লাহর বহু বড় এক অনুগ্রহ যে, কা'কার এমন অভিনব কৌশলে সবার মন থেকে সংখ্যার স্বল্পতার বিষয়টা একেবারেই দূরীভূত হয়ে যায়। কা'কা সহযোগী বাহিনীর আগমনের সুসংবাদ শুনিয়ে বলেন, 'হে লোকসকল, আমি এমন প্রাণোৎসর্গী বাহিনী নিয়ে আসছি, তারা যদি তোমাদের পর্যন্ত এসে পৌঁছায়, তবে অল্পসংখ্যক হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের হীনম্মন্যতার

---

[৪৮২] *তারিখুত তাবারি* : ৪/৩৬৭; *আত-তারিখুল ইসলামি* : ১০/৩৬৭।

বিষয়টা যদি তারা জানতে পারে, তাহলে তাদের একেবারে দুর্বল সদস্যও তোমাদের আগে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইবে। তারা চাইবে, তোমাদের ওপর যেন মর্যাদার শীর্ষস্থান অর্জন করতে পারে। তোমরা আমাকে যেমন করতে দেখছ, তেমনই করো।'

এরপর কা'কা কাতার থেকে সামনে এসে বলেন, 'হে পারস্যবাহিনী, তোমাদের কে আছে, যে আমার সঙ্গে লাড়াই করবে?' এ কথা শুনে সেনাপতি জুলহাজিব বাহমন জাদবিয়া এগিয়ে এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কে?' উত্তরে সে বলে, 'আমি বাহমন জাদবিয়া।' এটুকু শুনতেই কা'কার মানসপটে জেগে ওঠে জিসরযুদ্ধে তার কারণে মুসলিমদের দুর্ভোগের কথা। ইমানি চেতনায় উদ্‌বেলিত হয়ে তিনি বলেন, 'হে আবু উবায়েদের হত্যাকারী ও জিসরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী, আমি তোর থেকে প্রতিশোধ নেবই!'

প্রতিপক্ষ লোকটা যদিও বিখ্যাত এক পারসিক সেনা-অধিনায়ক, তথাপি কা'কার প্রভাবপ্লাবী গর্জনে তার মনে ভীতির সঞ্চার হয়। খলিফা আবু বকর কা'কা সম্পর্কে বলতেন, 'কা'কার একটা গর্জনই ১ হাজার সেনাকে কুপোকাত করে দেওয়ার শক্তি রাখে।'[৪৮৩] তবে একজন লোক, সে যত বড় বীরই হোক না কেন, কী করে তাঁর সামনে অটল থাকতে পারে? অনতিবিলম্বে দু-জনে যুদ্ধে লিপ্ত হন। কা'কা নিমিষেই তাকে খতম করে দেন। ফলে পারস্যবাহিনীর মনোবল ক্রমশ ভেঙে যেতে থাকে; আর মুসলিমদের মনোবল প্রত্যয়দীপ্ত হতে থাকে। কেননা, জুলহাজিব ছিল পারস্যবাহিনীর ২০ হাজার সেনার অধিনায়ক।

কা'কা আবার বলেন, 'কে আছে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে?' তখন পারস্য-সেনাপতি বিরজান ও বান্দুওয়ান ছুটে আসে। এ দৃশ্য দেখে মুসলিম সেনা হারিস ইবনু জুবইয়ান সামনে অগ্রসর হন। কা'কা বিরজানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিমিষেই তার দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অনুরূপ হারিসও বান্দুয়ানের দেহ থেকে মস্তক আলাদা করে দেন। এভাবে কা'কা ভোরেই পারসিকদের পাঁচ অধিনায়কের দুজনকে খতম করে দেন। নিঃসন্দেহে পারস্যবাহিনীর জন্য এটা ছিল এক মস্তবড় ক্ষতি। এতে তারা হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। মনোবল হারিয়ে পেছনে হটতে থাকে। পরে উভয় পক্ষের অশ্বারোহীদের মধ্যে যথারীতি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

কা'কা তখন বলা শুরু করেন, 'হে মুসলিমরা, তোমরা তরবারি দিয়ে তাদের মোকাবিলা করো। কেননা, লোকদের হত্যা করতেই এটা তৈরি করা হয়েছে।' এরপর লোকেরা তাঁর উপদেশ গ্রহণ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কা'কা সেদিন ৩০ জন সেনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য ডেকে তাদের সবাইকে হত্যা করতে সক্ষম হন। যেখানেই শত্রুদের দেখা যেত, সেখানেই প্রবল আক্রমণে হামলে পড়তেন তিনি; আর কার্যসিদ্ধির পর এই কবিতা আবৃত্তি করতেন,

---

৪৮৩ *আত-তারিখুল ইসলামি* : ১০/৪৫৫।

এই যুদ্ধে আমি তাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব এবং নির্ভুল নিশানায় বর্শার বৃষ্টি নিক্ষেপ করব।

শত্রুদের শেষ ব্যক্তি বাজার জামহার হামজানিকে হত্যা করা হলে তার ব্যাপারে তিনি আবৃত্তি করেন,

আমি পূর্ণ উদ্যম ও শক্তিব্যয়ে তাকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দিয়েছি এবং সূর্যের কিরণের মতো তার রক্ত ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে—

ইয়াওমুল আগওয়াসের সময়—যখন পারসিকদের রাত তাদের মধ্যে ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে এসেছিল।

ছয়. শাম বিজয়

১. শামে খলিফা উমরের প্রথম চিঠি

শামে পাঠানো উমর ইবনুল খাত্তাবের প্রথম চিঠিটা ছিল আবু বকর সিদ্দিকের ইনতিকাল এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে সেখানকার সেনাপতি নিযুক্তির সংবাদ-সংক্রান্ত। চিঠির ভাষ্য ছিল এমন :

হামদ ও সালাতের পর,

প্রকাশ থাকে যে, রাসুলের খলিফা আবু বকর সিদ্দিক দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষুক। তিনি ছিলেন সত্যভাষী, ন্যায়ের পথে নির্দেশদাতা, সত্যপরায়ণ, ধৈর্যশীল, কোমল ও শান্ত স্বভাবের লোক। আমি আমার মুসলিমদের এই বিপদে আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদানের প্রত্যাশী। তাকওয়া দ্বারা গুনাহ ও মন্দকাজ পরিহার করে তাঁর রহমত পাওয়ার উপযোগী হওয়া আমার কামনা। যতদিন বেঁচে থাকব, তাঁর আনুগত্য করে যাব। মৃত্যুর পর জান্নাতে যাব। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

আমি জানতে পেরেছি, তোমরা দামেশক অবরোধ করেছ। আমি তোমাকে সেনাদের সর্বাধিনায়ক মনোনীত করলাম। তুমি হিমস ও দামেশকের পাশাপাশি সিরিয়ার অন্যান্য অঞ্চলে মুজাহিদবাহিনী ছড়িয়ে দাও। তবে এ ব্যাপারে নিজের ও অন্যান্য মুসলিমের কাছ থেকে পরামর্শ নেবে। কেবল আমার এই চিঠি পেয়েই নিজের বাহিনীকে শঙ্কার মুখে ফেলো না; শত্রু যাতে তোমাদের কোনো ক্ষতিসাধনের সাহস না পায়। তোমার কাছে অতিরিক্ত

যে-সকল লোক আছে, তাদের আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে; আর অবরোধের জন্য যাদের তোমার প্রয়োজন, তাদের রেখে দেবে। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে তোমার কাছে রাখবে। কেননা, সে ছাড়া তোমার কাজ চলতে পারে না।[৪৮৪]

চিঠি পাওয়ার পর আবু উবায়দা রা. মুআজ ইবনু জাবালকে ডেকে সেটা পড়ে শোনান। উমরের দূত মৌখিকভাবে এ কথাও বলেন, 'হে আবু উবায়দা, ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান ও আমর ইবনুল আস সম্পর্কে আমাকে জানানোর জন্য উমর আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা উভয়ে কেমন আছেন, কোথায় আছেন, মুসলিমদের সঙ্গো তাঁরা কীরূপ আচরণ করছেন?'

২. খলিফা উমরের কাছে যৌথ জবাবি চিঠি

আবু উবায়দা রা. উমরের দূতের কাছে তাঁর ও মুআজ ইবনু জাবালের পক্ষ থেকে যৌথ জবাবি চিঠি লেখেন। চিঠির ভাষ্য,

আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও মুআজ ইবনু জাবালের পক্ষ থেকে উমর ইবনুল খাত্তাবের নামে।

আসসালামু আলাইকুম।

আমরা এক আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। পরসমাচার,

আমরা দেখছি, (খিলাফতের আগে) আপনি আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতেন। উমর, আপনি সাদাকালো সকল মুসলিমের দায়িত্বশীল। আপনার কাছে শত্রু-মিত্র, ছোট-বড়, দুর্বল-সবল সবাই আসে। আপনার ওপর সবার একটা অধিকার রয়েছে। সেটা হচ্ছে, সবাই যেন আপনার থেকে ইনসাফ পায়। সুতরাং তাদের সঙ্গো কীরূপ আচরণ করছেন, সেটা দেখার বিষয়। উমর, আপনাকে আমরা সে দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যে দিন সব রহস্যের উন্মোচন হবে। গোপন বিষয় প্রকাশ হয়ে যাবে। অন্তরের গোপন বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে। সবার চেহারা আল্লাহর সামনে ঝুঁকে থাকবে। নিজ মহত্ত্ব ও প্রভাব প্রকাশ পাবে সবার ওপর। সব মানুষ তাঁর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাঁর বিচারের অপেক্ষা করবে। শাস্তির ভয়ে কম্পিত থাকবে। রহমতের আশা করবে।

আমার কাছে এ কথা পৌঁছেছে যে, এই উম্মতে এমন লোক থাকবে, যারা

---

৪৮৪ *তারিখু দিমাশক* : ২/১২৫।

বাহ্যত বন্ধু হবে আর ভেতরে হবে শত্রু। এই মন্দপ্রবণতা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থনা করছি। আপনি আমাদের এই চিঠি দ্বারা ভুল বুঝবেন না।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।[৪৮৫]

৩. খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আবু উবায়দার মধ্যে কথোপথন

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর অপসারণের সংবাদ পেয়ে আবু উবায়দার কাছে এসে বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আমিরুল মুমিনিনের পক্ষ থেকে আপনার নেতৃত্বের মনোনয়ন-সংক্রান্ত চিঠি যখন আসে, তখন কেন আপনি সেটা আমাকে বললেন না? আমার পেছনেই সালাত পড়ে যাচ্ছেন; অথচ দায়িত্বটা আপনার।'

আবু উবায়দা জবাব দেন, 'আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন। ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টা আপনার কর্ণগোচর করতে চাইনি, যতক্ষণ অন্য কেউ আপনাকে তা না জানায়। আপনার হাতে যুদ্ধবিজয়ের যে ধারাবাহিকতা চলমান, তা গন্তব্যে পৌঁছার আগে আমি এখানে হস্তক্ষেপ করতে চাইনি। পরে অবশ্য আপনাকে জানাতাম। আমি জাগতিক নেতৃত্ব চাই না; আর না আমি দুনিয়ার জন্য এসব করছি। যা কিছু আপনি দেখছেন, সবই নশ্বর; ফুরিয়ে যাবে। আমরা সবাই পরস্পর ভাই। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। একজন মানুষের জন্য এতে ক্ষতির কিছুই নেই যে, তার ভাই দীন ও দুনিয়ায় তার কাছে থাকবে। প্রত্যেক শাসক ভালো করে জানে, দীন-দুনিয়া উভয় ক্ষেত্রে সে ফিতনার খুবই নিকটবর্তী। অধিক পরিমাণে ত্রুটিবিচ্যুতির মুখে পড়তে হয় তাকে। এই বিপদ থেকে সে-ই রক্ষা পায়, যাকে আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা রক্ষা করেন—এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।'

এরপর তিনি উমরের চিঠিটা খালিদের হাতে দেন।[৪৮৬]

৪. উমরের পক্ষ থেকে আবু উবায়দা ও মুআজের নামে চিঠি

হাসসান ইবনু সাবিত আনসারির ভাতিজা শাদ্দাদ ইবনু আওস ইবনু সাবিত যখন আবু উবায়দা ও মুআজের পাঠানো যৌথ চিঠি উমরের হাতে তুলে দেন, তখন তিনি সেটা পড়ে এভাবে জবাব দেন,

আমি সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি একমাত্র উপাস্য। আমি আপনাদের উভয়কেই আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। তাঁর ভীতিই হচ্ছে এমন গুণ,

---

৪৮৫ *ফুতুহাতুশ শাম* : ৯৯-১০২; *আত-তারিখুল ইসলামি* : ৯/২৭৪।

৪৮৬ *তারিখু দিমাশক* : ২/১২৬।

যা দ্বারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। তাতেই রয়েছে সবার সৌভাগ্য। চিন্তাশীলরা নিজের পরম ধন মনে করেন একে। চিঠি পেয়েছি। আপনারা লিখেছেন, 'খিলাফতলাভের আগে আত্মশুদ্ধির প্রতি আমার খুবই খেয়াল ছিল।' আপনারা কী করে জানলেন তা? আপনাদের লেখায় প্রশংসার গন্ধ রয়েছে। আরও লিখেছেন, 'আমি মুসলিমদের প্রধান শাসনকর্তা বনে গেছি; আর ছোট-বড়, শত্রু-মিত্র, সবল-দুর্বল সবাই আমার সামনে অবনত; আর সবার জন্যই আমার ইনসাফের মানদণ্ডে অংশ রয়েছে।' আপনারা আরও লিখেছেন, 'লক্ষ থাকে যেন হে উমর, ইনসাফের মুহূর্তে আপনি তাদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করছেন, রাত ও দিনের আবর্তন সে দিনকে বাস্তবায়িত করবেই। এ আবর্তন সব নতুনকে পুরাতন, দূরকে কাছে এবং সব প্রতিশ্রুত বস্তুকে সামনে হাজির করবে। যার ফলে একদিন কিয়ামত এসে উপস্থিত হবে; আর সব গোপন বস্তু প্রকাশ হয়ে যাবে। সে দিন গোপন পাপাচার প্রকাশ করে দেওয়া হবে। তখন মহামহিম বিচারকের প্রতাপের সামনে অবনত ও লজ্জিত হবে সব চেহারা। মানুষ অসহায় হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে শাস্তির ভীতি ও অনুগ্রহের আশা নিয়ে বিচারের অপেক্ষায় থাকবে।' আরও লিখেছেন, 'আমরা শুনেছি এ জাতিতে এমন লোক হবে, যারা বাহ্যত বন্ধু আর প্রকৃতপক্ষে দুশমন হবে।' (আমার মনে হয়) এখনো সে মুহূর্ত আসেনি। এই মুনাফিকি কিয়ামতের আগে আগে প্রকাশ পাবে, যখন জাগতিক ক্ষতির ভয় অথবা লাভের আশায় মানুষ উন্মত্ত হয়ে পড়বে।

নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে আপনাদের শাসক বানিয়েছেন। এই দায়িত্ব পালনে সবসময় তাঁর সাহায্য কামনা করি। দুআ করি, তিনি যেভাবে আমাকে অন্যান্য ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে হিফাজত করেছেন, এ ক্ষেত্রেও এসব থেকে রক্ষা করবেন। আমি একজন মুসলিম। আল্লাহর একজন দুর্বল বান্দা। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। খিলাফতের ব্যস্ততা ইনশাআল্লাহ আমার চরিত্রস্খলনের কারণ হবে না। মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবলই আল্লাহর। বান্দার এতে কোনো অংশ নেই। এটা বলবেন না যে, উমর শাসনক্ষমতা সামলাতে গিয়ে তার চরিত্র ও অভ্যাস পালটে ফেলেছে। সত্য ও অধিকার সম্পর্কে আমি অবগত। এ জন্যই লড়াই করি এবং আপনাদের কাছে সব বিষয়ে পরামর্শ চাই। যার কোনোকিছুর প্রয়োজন দেখা দেয় বা যে কোনো ধরনের অন্যায়ের শিকার হয়, সে ব্যাপারে আমার সাধারণ ঘোষণা দেওয়া আছে। এ ব্যাপারে আমার ও কোনো মুসলিমের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

আপনাদের সংশোধনীমূলক সতর্কীকরণ আমার ভালো লেগেছে। আমি আমার আমানত ও দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নশীল। ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কেও সম্যক অবগত। এসব আমি অন্য কাউকে অর্পণ করব না। এ ব্যাপারে বিশ্বাসী ও শুভাকাঙ্ক্ষী লোক দরকার। এমন লোকই আমি মনোনীত করছি। তাদের দায়িত্ব দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, তাদের ছাড়া অন্যদের কখনো উপদেষ্টা বা দায়িত্বশীল বানাব না। বাকি, আপনারা দুনিয়াবি ক্ষমতা ও সালতানাতের কথা উল্লেখ করেছেন; সত্য বলেছেন। জগতের সবকিছুই ক্ষয়িষ্ণু। আমরা সবাই ভাই ভাই। আমাদের একজন আরেকজনের ওপর শাসক বা আমির হলে সেটা একে অন্যের দীন-দুনিয়ার ক্ষতির কারণ হতে পারে না; বরং শাসকই দীন-দুনিয়ার ফিতনার নিকটবর্তী ও ধ্বংসের প্রান্তসীমায় থাকে। কেবল সে-ই মুক্তি পেতে পারে, যাকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করেন—এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম।[৪৮৭]

সাত. দামেশক বিজয়

আবু বকর সিদ্দিকের খিলাফতের পর উমর ফারুকের খিলাফতকালে সিরিয়ায় যেসব সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়, সেগুলোকে সিরিয়া বিজয়ের দ্বিতীয় ধাপ বলা যায়। আবু উবায়দা সেনাবাহিনী নিয়ে ইয়ারমুক থেকে যাত্রা করেন। সেখানে তিনি বাশির ইবনু কাআবকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োজিত করেন। তখন তাঁর কাছে সংবাদ আসে, তাঁর সাহায্যে হিমস থেকে অতিরিক্ত সেনাবাহিনী আসছে। এই সংবাদও আসে, জর্দানের ফিহলে রোমানরা বিশাল সেনাবহর সমবেত করেছে। তিনি একটু দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে, প্রথমে কোন কাজটা করবেন। ফলে এ বিষয়ে পরামর্শ চেয়ে খলিফা উমরের কাছে চিঠি পাঠালেন। উত্তর আসে, তিনি যেন প্রথমে দামেশকে অভিযান পরিচালনা করেন। কারণ, দামেশক হলো সিরিয়ার দুর্গ ও রাজধানী।

খলিফা লিখলেন, 'দামেশকের জন্য প্রস্তুত হন; আর একদল অশ্বারোহী ফিহল অভিমুখে পাঠিয়ে রোমানদের বাধা দেন। দামেশক বিজয়ের আগে যদি ওই অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে আল্লাহ ফিহলের বিজয় দান করেন, তবে সেটা তো আমাদের কাম্যই; আর ফিহল বিজয়ের আগে যদি আপনি দামেশক জয় করতে পারেন, তাহলে সেখানে কাউকে আপনার স্থলাভিষিক্ত করে সেনাসামন্তসহ ফিহল অভিমুখে যাত্রা করবেন। ফিহল জয়ের পর আপনি ও খালিদ দু-জনেই হিমস অভিমুখে যাত্রা করবেন। প্রত্যেক অঞ্চলের সেনাপতিকে (সেখান দিয়ে অতিক্রমকারী) অন্য বাহিনীর সেনাপতি গণ্য করা

---

৪৮৭ *ফুতুহাতুশ শাম* : ৯৯-১০২

হবে, যতক্ষণ-না তারা সেই অঞ্চলগুলো ছেড়ে চলে যাবে।'[৪৮৮]

সেনাপতিদের নামে উমরের পক্ষ থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়, তাতে আমরা দেখছি, তিনি সেনাকার্যক্রম পরিচালনায় নেতাদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। এরই আলোকে শুরু হয় সামরিক তৎপরতা, যাতে করে যে লক্ষ্যে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাতে কোনো বিচ্যুতি দেখা না দেয়।

চিঠিগুলোতে ফারুকি শিক্ষা দ্বারা আমরা এটা অনুমান করতে পারি যে, তাঁর সামনে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—প্রথম উদ্দেশ্য দামেশক নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ফিহল বিজয়, তৃতীয় নিশানা ছিল হিমস। উমরের উপর্যুক্ত নির্দেশনার আলোকে আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ ফিহলের দিকে সেনাবহর পাঠান। আবুল আওয়ার আস-সুলামি, আমির ইবনু হাসমা, আমর ইবনু কুলাইব, আবদি আমর ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আমির, আম্মারা ইবনু সাআক ইবনু কাহাব, সাফি ইবনু উলাইয়া ইবনু শামিল, উমর ইবনু হাবিব ইবনু উমর, লাবিদা ইবনু আমির, বাশির ইবনু আসমা ও আম্মারা ইবনু মুখাশশিন—এঁদের পৃথক পৃথক দলের নেতৃত্ব অর্পণ করেন। সবার সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন আম্মারা ইবনু মুখাশশিনকে, যাঁর নেতৃত্বে ফিহলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু হয়।[৪৮৯]

আবু উবায়দা নিজে মুসলিমবাহিনী নিয়ে দামেশকের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে কোনো প্রকার সংঘর্ষ হয়নি। কেননা, রোমানরা ইতিপূর্বে মুসলিমদের অগ্রযাত্রায় বাধা দেওয়া এবং তাদের কার্যক্রম রুখে দেওয়ার ব্যাপারে দামেশক ও তার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের ওপর ভরসা করে রেখেছিল; কিন্তু তাদের মন্দ আচরণ বিশেষ করে ছোট ছোট গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণের কারণে রোমানরা মুসলিমবাহিনীর আক্রমণের শিকার হলে প্রতিরোধব্যবস্থায় তারা কোনো সাড়াই দেয়নি বললে চলে।[৪৯০] মুসলিমবাহিনী দামেশকের ওই স্থানে প্রবেশ করে, যেখানে রোমানদের প্রাসাদ ও সুদৃশ্য ঘরবাড়ি রয়েছে। তারা সেখানে পৌঁছে দেখে, সেখানকার বাড়িঘর শূন্য পড়ে আছে। অধিবাসীরা পালিয়ে দামেশকে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যদিকে হিরাক্লিয়াস দামেশকের অধিবাসীদের সাহায্যে ৫০০ যোদ্ধা পাঠায়, যারা এই দুর্দশা লাঘবে ও দামেশকবাসীর প্রয়োজন পূরণে মোটেই যথেষ্ট ছিল না।[৪৯১] অথচ এর বিপরীতে আবু উবায়দার অবস্থা ছিল একেবারে অন্যরকম। তাঁর নেতৃত্বে ইতিমধ্যে দামেশকের

---

৪৮৮ *তাহজিব ওয়া তারতিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৫২; *আদ-দাওয়াতুল ইসলামিয়া ফি আহদি আমিরিল মুমিনিন উমর ইবনিল খাত্তাব* : ২৭৬।

৪৮৯ *আল-আমলিয়াতুত তায়াররুজিয়া* : ১৮২।

৪৯০ *আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া ফিল ফুতুহাতিল ইসলামিয়া* : ১৮৮।

৪৯১ *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/২০; *আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া* : ১৮৮।

উত্তরাঞ্চলে দামেশক ও হিমসের বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। দুটো বাহিনীর সঙ্গেই তিনি ঘোরতর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়েছেন এবং তাদের পরাজিতও করেছেন।[৪৯২]

দামেশকের অধিবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি ও আপ্রাণ চেষ্টার পাশাপাশি তাদের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে সাহায্য চেয়ে লোক পাঠিয়েছে। সম্রাট চিঠির মাধ্যমে তাদের অবিচল থেকে মোকাবিলার নির্দেশ দেয়। এতে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। মুসলিমবাহিনীর অগ্রাভিযান ও অবরোধ রুখে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে তারা।

১. রোমানবাহিনী

সর্বাধিনায়ক হিরাক্লিয়াস। দামেশকের প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করে নাসতুরসের ছেলে নুসতাস। দামেশকবাহিনীর জেনারেল কমান্ডার বাহান। সে ইয়ারমুকযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। সেখান থেকে পালিয়ে এখানে আসে। তার আসল নাম ছিল ওরদিয়ান।

দামেশকে ৬০ হাজার রোমান সেনা মজুদ ছিল। হিমস থেকে ২০ হাজার সেনা আসার জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রতিরক্ষা জোরদারের লক্ষ্যে এদের প্রস্তুত করা হয়। এদিকে ৪০ হাজার যোদ্ধা প্রথম থেকেই মোকাবিলার জন্য তৈরি রয়েছে। এভাবে তারা নিজেদের রণকৌশল খুব দক্ষতার সঙ্গে প্রণয়ন করে। রোমানবাহিনী দামেশকেই অবস্থান করছিল। তারা চাচ্ছিল যুদ্ধকালে তারা দামেশকে থেকেই সেখানকার বিশালাকার প্রাসাদ, দুর্গ ও প্রাচীরের নিরাপত্তার সুযোগ নেবে। এ ছাড়া হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে পাঠানো সহযোগী বাহিনীরও তারা অপেক্ষা করছে, যারা এসে যুদ্ধের প্রাথমিক কার্যক্রম সমাধা করতে পারবে।

ফিহলে রোমানবাহিনী পুরোপুরি সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে; আর তাদের সঙ্গে ইয়ারমুকে লড়ে আসা সেনারাও রয়েছে, যাদের মানসিক শক্তি শূন্যের কোঠায়। পালানো ছাড়া তাদের আর কোনো পথ ছিল না। তারা ছিল বেশ ভীতসন্ত্রস্ত।

২. মুসলিমবাহিনী

মুসলিমবাহিনীর সর্বাধিনায়ক উমর ইবনুল খাত্তাব। সিরিয়া রণাঙ্গনের জেনারেল কমান্ডার আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ। তিনি দামেশক থেকে বিসান পর্যন্ত পথের নিয়ন্ত্রণ নিতে ১০টা কমান্ডো পাঠান। তাদের কমান্ডার ছিলেন আবুল আওয়ার আস-সুলামি রা.। বিসান অঞ্চলটাকে অধুনা 'খিরবাতে ফিহল' তথা 'ফিহলের ধ্বংসাবশেষ' বলা হয়।

আবু উবায়দা কয়েকটা সেনাবহর তৈরি করে আলকামা ইবনু হাকিম ও মাসরুকের নেতৃত্বে পৃথকভাবে ফিলিস্তিন পাঠান। সেখানে তাঁদের মোতায়েন করে পশ্চিম ও দক্ষিণ

---

[৪৯২] প্রাগুক্ত : ৭/২০।

প্রান্ত থেকে রোমান আক্রমণের পথ বন্ধ করে দেন।[৪৯৩]

তিনি জুলকিলার নেতৃত্বে দামেশকের উত্তরে আরও একটা সেনাবহর পাঠান। সেখানে তাদের হিমসের সঙ্গে সংযুক্ত সড়কটার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেন, যাতে এই এলাকা শত্রুর আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকে এবং রোমানদের পক্ষ থেকে সহায়ক বাহিনী আসতে না পারে।[৪৯৪]

ইয়ারমুকযুদ্ধের পর মুসলিমবাহিনীর সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে ৪০ হাজার। এটা ছিল একটা সুবিন্যস্ত দল। ইয়ারমুকে বিজয়ের পর তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পায়।[৪৯৫]

এদিকে ২০ হাজার মুজাহিদ দামেশক অবরুদ্ধ করে রেখেছে। বাকি ২০ হাজার সেনাকে পাঠানো হয়েছে ফিহলে। শত্রুরা যাতে এ পথ দিয়ে এগোতে না পারে, সে লক্ষ্যে তাদের পাঠানো হয়। প্রয়োজন দেখা দিলে ফিহল থেকে তাদের দামেশকে আনা যাবে।[৪৯৬]

৩. যুদ্ধযাত্রা

আবু উবায়দা মুসলিমবাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। এরপর দামেশক অভিমুখে যাত্রা করেন। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ছিলেন মূল দলের দায়িত্বে; আর আবু উবায়দা ও আমর ইবনুল আস দু-পাশের দু-দলের দায়িত্বে। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন ইয়াজ ইবনু গানাম। পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন শুরাহবিল ইবনু হাসানা রা.।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দামেশকের প্রাচীরগুলো ছিল অত্যন্ত মজবুত, বড় বড় ফটক লাগানো ছিল তাতে। ফলে না শহরের বাইরের কেউ ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে; আর না ভেতরের কেউ বেরোতে পারছে। এমতাবস্থায় মুসলিমবাহিনী অবরোধশক্তি কাজে লাগায় এভাবে :

> খালিদ রা. পূর্ব দরজায় অবস্থান নেন। আবু উবায়দা থাকেন সুবিশাল জাবিয়া দরজার কাছে। আর আমর ইবনুল আস ও শুরাহবিল ইবনু হাসানা অবস্থান নেন ফারাদিস দরজার কাছে। ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান থাকেন ছোট দরজার কাছে।

রোমানরা ভেবে নিয়েছিল, মুসলিমরা দীর্ঘসময় অবরোধের ধকল সইতে পারবে না। বিশেষ করে শীতের মৌসুমে। কিন্তু দৃঢ়চেতা দীপ্তপ্রত্যয়ী পরীক্ষিত মুসলিমরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। মুসলিম নেতারা দামেশকের

---

[৪৯৩] *আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া* : ১৮৮, ১৮৯।

[৪৯৪] *তারিখুত তাবারি* : ৪/২৫৮; *আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া* : ১৮৯।

[৪৯৫] *আল-ইয়ারমুক ওয়া তাহরিরু দিয়ারিশ শাম*, শাকির মাহমুদ : ১০৩।

[৪৯৬] *আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া* : ১৮৯।

পরিত্যক্ত গির্জা ও শূন্য বাড়িগুলো বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করেন। সপ্তাহব্যাপী রুটিন অনুযায়ী ক্যাম্পে যারা আসত, তারা বিশ্রাম নিত। তারা চলে গেলে অন্য সেনারা এসে বিশ্রাম নিত। এদিকে ফটকে দায়িত্বরত সেনাদের সাহায্যে তাদের পেছনে অন্য মুসলিম সেনারাও নিয়োজিত ছিল। এভাবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর অবরোধে মুসলিমরা অধিকতর সাহসী ও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। একসময় তাঁদের জন্য এটা সহজ হয়ে ওঠে।[৪৯৭] তবে মুসলিমরা এতে ক্ষান্ত হন না; বরং শত্রুশিবিরের সুশৃঙ্খল অবস্থানে আঘাত হানতে মাঠ পর্যবেক্ষণ ও রণকৌশল প্রণয়ন করে যান। এ সময়ে সে সুযোগটা পেয়ে যান খালিদ রা.। যেখান দিয়ে দামেশকে প্রবেশ করা সম্ভব, সেটা ছিল দামেশকের বিশাল এক মাঠ। সেখানে পানিপ্রবাহ ছিল খুব বেশি; আর সেখান দিয়ে প্রবেশ করাও ছিল বেশ দুষ্কর।[৪৯৮]

তিনি দামেশকে প্রবেশের কৌশল খুঁজতে লাগলেন। ওই সময়েই একরাতে তাদের এক সেনাপতির একটা ছেলে জন্ম নেয়। রাতে সে এই উপলক্ষ্যে ভোজের আয়োজন করে। সবাই ইচ্ছামতো ভূরিভোজনের পর মদপান করে। রাতে তারা তার বাড়িতেই অবস্থান করে। অতিরিক্ত খাবারদাবার, পানাহার ও ক্লান্তিতে তারা সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের পাহারার স্থান এবং নির্ধারিত দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে নাক ডেকে ঘুমাতে থাকে। সেনাপতি খালিদ তা উপলব্ধি করেছিলেন। কারণ, তিনি নিজেও ঘুমাতেন না, তাঁর অধীন অন্য কাউকেও ঘুমাতে দিতেন না; বরং দিনরাত সর্বক্ষণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শত্রুবাহিনীর গতিবিধি লক্ষ করতেন। তা ছাড়া তাঁর কিছু গুপ্তচর ও গোয়েন্দা ছিল, যারা সকাল-সন্ধ্যা যুদ্ধের পরিস্থিতি জানাত তাঁকে।

খালিদ ওই রাতে দুর্গের ভেতর আগুনের শিখা লক্ষ করেন। দেখেন, প্রাচীরের উপর কেউ পাহারা দিচ্ছে না। তখন তিনি রশি দিয়ে মই বানান। তারপর নিজে এবং তাঁর নেতৃস্থানীয় সাথি—যেমন : কা'কা ইবনু আমর ও মাজউর ইবনু আদিকে নিয়ে প্রস্তুত হন। তাঁর অধীন সেনাদের ফটকের কাছে এনে প্রস্তুত রাখেন। তাঁদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'প্রাচীরের ওপর আমাদের তাকবিরধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমাদের কাছে উঠে আসবে।'[৪৯৯]

তিনি ও তাঁর সাথিরা এগিয়ে যান। চামড়ার দুটি মটকা দিয়ে তাঁরা পরিখা পার হয়ে মইগুলো স্থাপন করেন। মইয়ের উপরিভাগ স্থাপন করেন প্রাচীরের উপরিভাগে আর নিম্নভাগ পরিখার বাইরে। এরপর মই বেয়ে উপরে ওঠেন। প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে সজোরে তাকবিরধ্বনি দেন। সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষমাণ মুসলিম সেনারা দৌড়ে এসে মই

---

[৪৯৭] প্রাগুক্ত : ১৯২।

[৪৯৮] *তারিখুত তাবারি* : ৪/২৫৯।

[৪৯৯] *আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া* : ১৯২; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৭/২০।

বেয়ে প্রাচীরে উঠে যায়। খালিদ ও তাঁর সাহসী সাথিরা কালবিলম্ব না করে প্রাচীরের উপর থেকে প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করেন।

তিনি ও তাঁর সাথিরা তরবারির আঘাতে দরজার সব তালা কেটে প্রবল আক্রমণে দরজাগুলো খুলে ফেলেন। খালিদের অনুগামী বাহিনী পূর্বদিকের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। নগরের অধিবাসীরা তাকবিরধ্বনি শুনে হতচকিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। প্রত্যেক দল নিজেদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছায়। পরে সবাই নিচে নেমে প্রাচীরের ফটকের সামনে যায়। তারপর তরবারির আঘাতে ফটক ভেঙে ফেলে। এভাবে মুসলিমবাহিনী দামেশকে প্রবেশ করে।[৫০০]

আট. দামেশক বিজয়ের তাৎপর্য ও শিক্ষা

১. দামেশক শক্তিপ্রয়োগে না সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়

দামেশক শক্তিপ্রয়োগ ও যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়, নাকি সন্ধির মাধ্যমে, এ বিষয়ে আলিমরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। অধিকাংশ আলিমের মতে, সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে। কারণ, তাঁরা সন্দিহান, সেটা যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হওয়ার পর রোমানরা সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হয়েছে, নাকি পুরোটাই সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, নাকি পুরোটাই শক্তিপ্রয়োগে বিজিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে আলিমরা সতর্ক চিত্তে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেটা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত বলে গণ্য হবে।

কেউ কেউ বলেন, এর অর্ধেক বিজয় এসেছে যুদ্ধের ফলে; আর অর্ধেক সন্ধির ফলে। এ বক্তব্য এসেছে সাহাবিদের একটি কাজের দৃষ্টিকোণ থেকে। দামেশক বিজয়ের পর তাঁরা খ্রিষ্টানদের সর্ববৃহৎ গির্জার অর্ধেক নিজেরা দখলে নিয়েছিলেন; আর বাকি অর্ধেক তাদের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

২. দামেশক বিজয়ের তারিখ

হাফিজ ইবনু কাসির লেখেন, সাইফ ইবনু উমরের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়, দামেশক বিজিত হয়েছে ১৩ হিজরিতে; কিন্তু জমহুর তথা অধিকাংশ জ্ঞানীজনের মতো সাইফ ইবনু উমরও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, দামেশক বিজিত হয়েছে ১৪ হিজরির রজবের মাঝামাঝি সময়ে।[৫০১] খালিফা ইবনু খাইয়াত লিখেছেন, আবু উবায়দা রা. রজব, শাবান, রমজান ও শাওয়াল মাস দামেশকে রোমানদের অবরোধ করেন এবং

---

[৫০০] *আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া*: ১৯২-১৯৩।

[৫০১] *তারতিব ওয়া তাহজিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*: ৫৬-৫৫।

জিলকদে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন।[৫০২] মোটকথা, তারিখ যেটাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, ইয়ারমুকযুদ্ধের পর দামেশকে বিজয়াভিযান সংঘটিত হয়েছে।[৫০৩]

৩. কিছু যুদ্ধনীতির বাস্তবায়ন

মুসলিমরা এক যুগ থেকে যে সফল যুদ্ধনীতি অনুসরণ করে আসছিলেন, দামেশক বিজয় এরই অংশ ছিল। হঠাৎ আক্রমণ করা, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অব্যাহত রাখা, সুযোগ বুঝে শত্রুদের দুর্বলতা থেকে ফায়দা হাসিল করা, ময়দানের সেনাপরিচালকের কৌশলগুলো বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি সব যুদ্ধনীতিই দামেশক অভিযানে দেখা যায়। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ কীভাবে সঠিক সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন এবং পরিখা পার হয়ে দুর্গের প্রাচীরে চড়তে সুবিধামতো জায়গা অনুসন্ধান করছিলেন। আগের পরিকল্পনায় কীভাবে হুট করে পরিবর্তন আনা হয়েছে, কীভাবে তিনি অবরোধ ছেড়ে দামেশকে প্রবেশের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন, সবই মুজাহিদদের সফল যুদ্ধনীতি। বিশেষ করে রশির সিঁড়ি বেয়ে দামেশকের প্রাচীরে ওঠার বিষয়টা ছিল খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের সুনিপুণ ও কার্যকারী পদক্ষেপ। এর তুলনা হয় বর্তমানের মিসরি বাহিনীর কর্মকৌশলের সঙ্গে, যা তারা ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আরব-ইসরাইলযুদ্ধে ইসরাইলের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা বারলেভ লাইন পার হয়ে তাদের নিষিদ্ধ এলাকায় ঢোকার সময় আমলে নিয়েছিল—রশির সিঁড়ি বানিয়ে সেই নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করেছিল। ১৪০০ বছর আগের সেই যুদ্ধকৌশলের সঙ্গে এর সাদৃশ্য পাওয়া যায়। এরই সঙ্গে ইসলামি বিজয়ধারায় মুসলিমদের অতুলনীয় রণদক্ষতার বিষয়টাও সুস্পষ্ট হয়। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের অতীত ভুলে গেলে চলবে না। আধুনিক যুগে যে যুদ্ধনীতি ও সমরকৌশল অবলম্বন করা হয়, সেটাও অতীতেরই একটা অংশ ছাড়া কিছু নয়।[৫০৪]

৪. দামেশক বিজয়ের পর

দামেশক বিজয়ের পর আবু উবায়দা খালিদকে বিকা অঞ্চলে পাঠান।[৫০৫] যুদ্ধ করে তিনি ওই অঞ্চল জয় করেন। আরেকটা বাহিনী পাঠান মিসনুনের এক কুয়োর পাশে। তাঁরা রোমানদের মুখোমুখি হয়। সেখানে রোমানদের অধিনায়ক ছিল সিনান নামের এক লোক। বৈরুতের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে তারা দ্রুতগতিতে এসে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

---

৫০২ *তারিখু খালিফা* : ১২৬।

৫০৩ *আল-হানদাসাতুল আসকারিয়া* : ১৯২।

৫০৪ প্রাগুক্ত : ১৯৫।

৫০৫ *তারতিব ওয়া তাহজিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৫৯; *আল-আমালিয়াতুত তায়ারবুজিয়া* : ১৮৫।

ওই দিন বহু মুসলিম শহিদ হন। এর ফলে ওই কুয়োর নাম হয় 'শহিদি কুয়ো'।

সেনাপতি আবু উবায়দা ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ানকে দামেশকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। ইয়াজিদ তখন দিহইয়া ইবনু খালিফাকে তাদমুরের পরিবেশ উন্নয়নের জন্য একদল সেনাসহ পাঠান। তিনি আবু জাহরা কুশায়রিকে পাঠান বাসানিয়া ও হাওরান অঞ্চলে। সেখানকার অধিবাসীরা সন্ধি সম্পাদন করে।

শুরাহবিল ইবনু হাসানা রা. শক্তিপ্রয়োগ ও যুদ্ধের মাধ্যমে তাবারিয়া ছাড়া পুরো জর্ডান জয় করেন। তাবারিয়ার অধিবাসীরা তাঁর সঙ্গে সমঝোতা ও সন্ধি স্থাপন করে; আর খালিদ রা. বিকা অঞ্চল জয় করেন। বালবেকের অধিবাসীরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে। তারপর তিনি তাদের জন্য চুক্তিপত্র ও নির্দেশনামা লিখে দেন।

নয়. ফিহলযুদ্ধ

ফিহলে আক্রমণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত মুসলিমবাহিনী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। তাঁরা ফিহলের উঁচু এলাকায় পৌঁছালে রোমানদের ১ লাখ সেনাবাহিনীর সমুদ্র দেখতে পায়, যার অধিকাংশ সেনা এসেছে হিমস থেকে। তাদের সঙ্গে আরও এসে মিলেছে বিভিন্ন শহরের সে-সকল সেনা, যারা পূর্বকার যুদ্ধসমূহে পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করেছে। মোটকথা, ফিহল অবরোধে আদিষ্ট মুসলিমবাহিনী আম্মার ইবনু মুখাশশিনের নেতৃত্বে সেখানে পৌঁছায়। তখন রোমানরা মুসলিমবাহিনীকে বিশেষ করে অশ্বারোহীদের প্রতিহত করতে তাবারিয়া উপসাগরের বাঁধ খুলে দেয়। এতে ফিহলের চারদিক পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। গোটা ভূখণ্ড কাদামাটিতে একাকার হয়ে পড়ে। এর মাধ্যমে রোমানবাহিনী মুসলিম অশ্বারোহীদের ফিরিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। মূলত রোমানরা পানি ও কর্দমাক্ত জমি দ্বারা তাদের প্রতিরক্ষা-ফ্রন্ট দৃঢ়তর করার পদক্ষেপ নিয়েছিল। জমি আগের মতো থাকলে মুসলিমরা খুব সহজে শহরে প্রবেশ করতে পারতেন। কেননা, তাঁরা মরুভূমিতে যুদ্ধ করে অভ্যস্ত।

এমন পরিস্থিতিতে আম্মার ইবনু মুখাশশিন রা. সামনে না এগিয়ে সেনাদের ফিহল অবরোধের নির্দেশ দেন। কারণ, সামনে সমূহ বিপদের আশঙ্কা। উভয় বাহিনীর দূরত্বও অনেক। সামনে এগোনোও দুষ্কর। কর্দমাক্ত মাটি মাড়ানোও অসম্ভব দেখা যাচ্ছিল। তাই তাঁরা ফিহল অবরোধেই সীমাবদ্ধ থাকেন। পরে এই অভিযানে আবু উবায়দাও অংশ নেন। তিনি সম্মুখবাহিনীর দায়িত্ব দেন খালিদকে। ডান পার্শ্বের বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন আবু উবায়দা আর বাম পার্শ্বের আমর ইবনুল আস। অশ্বারোহী বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন জিরার ইবনু আজওয়ার আর পদাতিকের ইয়াজ ইবনু গানাম। প্রধান

সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় শুরাহবিল ইবনু হাসানার হাতে। কেননা, রণাঙ্গনের এই এলাকার দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি।

শুরাহবিল রা. নেতৃত্ব হাতে নেন। তিনি বাহিনীর জন্য রসদপাতি ও সমরাস্ত্র বন্দোবস্ত করেন। বাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করেন। সে সময় দিনরাত ভীষণ পরিশ্রম করেন তিনি।

মুসলিমদের পক্ষ থেকে ফিহল দীর্ঘসময় অবরুদ্ধ হয়ে আছে। রোমানরা মনে করেছিল, মুসলিমরা অসতর্ক ও উদাসীন হয়ে আছে। হঠাৎ আক্রমণে পরাভূত করতে একরাতে তারা মুসলিমদের ওপর হামলা চালায়। তখন রোমানদের সেনাপতি ছিল সাকলাব ইবনু মিখরাক। মুসলিমরাও একযোগে পালটা আক্রমণ চালান। কারণ, তাঁরা সর্বদা সতর্ক ও প্রস্তুত ছিলেন। ওইদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই অব্যাহত থাকে। রাতে গভীর অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে রোমানরা পালিয়ে যায়। তখন তাদের সেনাপতি সাকলাব নিহত হয়। মুসলিমরা তাদের ঘাড়ে আক্রমণ করতে থাকেন। পালাতে পালাতে তারা ওই জলরাশিতে গিয়ে পড়ে, যা তারা মুসলিমদের ফাঁদে ফেলতে তৈরি করেছিল। আল্লাহ তাদের সেখানে ডুবিয়ে মারেন। এভাবে ফিহল থেকে রোমানদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা হয়।

এখন মুসলিমরা তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ভবিষ্যৎ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শুরাহবিল জর্ডান ও আমর ইবনুল আস ফিলিস্তিনে দায়িত্ব পালনে চলে যান। অন্যদিকে আবু উবায়দা ও খালিদ ফিহলযুদ্ধ শেষে হিমসের উদ্দেশে যাত্রা করেন। উভয়ে মারজ আর-রুম অঞ্চলে পৌঁছার পর তথায় এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর দেখা যায়, সারা ভূমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে শুধু লাশ আর লাশ।

তুজরা যাত্রা করেছিল দামেশকের উদ্দেশে। তার লক্ষ্য ছিল দামেশকে এসে ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ানের কাছ থেকে সেখানকার কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া। তবে খালিদ রা. তার চালাকি ধরে ফেলেন এবং আবু উবায়দা রা.-কে তাঁর বাহিনীসহ এখানে রেখে তিনি নিজেই তার পেছনে ছোটেন; আর ইয়াজিদ তার মোকাবিলার জন্য দামেশক থেকে বের হন।

একসময় ইয়াজিদের ও তুজরার সেনা মুখোমুখি হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ চলছিল, তখন হঠাৎ পেছন দিক থেকে খালিদ এসে তুজরার বাহিনীর ওপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা করতে থাকেন; আর সামনের দিক থেকে ইয়াজিদ তাদের আক্রমণে আক্রমণে ছত্রভঙ্গ করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত তুরজাসহ তাদের সবাইকে হত্যা করেন তাঁরা। দু-পাশে থাকা এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে যাওয়া সেনারা ছাড়া কেউই রেহাই পায়নি তখন।[৫০৬]

---

[৫০৬] *আল-আমালিয়াতুত তায়ারবুজিয়া* : ১৮৮।

দশ. বিসান ও তাবারিয়া বিজয়

আবু উবায়দা ও খালিদ রা. আমিরুল মুমিনিন উমর ইবনুল খাত্তাবের নির্দেশনামতো আপন আপন বাহিনী নিয়ে হিমসের দিকে যাত্রা করেন। শুরাহবিল ইবনু হাসানাকে আবু উবায়দা জর্ডানে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োজিত করেন। শুরাহবিল তাঁর সঙ্গে আমর ইবনুল আসকে নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন এবং বিসান অবরোধ করেন। সেখানকার লোকেরা মোকাবিলায় এলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় তাদের সঙ্গে। অসংখ্য রোমীয় নিহত হয়। পরিশেষে যেভাবে দামেশককে সন্ধি হয়েছিল, তদ্রূপ তারাও সন্ধি করে নেয়। শুরাহবিল তাদের ওপর জিজয়া-কর ও জমির খারাজ আরোপ করেন। আবুল আওয়ার আস-সুলামি রা. তাবারিয়াবাসীর সঙ্গেও তদ্রূপ আচরণ করেন।[৫০৭]

এগারো. ১৫ হিজরিতে হিমসের যুদ্ধ

সেনাপতি আবু উবায়দা পরাজিত রোমানদের তাড়া করে হিমস নিয়ে সেখানে তাদের অবরোধ করেন। পরে খালিদও গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলে অবরোধ আরও কঠিন করেন তাঁরা। তখন প্রচণ্ড ঠান্ডা পড়ছিল। নগরবাসী এই আশায় ছিল যে, ঠান্ডায় অতিষ্ঠ হয়ে মুসলিমরা অবরোধ তুলে চলে যাবে; কিন্তু সাহাবিরা পরম ধৈর্য অবলম্বন করেন।

কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন, কতক রোমান ঠান্ডার কারণে ফিরে গিয়েছিল; কিন্তু সাহাবিদের কেউ স্থান ত্যাগ করেননি। ঠান্ডায় রোমানদের কারও কারও পা খসে পড়েছিল; অথচ তাদের পা ছিল মোজার মধ্যে। সাহাবিদের পায়ে জুতা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁদের কারও পায়ে কোনো সমস্যা হয়নি। এমনকি কোনো আঙুলেও নয়। তাঁরা অবরোধ চালিয়েই যাচ্ছিলেন। এভাবে শীতকাল চলে যায়। এরপর তাঁরা অবরোধ আরও কঠিন করেন।

হিমসের সাধারণ জনগণ মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব দিয়েছিল; কিন্তু তাদের বিশিষ্ট নাগরিকসমাজ তা গ্রহণ করেনি। তারা বলেছিল, 'আমরা সমঝোতায় যাব কেন, আমাদের সম্রাট তো আমাদের কাছেই অবস্থান করছেন!'

কথিত আছে, একদিন সাহাবিরা এমন জোরে তাকবিরধ্বনি দিয়েছিলেন যে, পুরো শহর থরথর করে কেঁপে ওঠে। কতক প্রাচীর ভেঙে পড়ে! এরপর আরেকবার যখন তাকবিরধ্বনি দিয়েছিলেন, তখন কতক ঘরবাড়িও ভেঙে পড়ে!

এবার তাদের সাধারণ নাগরিকরা বিশিষ্ট নাগরিকদের কাছে এসে বলে, 'আমাদের অবস্থা কি আপনারা অবগত নন? আমাদের পক্ষ থেকে আপনারা সন্ধি করছেন না কেন?' এরপর

---

৫০৭ *তারতিব ওয়া তাহজিব আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৬১।

তারা সেসব শর্তে সন্ধি স্থাপন ও সমঝোতাচুক্তি সম্পাদন করে, যেসব শর্তে দামেশকের অধিবাসীরা সন্ধি করেছিল। তাতে ছিল, অর্ধেক ঘরবাড়ি মুসলিমদের দখলে যাবে। ভূমির খাজনা পরিশোধ করতে হবে এবং ধনী-গরিব অনুপাতে প্রত্যেককে জিজয়া-কর দিতে হবে।

বিধিমতো সেখান থেকে প্রাপ্ত গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দেন সেনাপতি আবু উবায়দা রা.। খুমুস ও বিজয়ের সংবাদসহ খলিফার কাছে পাঠানো হয় আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা.-কে। সেনাপতি আবু উবায়দা বহু সেনার জন্য সেখানে একটা সেনাক্যাম্প স্থাপন করেন। সেনাদের সঙ্গে বিলাল, মিকদাদসহ কয়েকজনকে কমান্ডারও নিযুক্ত করে দেন। আবু উবায়দা খলিফাকে জানান, 'রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস জাজিরা অঞ্চলের পানি বন্ধ করে দিয়েছে।' তিনি এ-ও জানান, 'সম্রাট কখনো বাইরে বের হয়; আবার কখনো লুকিয়ে থাকে।' তখন উমর রা. তাঁকে আপাতত ওই শহরে থাকার নির্দেশ দেন।[৫০৮]

বারো. কিন্নাসরিনের যুদ্ধ

হিমস জয়ের পর আবু উবায়দা রা. খালিদ রা.-কে ১৫ হিজরিতে কিন্নাসরিন অভিযানে পাঠান। তিনি সেখানে পৌঁছলে স্থানীয় অধিবাসী ও আরব-খ্রিষ্টানরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসে। খালিদ তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে বহু লোককে হত্যা করেন। সেখানে যারা রোমান ছিল, তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়। তাদের আমির ও সেনাপতি মিনাসও নিহত হয়। এরপর গ্রাম্য বেদুইনরা এসে আত্মসমর্পণপূর্বক ওজর পেশ করে বলে, 'এই যুদ্ধে আমাদের কোনো সম্মতি ছিল না; বরং খ্রিষ্টানদের প্ররোচনায় তা সংঘটিত হয়েছে।' সেনাপতি খালিদ তাদের ওজর গ্রহণ করে যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। তারপর শহরে প্রবেশ করে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

খালিদ তাদের উদ্দেশে বলেন, 'তোমরা যদি আকাশেও থাকো, তবে মহান আল্লাহ তোমাদের কাছে আমাদের তুলে নেবেন; অথবা আমাদের কাছে তোমাদের নামিয়ে আনবেন।'

খালিদ সেখানেই থেকে যান। শেষপর্যন্ত পুরো কিন্নাসরিন মুসলিমদের অধিকারে আসে। এই যুদ্ধে খালিদের দূরদর্শিতা ও কৃতিত্বের সংবাদ খলিফা উমর অবগত হলে বলেন, 'মহান আল্লাহ আবু বকরের প্রতি দয়া করুন। তিনি মানুষ চেনায় আমার চেয়ে বেশি পারদর্শী ছিলেন। আল্লাহর শপথ, কোনো দোষ কিংবা অপরাধের কারণে আমি খালিদকে বরখাস্ত করিনি; বরং আমি আশঙ্কা করেছিলাম, মানুষ তাঁর ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায় কি না।'[৫০৯]

---

[৫০৮] প্রাগুক্ত : ৬২।

[৫০৯] *তারিখুত তাবারি* : ৪/৪২৭।

তেরো. বায়তুল মাকদিস অবরোধকারী নিয়ে মতভিন্নতা ও বিশ্লেষণ

ইতিহাসবিদ তাবারি বায়তুল মাকদিস অবরোধ-সংক্রান্ত কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এক বর্ণনামতে অবরোধ করেছিলেন আমর ইবনুল আস রা.। আরেক বর্ণনায় দেখা যায়, আবু উবায়দা রা. বায়তুল মাকদিস পৌঁছালে সেখানকার অধিবাসীরা সিরিয়ার অন্যান্য এলাকার মতো এখানেও সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে বলে, 'সন্ধি সম্পাদিত হবে উমরের হাতে।' আবু উবায়দা এই মর্মে উমরের কাছে চিঠি লেখেন। তারপর উমর রা. এ লক্ষ্যে মদিনায় আলি রা.-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে সহযোগী বাহিনী নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে সফর করেন।

ইবনু আসির রাহ.-ও উপর্যুক্ত দুটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। উভয়টির সঙ্গে তাবারির বর্ণনার হুবহু মিল রয়েছে।[৫১০] তবে ওয়াকিদি রাহ. বায়তুল মাকদিস অবরোধ এবং সেই সময়কার উমরের পরামর্শ ও রোমীয় প্রতিরক্ষা-সেনাদের কথোপকথনকে আবু উবায়দার দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর অভিমত হচ্ছে, আবু উবায়দা সাতজন সেনাপতির নেতৃত্বে ৩৫ হাজার মুজাহিদকে বায়তুল মাকদিস বিজয়ের উদ্দেশ্যে পাঠান। প্রত্যেক কমান্ডারের অধীনে ছিল ৫ হাজার করে সেনা। ওই কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান, শুরাহবিল ইবনু হাসানা, মিরকাল ইবনু হাশিম ইবনু আবি ওয়াক্কাস, মুসাইয়িব ইবনু নাজিয়া ফাজারি, কায়েস ইবনু হুবায়রা মুরাদি ও উরওয়া ইবনু মুহাল্লিল ইবনু ইয়াজিদ রা.। এই সাতজনকে সাত দিনে পাঠানো হয়। প্রত্যেক দিন একজন কমান্ডার তাঁর বাহিনী নিয়ে রওনা হতেন। মুসলিমবাহিনী ও মাকদিস শহরের নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যে কয়েকদিন তুমুল যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পর তিনিও সেখানে উপস্থিত হন।[৫১১]

ওয়াকিদি আরও লেখেন, ইলিয়ার[৫১২] অধিবাসীরা আবু উবায়দার কাছে এসে সন্ধির মাধ্যমে শহরে প্রবেশের নিবেদন করে। তবে শর্ত হচ্ছে, সন্ধিটা আমিরুল মুমিনিন উমর ফারুকের মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে।

এরপর তাবারি ও ইবনুল আসিরের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ওয়াকিদি বলেন, আবু উবায়দা খলিফা উমরের নামে চিঠিতে বিস্তারিত ঘটনা জানান। পরে খলিফা বায়তুল

---

৫১০ *হুরুবুল কুদুসি ফিত তারিখিল ইসলামি ওয়াল আরাবি*, ড. ইয়াসিন সুওয়াইদ : ৪০।

৫১১ *ফুতুহুশ শাম* : ১/২১৩-২১৬।

৫১২ ইলিয়া : বর্তমান ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুসালেমের পূর্বনাম ইলিয়া। খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে ইসরায়েল ও জুদাহ অঞ্চলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন জুদাহ রাজ্যের রাজধানী হয় জেরুসালেম। এরপর ১৩১ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট হাদ্রিয়ান জেরুসালেমের নাম পরিবর্তন করে 'ইলিয়া কাপিতোলায়না' রাখেন। সেই থেকে আরবিতে এর নাম জেরুসালেমের নাম হয়ে যায় 'ইলিয়া'। —*সংকলক।*

মাকদিস অভিমুখে রওনা হয়ে শহরের প্রাচীরে এসে নামেন। বায়তুল মাকদিসের পাদরি তাঁর কাছে এসে নিজের পরিচয় পেশ করে বলে, 'আল্লাহর শপথ, তিনি ওই লোক, যাঁর (বায়তুল মাকদিস বিজয়ের) গুণ আমরা আমাদের কিতাবে পেয়েছি। তিনিই আমাদের দেশকে বিজয় করবেন।'

উমরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সে তার জাতির কাছে গিয়ে পরিস্থিতির বাস্তবতা তুলে ধরে। সবাই খুশিমনে উমরের আনুগত্যে দৌড়াতে থাকে। যেহেতু দীর্ঘ অবরোধ তাদের দুর্বল করে রেখেছে, তাই প্রাচীরের সবকটা ফটক খুলে দেওয়া হয়। সবাই উমরের কাছে এসে তাঁর দায়িত্বে থাকার আকাঙ্ক্ষা পেশ করে এবং জিজয়া দিতে সম্মত হয়।

কিন্তু আমরা ওয়াকিদির বর্ণনাটা অযৌক্তিক মনে করি। কেননা, আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারি, যখন আমর ইবনুল আস বায়তুল মাকদিস অবরোধ করেন, তখন তাঁর অন্যান্য সাথি ইয়ারমুক, দামেশক ও ফিহলের মুসলিম কমান্ডার হিসেবে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল বিজয়াভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। যেমন আবু উবায়দা ও তাঁর সঙ্গে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ হিমস, হামা, কিন্নাসরিন ও হালব (আলেপ্পো) বিজয় করে সিরিয়ার উপকূলীয় দক্ষিণ পথ ধরে ইনতাকিয়া, লাজিকিয়া (লাতাকিয়া) ও আরকা বিজয় করেছেন। এদিকে ইয়াজিদ ইবনু আবি সুফিয়ান দক্ষিণে বৈরুত থেকে সায়দা পর্যন্ত এবং উত্তরে আসকালান থেকে সুর[৫১৩] পর্যন্ত বিজয়পতাকা উড্ডীন করেছিলেন।[৫১৪]

বালাজুরির এক বর্ণনামতে, রাফাহ বিজয়ের পর আমর ইবনুল আসই বায়তুল মাকদিস অবরোধ করেন। আবু উবায়দা রা. কিন্নাসরিন ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকা বিজয়ের পর ১৬ হিজরিতে সেখানে ওই সময় পৌঁছান, যখন আমর বায়তুল মাকদিস অবরোধ করে রেখেছিলেন।

ইলিয়াবাসী আবু উবায়দার কাছে সিরিয়ার সন্ধিভুক্ত অন্যান্য শহরের মতো সন্ধি ও নিরাপত্তার নিবেদন জানিয়ে বলে, 'সন্ধিটা সম্পাদিত হতে হবে উমর ইবনুল খাত্তাবের হাতে।' পরে আবু উবায়দা উমরের কাছে এ মর্মে চিঠি লেখেন, 'তিনি যেন দামেশকের জাবিয়ায় আসেন। পরে সেখান থেকে বায়তুল মাকদিসের উদ্দেশে রওনা হন। তথায় পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি লেখেন। এভাবে ১৭ হিজরিতে বায়তুল মাকদিস বিজিত হয়। এরপর বালাজুরি লেখেন, 'বায়তুল মাকদিস বিজয়ের ব্যাপারে অন্যান্য সূত্রে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে।'[৫১৫]

যাইহোক, ইতিহাসবিদদের বিভিন্ন বর্ণনা সামনে রেখে আমরা তাবারির প্রথম বর্ণনাটা

---

৫১৩ লেবাননের একটা উপকূলবর্তী শহর।—*সম্পাদক।*

৫১৪ *হুরুবুল কুদসি* : ৪১-৪২।

৫১৫ *ফুতুহুল বুলদান* : ১/১৮৮-১৮৯।

প্রণিধানযোগ্য মনে করছি। যার সারমর্ম হচ্ছে, আমর ইবনুল আস বায়তুল মাকদিস অবরোধ করেছিলেন; আবু উবায়দা নন। গবেষণা দ্বারা আমি এই ফলাফলে পৌঁছেছি যে, হতে পারে আবু উবায়দা মুসলিমদের জেনারেল কমান্ডার হওয়ার সুবাদে বায়তুল মাকদিস বিজয়-সংক্রান্ত পরামর্শের উদ্দেশ্যে জাবিয়া গিয়ে আমিরুল মুমিনিন উমরের সঙ্গে মিলিত হন। কেননা, ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোতে এটা একটা প্রমাণিত বিষয় যে, জাবিয়া পৌঁছার পর সিরিয়ার সব বাহিনীর কমান্ডার নিয়ে মজলিশে শুরা ডাকার সময় ইয়াজিদের পর খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন আবু উবায়দা। যেই মজলিশে ইয়াজিদ, শুরাহবিল ও সিরিয়ার অন্যান্য সেনা-কমান্ডারের সামনে বায়তুল মাকদিসের অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি ও মাকদিস শহর অর্পণের আলোচনা হচ্ছিল, সেখানে আবু উবায়দাও উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য সন্ধিচুক্তিতে তাঁর নাম সাক্ষী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়নি; যেমন সাক্ষী হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন আমর ইবনুল আস, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ, মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান ও খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.। এটা সন্ধিচুক্তির বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, বায়তুল মাকদিস অবরোধকারী আবু উবায়দা নন; বরং আমর ইবনুল আস। (কেননা, আবু উবায়দার নেতৃত্বে অবরোধ হলে অবশ্যই তাঁর নাম সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হতো।)[৫১৬]

১. চুক্তিনামা

তাবারির বর্ণনা অনুযায়ী চুক্তিনামায় লিখিত ছিল :

> *পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে।*
>
> *এই মর্মে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর বান্দা, ইমানদারদের সেনাপতি উমর জেরুসালেমের জনগণের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করছেন। নিশ্চয়তা দিচ্ছেন তাদের জান, মাল, গির্জা, আচার-অনুষ্ঠানাদির। মুসলিমরা তাদের গির্জা দখল কিংবা ধ্বংস করবে না। তাদের জীবন, সম্পদ, আবাসভূমি কিংবা ক্রুশ কোনোকিছুই ধ্বংস করা হবে না। জোর করে ধর্মান্তরিতও করা হবে না। এবং কোনো ইয়াহুদি তাদের সঙ্গে জেরুসালেমে বসবাস করবে না।*
>
> *জেরুসালেমের অধিবাসীদের অন্যান্য শহরের মানুষের মতোই কর (ট্যাক্স) প্রদান করতে হবে এবং অবশ্যই বাইজেন্টাইনি ও লুটেরাদের বিতাড়িত করতে হবে। জেরুসালেমের যে-সকল অধিবাসী বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে*

---

[৫১৬] *হুরুবুল কুদসি* : ৪১-৪২।

গির্জা ও ক্রুশ ছেড়ে নিজেদের সম্পত্তি নিয়ে চলে যেতে ইচ্ছুক, আশ্রয়স্থলে পৌঁছানো পর্যন্ত তারা নিরাপত্তা পাবে। গ্রামের অধিবাসীরা চাইলে শহরে থেকে যেতে পারে; কিন্তু তাদের অবশ্যই শহরের অন্যান্য নাগরিকের মতো কর প্রদান করতে হবে। যে যার ইচ্ছামতো বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে যেতে পারে; কিংবা আপন আপন পরিবার-পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারে; আর ফসল কাটার আগে তাদের থেকে কিছুই নেওয়া হবে না।

যদি তারা চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত জিজিয়া-কর প্রদান করে, তাহলে এই চুক্তির অধীন শর্তসমূহের ভিত্তিতে আল্লাহ, রাসুল ﷺ, খলিফা ও মুসলিমদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, সেগুলো যথাযথভাবে রক্ষা করা। এই চুক্তিনামায় সাক্ষী হিসেবে আছেন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ, আমর ইবনুল আস, আবদুর রাহমান ইবনু আওফ ও মুআবিয়া ইবনু আবি সুফিয়ান রা.। ১৫ হিজরিতে চুক্তিনামাটা লেখা হয়।[৫১৭]

২. ওয়াসিলা ইবনু আসকার আত্মোৎসর্গী ভূমিকা

ওয়াসিলা ইবনুল আসকা রা. বলেন, 'দামেশকের ফটকসমূহের একটা ফটকের নাম জাবিয়া। সেখানে খুব শোরগোল শুনতে পাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি, লড়াকু ঘোড়ার কাফেলা এদিক দিয়ে অতিক্রম করছে। সামনে অগ্রসরের সুযোগ তাদের দিয়ে দিই। পরে পেছন থেকে তাকবিরধ্বনি দিয়ে আক্রমণ করে বসি। তারা ভেবেছিল, হয়তো তাদের ঘেরাও করা হয়েছে, তাই তাদের কমান্ডারকে ছেড়ে তারা শহরের দিকে পালিয়ে যায়। আমি তীব্রবেগে বর্শা নিক্ষেপ করে কমান্ডারকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়ে তার ঘোড়ায় চড়ে লাগাম হাতে নিই। এতে তার সাথিরা আমাকে একা দেখে পিছু নেয়। একজনকে আমার দিকে আসতে দেখে বর্শা ছুড়ে তাকে হত্যা করি। এরপর আরেকজন কাছে এলে তাকেও হত্যা করি। খালিদকে এই ঘটনা জানাতে ঘোড়া দৌড়িয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে দেখি, রোমান জেনারেল কমান্ডার দামেশকবাসীর জন্য তাঁর কাছে নিরাপত্তার আবেদন করছে।'[৫১৮]

৩. ফিহল অভিযানের আগে রোমানদের কাছে মুআজের আলোচনা

ফিহলযুদ্ধের আগে মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরুর পর রোমানদের জেনারেল কমান্ডার একজন দূত পাঠাতে মুসলিমদের কাছে অনুরোধ করে, যাঁর মাধ্যমে মুসলিমদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও তাঁদের প্রত্যয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। আবু

---

[৫১৭] *তারিখুত তাবারি* : ৪/৪৩৬।

[৫১৮] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ৩/৩৮৬-৩৮৭; *আত-তারিখুল ইসলামি* : ১০/৩১৯।

উবায়দা রা. মুসলিমদের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য মুআজকে দূত বানিয়ে পাঠান।

রোমানরা মুআজকে অভ্যর্থনা জানাতে বিভিন্ন প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সৌন্দর্য ও চাকচিক্য বর্ধনের জন্য উত্তম ব্যবস্থাপনা করে। চমকপ্রদ অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ময়াভিভূত করা দামি গালিচা ও পর্দা দ্বারা সভাস্থল সাজায়, যাতে মুআজ রা. নিজের উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যান অথবা আর কিছু না হোক, অন্তত মানসিকভাবে প্রভাবিত হন। কিন্তু তিনি তাদের এই চাকচিক্যে মোটেই প্রভাবিত না হলে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়। তিনি বিনয় ও দুনিয়াবিমুখতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তাঁকে প্রভাবিত করার সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ করে দেন। বলা যায়, রোমানদের বিরুদ্ধে তিনি এই সুযোগকে ভালোভাবে কাজে লাগান। সেটা এভাবে ছিল যে, মুআজ নিজের ঘোড়ার লাগাম নিজের হাতেই রাখেন। রোমান পরিচারকদের হাতে দিতে এ বলে অস্বীকার করেন যে, 'নিজেদের দুর্বলদের অধিকারবঞ্চিত করে যে গালিচা বা বিছানা দিয়ে সভাস্থল সাজিয়েছ, আমি তাতে বসব না।' এ কথা বলতে বলতে তিনি মাটিতে বসে পড়েন।

তারপর আবার বলতে শুরু করেন, 'আমি আল্লাহর বান্দাদের এক বান্দামাত্র। আল্লাহর সৃষ্টি মাটিতে বসি। আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ নিয়ে নিজের ভাইদের প্রতি জুলুম করি না।'

তাদের মধ্যে আরও কিছু কথাবার্তা হয়। তারা মুআজের কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চায়। তিনি ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা দেন। তারা ইসা আ. সম্পর্কে মুসলিমদের আকিদা জানতে চাইলে তিনি তিলাওয়াত করেন,

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾

নিশ্চয় ইসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর কাছে আদমের মতোই। আল্লাহ তাঁকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁকে আদেশ করেন, হয়ে যাও; আর তা হয়ে যায়। [সুরা আলে ইমরান : ৫৯]

আর মুসলিমদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্পষ্ট করতে গিয়ে এই আয়াত তাদের পড়ে শোনান,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾

হে ইমানদারগণ, সত্য অস্বীকারকারীদের যারা তোমাদের নিকটবর্তী, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। জেনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন। [সুরা তাওবা : ১২৩]

সব শুনে রোমানরা অবজ্ঞার সুরে বলে, ‘পারস্যের বাদশাহ মারা যাওয়ায় তাদের ওপর তোমরা বিজয়ী হয়েছিলে; কিন্তু রোমানদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না। কারণ, তাদের বাদশাহ এখনো জীবিত। তার সেনাসংখ্যাও অসংখ্য।’ এ কথা শুনে মুআজ দ্বিধাহীন চিত্তে বলেন, ‘তোমাদের বাদশাহ যদি হিরাক্লিয়াস হয়ে থাকে, তবে আমাদের বাদশাহ আল্লাহ; আর আমাদের আমির আমাদেরই একজন। তিনি যদি কুরআনি হিদায়াত ও নববি শিক্ষার আলোকে আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন, তাহলে আমরা তাকে আমির মেনে থাকি। যদি তা থেকে দূরে থাকেন, তবে আমরা তাকে পদচ্যুত করি। তিনি আমাদের বাইরের কেউ নন। না অহংকার করেন; আর না নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষী।’

এদিকে রোমানবাহিনীর সংখ্যাধিক্যের জবাবে তিনি তিলাওয়াত করেন,

﴿كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ﴾

> স্বল্পসংখ্যক লোকের একটা দল আল্লাহর হুকুমে একটা বিরাট দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গী। [সুরা বাকারা : ২৪৯]

শেষমেশ যখন রোমানরা মুআজকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন মূল আলোচনায় ফিরে আসে এবং মুসলিমদের সঙ্গে এই শর্তে শান্তিচুক্তি করতে অনুরোধ করে যে, ‘বালকা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা মুসলিমদের অধিকারে যাবে!’ মুআজ তাদের সাবধান করে বলেন, ‘আমাদের সামনে তিনটা বিষয় আছে। তন্মধ্যে যেকোনো একটা তোমাদের গ্রহণ করতে হবে—ইসলাম, জিজয়া প্রদান বা যুদ্ধ।’

এ কথা শুনে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, ‘যান; নিজের সাথিদের কাছে চলে যান। সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন আমরা আপনাদের অপদস্থ করব।’ মুআজ বলেন, ‘অপদস্থ করার কোনো সুযোগ পাবেন না। আমাদের শেষ সদস্য বেঁচে থাকা পর্যন্ত লড়ে যাবে বা আমরা আপনাদের অপদস্থ করে এখান থেকে বের করব।’ এটুকু বলেই তিনি বেরিয়ে আসেন।[৫১৯]

এভাবেই এই সাক্ষাতে মুআজের ব্যক্তিত্ব একজন রাজনীতিজ্ঞ, দক্ষ সেনা ও বিচক্ষণ দায়ি হিসেবে আবির্ভূত হয়, যিনি নিজের শত্রুদের আপত্তির মুখভাঙা জবাব দেন। তাদের দোষ এবং প্রজাদের ওপর জুলুমের কথা বলে তাদের ধর্ম থেকেই তার প্রতিকার পেশ করে ইসলামের দিকে আহ্বান করেন। তাঁর নিজের প্রভাবিত হওয়া তো দূরে থাক; বরং নির্ভীক চিত্তে তাদের কথার জবাব প্রদান করে উলটো তাদেরই প্রভাবিত করেন। আর সুস্পষ্টভাবে নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা খুলে বলেন। শেষে মুসলিমশিবিরে

---

[৫১৯] *আল-ইকতিফা* : ৩/১৯৪।

ফিরে এসে নিজের আমিরের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করেন।[৫২০] সর্বকালের মহাসত্য হচ্ছে, যুদ্ধের আগে মুসলিমরা তাদের শত্রুদের ইসলামের দাওয়াত পেশ করত।

৪. আবু উবায়দার সহযোগিতায় উমরের বিরল যুদ্ধকৌশল

আবু উবায়দার দূত যখন উমরকে চিঠিটা দিয়ে সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে জানালেন, তখন খলিফা উমর রা. সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের নামে একটা চিঠি লিখলেন,

> *যে দিন এই চিঠিটা পৌঁছবে, সে দিনই একটা বাহিনী কা'কা ইবনু আমরের নেতৃত্বে হিমসে পাঠিয়ে দেবে। সেখানে আবু উবায়দাকে শত্রুপক্ষ ঘিরে ফেলেছে।*

উমর তাৎক্ষণিক যুদ্ধপরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বড় বড় শহরে জঙ্গি ঘোড়া প্রস্তুত রেখেছিলেন। কুফায়ও (যেখানে সাআদ রা. ছিলেন) ৪ হাজার ঘোড়া ছিল। সাআদ চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো দিয়ে মুজাহিদদের পাঠিয়ে দেন।

সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের চিঠিতে উমর এটাও লিখেছিলেন,

> *সুহাইল ইবনু আদির নেতৃত্বে একটা বাহিনী জাজিরার দিকে পাঠিয়ে দাও। এই শহরের লোকেরাই হিমসে হামলা করতে রোমানদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এর আগে কারকিসিয়ার লোকেরা এ ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে। আরেকটা বাহিনী আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু ইতবানের নেতৃত্বে নাসিবাইনে (নুসাইবিন) হামলার জন্য পাঠিয়ে দাও।*
>
> *সেখানকার অধিবাসীদেরও কারকিসিয়ার লোকেরা হামলার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। পরে হাররান ও রাহায় গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের বের করে দাও। আরেকটা বাহিনী ওয়ালিদ ইবনু উকবার নেতৃত্বে জাজিরার (খ্রিস্টান) আরব বংশধর রাবিয়া ও তুনুখের দিকে পাঠাও; আর ইয়াজ ইবনু গানামকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাও। যুদ্ধ লেগে গেলে অন্যান্য বাহিনী ইয়াজের অধীনে কাজ করবে।*

উমরের পরিকল্পনামতো কা'কা রা. ৪ হাজার আরোহী নিয়ে হিমসের দিকে রওনা হন। ইয়াজ এবং অন্যান্য বাহিনীও আপন আপন গন্তব্যের দিকে রওনা হয়ে যায়। এদিকে আমিরুল মুমিনিন নিজেও আবু উবায়দাকে সহযোগিতার জন্য একটা বাহিনী নিয়ে রওনা করেন।

---

[৫২০] *আল-আনসার ফিল আসরির রাশিদি* : ২০৮।

জাজিরাবাসী যারা হিমসে হামলা করতে রোমানদের উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, তারা ইরাক থেকে মুসলিমবাহিনী আসার খবর পায়; কিন্তু এই বাহিনী তাদের শহরে হামলা করবে, নাকি হিমসে যাবে, সেটা তাদের জানা ছিল না। এ জন্য তারা নিজেদের শহর রক্ষার দিকে মনোযোগ দিয়ে রোমানদের সঙ্গ ছেড়ে দেয়। আবু উবায়দা যখন দেখেন জাজিরাবাসী রোমানদের সঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে, তখন তিনি যুদ্ধ শুরুর ব্যাপারে খালিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। খালিদ এতে সম্মতি দেন। পরে মুসলিমরা জোরালোভাবে রোমানদের ওপর হামলা চালিয়ে বিজয় ছিনিয়ে নেন। কা'কার নেতৃত্বে কুফার বাহিনী হিমসে পৌঁছে দেখে, তিন দিন আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। অন্যদিকে আমিরুল মুমিনিন তখন জাবিয়ায় পৌঁছেছিলেন।

হিমস থেকে আবু উবায়দা রা. চিঠিতে লেখেন, 'যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হয়েছি। যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন দিন পর কুফার বাহিনী আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এবার আমাদের প্রতি আপনার কী নির্দেশনা?' উমর জবাব পাঠান, 'তাঁদেরও (কুফাবাহিনী) গনিমতের সম্পদের অংশ দেবেন। কারণ, তাঁরা আপনাদের সাহায্যের জন্য এসেছে এবং তাঁদের আসার খবর পেয়ে শত্রুপক্ষ ভয় পেয়েছে।' এরপর উমর লেখেন, 'আল্লাহ কুফাবাসীকে উত্তম বদলা দান করুন। তাঁরা তাঁদের সীমানা রক্ষার জন্য যথেষ্ট এবং অন্য দেশের লোকদেরও সাহায্য করে।'[৫২১]

শত্রুদের ধাঁধায় ফেলতে এবং বিক্ষিপ্ত করে দিতে উমর রা. বিরল একটা যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করেন। একদিকে কুফা থেকে শক্তিশালী একটা বাহিনী পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে নিজে একটা বাহিনী নিয়ে রওনা করেন। শত্রুদের মোকাবিলার জন্য এটা জরুরি ছিল। তবে বিস্ময়ের বিষয় হলো, হিমসে হামলার জন্য যেসব শহর রোমানদের উদ্‌বুদ্ধ করছিল, উমর রা. তাদের ওপর হামলার জন্য বাহিনী পাঠিয়ে দেন। এতে ওই শহরগুলোর বাসিন্দারা নিজেদের রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে; রোমানদের আর সঙ্গ দিতে পারেনি। ফলে রোমানদের শক্তি অনেক কমে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। এটা ছিল উমরের বিরল যুদ্ধকৌশলের ফল।[৫২২]

---

[৫২১] *তারিখুত তাবারি* : ৫/২৪-২৫।

[৫২২] *তারিখুল ইসলামি* : ১১/১৩৭।

১২ তম অধ্যায়

খালিদের মৃত্যুশয্যা ও ইনতিকাল

এক. মৃত্যুশয্যা ও ইনতিকাল

১. মৃত্যুশয্যায় উমর রা. সম্পর্কে খালিদের বক্তব্য

খালিদের অন্তিম অসুস্থতার সময় আবুদ দারদা রা. তাঁকে দেখতে গেলে খালিদ রা. বলেন, 'হে আবুদ দারদা, উমরের মৃত্যু হলে আপনি অপছন্দনীয় অনেক বিষয় দেখতে পাবেন।' আবুদ দারদা বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি আপনার সঙ্গে একমত পোষণ করছি।' খালিদ বলেন, 'একটা বিষয়ে আমি তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ ছিলাম; কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পর যখন বিষয়টা নিয়ে ভাবলাম এবং মৃত্যুকে হাতের নাগালে উপলব্ধি করলাম যে, উমর তাঁর যাবতীয় কাজকর্মে আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করেন। আমি তাঁর ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম যখন তিনি আমার অর্ধেক সম্পদ নিতে লোক পাঠিয়েছিলেন। এমনকি তিনি একটা জুতা নিয়েছিলেন এবং আমি আরেকটা জুতা নিয়েছিলাম। কিন্তু যাঁরা আমার আগে ইসলামগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও তিনি অনুরূপ আচরণ করেছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে কঠোর; অনুরূপ অন্যদের সঙ্গেও কঠোর ছিলেন। আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়ায় আমি তাঁর থেকে অন্তরঙ্গ আচরণ প্রত্যাশা করেছিলাম; কিন্তু দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কারও তিরস্কার অথবা কোনো আত্মীয়ের হৃদ্যতা—কোনোকিছুই গ্রাহ্য করতেন না। তাঁর অবস্থা দেখে আমার সব অনুযোগ দূর হয়ে যায়। তিনি আমার সঙ্গে কঠোর আচরণ করতেন, যা আমাদের মতপার্থক্যের কারণেই হয়েছিল। আমি যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করতাম, কঠিন অবস্থা পার করতাম; কিন্তু তিনি তখন সেখানে উপস্থিত থাকতেন না, অবস্থা সম্পর্কে জানতেন না। যারা বেশি কষ্ট করত, আমি তাদের পুরস্কৃত করতাম। আমার এমন আচরণগুলোই মূলত তাঁর অপছন্দনীয় ছিল।'[৫২৩]

মৃত্যুর সময় তিনি উপলব্ধি করে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

[৫২৩] *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ৩৪৯; *আল-খিলাফাহ ওয়াল-খুলাফা* : ১৯৮।

বলার পর অন্য কোনো কাজ আমাকে এত বেশি আশার আলো দেয়নি, যতটা এক তীব্র শীতের রাতে মুহাজিরদের সঙ্গে অভিযানে দিয়েছিল। সেদিন আমি বৃষ্টির মধ্যে আমার ঢাল বহন করে রাত্রিযাপন করেছি, প্রহর গুনেছি ভোরের, যেন আমরা কাফিরদের আক্রমণ করতে পারি। তোমরাও নিজেদের জন্য জিহাদকে আবশ্যক বানিয়ে নাও। আমি এত এত যুদ্ধে শরিক হয়েছি—আমার শরীরে এমন কোনো জায়গা খালি নেই, যেখানে তরবারি আঘাত করেনি বা বর্শা-তির বিদ্ধ হয়নি; কিন্তু আজ আমি এখানে। একটা উটের মতো আমার বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছি। কাপুরুষরা ভয়ে ঘুমাতে পারে না; অথচ আমাকে দেখো, আমি শাহাদাতবরণ করার আকাঙ্ক্ষা লালন করতাম; কিন্তু তাকদিরের ফায়সালা ছিল আমার বিছানাতেই আমার মৃত্যু হবে।'[৫২৪]

খালিদ রা. উমর রা.-কে তাঁর অসিয়ত বাস্তবায়ন করতে বলেছিলেন। তাঁর অসিয়তনামায় লেখা ছিল, 'আমি আমার সমস্ত বিষয়, সহায়সম্পত্তি এবং অসিয়তনামা বাস্তবায়নের দায়িত্ব উমর ইবনুল খাত্তাবের ওপর অর্পণ করলাম।'

উমর রা. এ কথা শুনে কাঁদতে শুরু করেন। তখন তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ তাঁকে বলেন, আপনার আর খালিদের দৃষ্টান্তই যেন কোনো কবি এভাবে দিয়েছেন,

> *তোমাকে এমন অবস্থায় পাওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার জন্য অশ্রু ঝরাবে;*
>
> *অথচ আমার জীবদ্দশায় তুমি কখনো আমার জন্য সামান্য পাথেয়ও সংগ্রহ করে দাওনি।*[৫২৫]

খালিদের মৃত্যুতে উমর রা. অশ্রু ঝরান। তাঁর চাচার মেয়েও তাঁর জন্য কাঁদছিলেন। বর্ণিত আছে; তাঁদের কান্না থামাতে উমরকে বলা হলে তিনি বলেছিলেন, 'যতক্ষণ তাঁরা কাপড় ছিঁড়বে, বিলাপ না করবে, ততক্ষণ আবু সুলায়মানের জন্য তাঁদের চোখের পানি ফেলতে দাও। যারা কাঁদতে চায়, আবু সুলায়মানের জন্য তাদের কাঁদা উচিত।'[৫২৬]

তিনি খালিদ রা. সম্পর্কে বলেন, 'খালিদের মৃত্যুতে ইসলামের কাঠামোতে এমন একটা শূন্যতা তৈরি হয়েছে, যা সহজেই পূর্ণ হবে না। হায়! তিনি যদি জীবিত থাকতেন, কতই-না ভালো হতো! যতদিন জীবিত ছিলেন, ময়দানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা ছিলেন। আল্লাহর শপথ, শত্রুদের মোকাবিলায় তিনি এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর ছিলেন। তাঁর পরামর্শগুলোও অতুলনীয় হতো।'

---

[৫২৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা* : ১/৩৮২; *আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন* : ৩৬৭।

[৫২৫] *আল-ফারুক* : ২৮৭।

[৫২৬] *আত-তারিখ ইলাল মাদায়িন* : ৩৬৭।

বনু মাখজুমের কিছু লোকের সঙ্গে কবি হিশাম ইবনুল বাখতারি উমরের কাছে এলে উমর তাকে বলেন, 'তুমি খালিদ সম্পর্কে যা বলেছ, তা আমাকে আবৃত্তি করে শোনাও।' তিনি আবৃত্তি করলে উমর বলেন, 'আবু সুলায়মানের ওপর আল্লাহ রহম করুন। তোমার প্রশংসায় ঘাটতি রয়েছে। তিনি শিরককে ঘৃণা এবং মুশরিকদের লাঞ্ছিত করতে ভালোবাসতেন। তাঁর ব্যাপারে যে মন্দ বলবে, সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।'

এরপর কবির কবিতা দিয়ে উপমা দেন,

> *গত হওয়া জিনিসের বিরুদ্ধাচারের যে খায়েশ রাখে তাকে বলে দাও, তার মতো যেন অন্য আরেকটা জিনিস তৈরি করে। কারণ, যা গত হওয়ার, তা তো ইতিমধ্যে গত হয়েছে।*
>
> *যে আমার পর জীবিত থাকবে, তাঁর জীবিত থাকাতে আমার কোনো ফায়দা নেই। আর না আমার পর যে মৃত্যুবরণ করবে, তার মৃত্যু আমাকে জীবন দান করতে পারবে।*

এরপর তিনি বলেন, 'আবু সুলায়মানের ওপর আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহর কাছে তাঁর জন্য যা কিছু আছে, তা এই দুনিয়ায় তাঁর যা ছিল তার চেয়ে উত্তম। মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর কীর্তিগাথার কারণে স্মরণীয়। তিনি সবাইকে শোকাগ্রস্ত করে গেলেন। আমি দেখিনি, সময় কাউকে পৃথিবীতে সর্বদার জন্য থাকতে দিয়েছে।'[৫২৭]

২. ইনতিকাল

খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রা. খালিদকে সেনাপতির পদ থেকে অপসারণের পর তাঁকে বিভিন্ন প্রদেশে ওয়ালি নিয়োগ দেন। কিছুদিন পর খালিদ রা. স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ২১ হিজরিতে ৬০ বছর বয়সে তিনি সিরিয়ার হিমসে ইনতিকাল করেন এবং সেখানেই সমাধিস্থ হন।[৫২৮] তবে কোনো কোনো বর্ণনায় ২২ হিজরির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে রয়েছে, খালিদ রা. ইনতিকালের আগে কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। এরপর ২২ হিজরিতে মদিনায় ইনতিকাল করেন। তবে হিমসে তাঁর ইনতিকাল হয়েছে বলে যেসব বর্ণনা রয়েছে, সেসব সঠিক না-ও হতে পারে। কারণ, খলিফা উমর রা. তাঁর জানাজায় শরিক

---

[৫২৭] *তাহজিবু তারিখি দিমাশক* : ৫/১১৬।

[৫২৮] *খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ*, সাদিক আরজুন : ৩৪৮।

হয়েছিলেন বলে বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ আছে।[৫২৯] উল্লেখ্য, ইসলামগ্রহণের পর মাত্র ১৪ বছর জীবন পেয়েছিলেন তিনি।[৫৩০]

মহাবীর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-এর মৃত্যুর পর উমর রা. বলেছিলেন, 'নারীরা খালিদের মতো সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়ে গেছে।' খালিদের মৃত্যুর পর খলিফা অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন। মানুষ পরে জেনেছিল, শুধু তাঁর বিয়োগব্যথায় তিনি এভাবে কাঁদেননি; বরং খালিদের অপসারণের কারণ দূরীভূত হওয়ায় তিনি তাঁকে আবার সেনাপতির পদে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যু তাঁর সেই ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হওয়ায় তিনি এত কেঁদেছিলেন।[৫৩১]

দুই. হাদিস বর্ণনাকারী খালিদ

ইসলামগ্রহণের পর খালিদ ইবনু ওয়ালিদের জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জিহাদের ময়দানে অতিবাহিত হয়েছে। এ কারণে রাসুল ﷺ-এর সুহবতে থাকার সুযোগ ও সময় খুব কম পেয়েছেন তিনি। খালিদ নিজেই বলেছেন, 'জিহাদের ব্যস্ততা কুরআনের বিরাট একটা অংশ শিক্ষা থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে।'[৫৩২] এরপরও সুহবতে নববির ফয়েজ ও ইলমের সৌভাগ্য থেকে তিনি একেবারে বঞ্চিত ছিলেন, এমনটা বলা যাবে না। কেননা, নবিজির ইনতিকালের পর মদিনার আলিম ও মুফতি সাহাবিদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তবে সেনা-স্বভাবের কারণে ফাতওয়ার মসনদে কখনো বসেননি। ফলে তাঁর ফাতওয়ার সংখ্যা দু-চারটির বেশি পাওয়া যায় না। তবে তাঁর থেকে বর্ণিত মোট ১৮টি হাদিস রয়েছে। এর মধ্যে দুটি মুত্তাফাক আলাইহি অর্থাৎ, ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম রাহ. তাঁদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম বুখারি রা. এককভাবে আরেকটি বর্ণনা করেছেন।

তিন. খালিদের ফজিলত

রাসুল ﷺ নানা প্রসঙ্গে একাধিকবার তাঁর প্রশংসা করেছেন। মক্কাবিজয়ের সময় একদিন কিছু দূরে খালিদকে দেখা গেলে রাসুল ﷺ আবু হুরায়রাকে বলেন, 'দেখো তো কে?' তিনি বললেন, 'খালিদ'। রাসুল ﷺ বললেন, 'আল্লাহর এ বান্দা কতই-না ভালো। 'রাসুল ﷺ একবার সাহাবিদের উদ্‌দেশ করে বলেন' ,তোমরা খালিদকে কষ্ট

---

[৫২৯] *উসুদুল গাবাহ : ২/৯৬; আল-ইসাবাহ : ১/৪১৫।*

[৫৩০] *আত-তারিখ ফিল কামিল,* ইবনুল আসির : ৪১৮।

[৫৩১] *রিজালুন হাওলার রাসুল : ৩০৫।*

[৫৩২] *আল-ইসাবাহ : ১/৪১৫।*

দেবে না। কারণ, সে কাফিরদের বিরুদ্ধে চালিত আল্লাহর তরবারি।'

একবার আম্মার ইবনু ইয়াসির রা. ও তাঁর মধ্যে ঝগড়া হয়। খালিদ তাঁকে কিছু কটুকথা বলে ফেলেন। আম্মার রা. তখন নবিজির কাছে বিচার দেন। সব শুনে নবিজি বলেন, 'যে আম্মারের সঙ্গে হিংসা ও শত্রুতা রাখে, সে আল্লাহর সঙ্গে হিংসা ও শত্রুতা রাখে।' নবিজির এ কথায় খালিদের ওপর এমন প্রতিক্রিয়া হয় যে, তিনি তখনই আম্মারের কাছে ছুটে যান এবং তাঁকে খুশি করিয়ে নেন। খালিদ রা. নিজেই বলেছেন, 'রাসুল ﷺ-এর কাছ থেকে ওঠার পর আম্মারের সন্তুষ্টি অর্জন করা ছাড়া আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোনো জিনিস ছিল না।'

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের হৃদয়ে রাসুল ﷺ-এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা এত তীব্র ছিল যে, রাসুলের শানে কেউ সামান্য অমার্জিত কোনো কথা বললে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বলতেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, অনুমতি দিন, ওর গর্দান উড়িয়ে দিই।'

চার. দীনের সফল দায়ি

উম্মাহর গর্ব খালিদ রা. কেবল একজন সেনা-ই ছিলেন না; দক্ষ দায়িও ছিলেন। বনু জুজায়মা ও মালিক ইবন নুওয়াইরার ব্যাপারে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে যে ক্ষতি হয়, তা লক্ষ করে রাসুল ﷺ পরবর্তী সময়ে তাঁকে কোথাও পাঠানোর সময় উপদেশ দিতেন—'শুধু ইসলামের দাওয়াত দেবে, তরবারি ওঠাবে না।' তেমনিভাবে ইয়ামেনে পাঠানোর সময়ও নির্দেশ দেন, 'তোমার পক্ষ থেকে যেন যুদ্ধের সূচনা না হয়।'

এ হিদায়াত লাভের পর যত যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন, কোথাও কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি হয়েছে বলে জানা যায়নি। রাসুলের জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইনতিকালের পরেও তিনি দীনের দাওয়াতের কাজ আনজাম দিয়েছেন। মক্কাবিজয়ের পর রাসুল ﷺ-এর নির্দেশে ইসলামপ্রচারের জন্য বিভিন্ন এলাকায় যান এবং তাঁর প্রচেষ্টায় অনেকেই ইসলামগ্রহণ করেন। ইয়ামেনের দাওয়াতি কাজে তিনি আলির রা.-এর সহযোগী ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার ভণ্ড তুলায়হা আসাদির সহযোগী বনু হাওয়াজিন, সুলাইম ও আমির পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে। এ ছাড়া অসংখ্য লোক বিভিন্ন সময় তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করে।

প্রতিটা যুদ্ধ শুরুর আগে ইসলামের নিয়মানুযায়ী প্রতিপক্ষকে সবসময় তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন। ময়দানে প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যেও সফল একজন দায়ির ভূমিকা পালন করেছেন। ইয়ারমুকের রোমান সেনা জারজাহ এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

পাঁচ. শেষকথা

খালিদ রা. ইসলামের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরের আসনে সমাসীন। সামরিক ক্ষেত্র ও রণাঙ্গনে তাঁর যে অবদান, তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল ঘটনা। পাশাপাশি এ কথাও স্পষ্টত যে, তিনি একজন যোগ্য শাসক ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা খালিদ রা.-এর ওপর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ করেছেন। তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠায় যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তা অনন্য। সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা যেন তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে চিন্তা করি এবং নিজেদের মধ্যে তাঁর গুণাবলির সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা করি। কারণ, তাঁর গুণাবলি অবলম্বনেই মুসলিম জাতির যথার্থ কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমিন।

———

সাহাবি সিরিজ

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.